প্রথম প্রকাশ—(কার্তিক ১৩৫৯)

সম্পাদক—সুশীলকুমার ঘোষ

প্রকাশক—প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—এককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০, রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন, কলিকাতা-৬

স্বর্গীয় পিতৃদেব শৈলেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

স্বর্গীয়া মাতৃদেবী নিভাদেবীর পুণ্যস্মৃতি স্মরণে

সূচীপত্র

প্রাক-নিবেদন কথা—১

শিকার ভাষ্য পড়ে বিশেষ করে এ'কথাটি মনে এলো—বহুদিন পর শিকারের নানা অভিজ্ঞতাপূর্ণ সাবলীল ভঙ্গিমায় লেখা একখানা মনোজ্ঞ বইয়ের সঙ্কলন হয়েছে। হিমাংশুর এই প্রচেষ্টা বাংলা শিকার সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে সন্দেহ নেই। ইদানীং কালে শিকারীর সংখ্যা ক্রমশঃই নানা কারণে অত্যন্ত সীমিত হয়ে আসছে। লেখকদের অনেকেরই আবার শিকারে প্রত্যক্ষ বা নিজস্ব অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় তাদের কাহিনীগুলি বাস্তবতার কঠোর পরিবেশের মধ্যে বিধৃত বা বিস্তারিত না হয়ে শিকার গল্প লেখা বা শিকারের রম্য রচনা সঙ্কলিত হয়।

হিমাংশুর সঙ্গে পরিচয় আমার অনেক দিনের। হাতী শিকার—বিশেষ করে পাগলা বা গুণ্ডা হাতী শিকার—যে কোন শিকারীর জীবনে এক মহা আকর্ষণীয় উদ্যোগ হলেও তা যে একটা প্রাণান্তকর ঝুঁকি—এ কথা তাঁকে বুঝিয়ে, হুঁশিয়ার করবার সুযোগ আমার হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে; যদিও তখন জানতাম সে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রথম শ্রেণীর শিকারী। বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে বাঘ শিকারে সে যখন অস্খলিত নিশানী তখনও আমার কাছে এসে বিনীতভাবে পরামর্শ বা উপদেশ নেওয়ার মধ্যে তার নমিত ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছি। কঠোর পরিশ্রমী, অসাধারণ সাহসী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হিমাংশু বহুদিন পূর্বে আমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল।

পাঠক সমাজ, বিশেষ করে শিকার সম্পর্কে উৎসুক যারা—তাঁ'রা এই লেখা পড়ে শুধু যে রোমাঞ্চকর আনন্দই পাবেন তা নয়,

তার সহ্য, ধৈর্য, সাহসিকতা ও অদমিত চেষ্টার সঙ্গেও পরিচয় লাভ করে তার শিকার কাহিনী সম্যক মূল্যায়নে পরিতুষ্ট হবেন—এ আশা বাহুল্য মনে করি না।

হিমাংশুর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রাক-নিবেদন কথা—২

বন্য ও বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে মানুষের আকর্ষণ চিরকালের, স্বাভাবিক ভাবে সকলের পক্ষে এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়—কাজেই আহরণ করা হয়ে থাকে শিকার কাহিনী থেকে। এক-সময় এই সব শিকার কাহিনী লেখা হত বেশীর ভাগই ইংরাজীতে এবং লিখতেন বিদেশীরা। ঘটনাবলী অনেক সময় অতিরঞ্জিত করে লেখা হত শিকারীর অসাধারণত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য। ফলে শিকারীর ব্যক্তিত্ব ও বন্যপ্রাণীর হিংস্রতা ও উগ্রতা উভয়েই সমভাবে ব্যাহত হত। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিকার কাহিনী গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর শিকারী জীবন বহুদিনের এবং তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে শিকারের আকর্ষণে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই গ্রন্থে ঘটনার বিন্যাস ও ভাবের সম্প্রসারণে কোন চাতুর্য নেই। দুঃসাহসিক শিকার কাহিনী ও ঘটনা সমূহ বেশ সরস ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাগ্রতা ও অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর শিকার কাহিনীর মধ্যে সম্যকভাবে ফুটে উঠেছে।

বর্তমানে দেশে বন্য প্রাণীর সংখ্যা নানা কারণে হ্রাস পেয়েছে। এমন কি কোন কোন জীবন আজ অবলুপ্তির পথে। এই জন্য সমগ্র দেশে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে আজ আর বনে গিয়ে শিকার করা সর্বত্র আইনসিদ্ধ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই শিকার কাহিনী পাঠকের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করবে তা ভবিষ্যতের কথা। তবে মূল্যবান বন্যপ্রাণী নিধন এক জিনিস আর—দুঃসাহসিক শিকার অন্য জিনিস। অজানা

জিনিসকে জানা ও পাওয়ার আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন। বর্তমান শিকার কাহিনী মানুষের মনের এই জানার স্পৃহা কিছুটা মিটাবে বলে মনে করি।

কনক লাহিড়ী

প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

আমি লেখক নই ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত। আকর্ষণীয় করে গল্প জমাবার .ক্ষমতাও অস্বীকৃত। আমার এই লেখা থেকে যাঁরা সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে গল্পের ধারা আশা করবেন তাঁরা নিরাশ হবেন সন্দেহ নেই। আমি নেহাৎই কারখানার মানুষ—কলকব্জা, লোহালক্কড় নিয়ে জীবন কাটিয়েছি। কর্মজীবনের আরম্ভ হতেই কোন অবসর পেলে শিকার সফর এবং আমার বিশেষ প্রিয় পুরাণো ধাঁচের বা মডেলের—'লাগোণ্ডা', ১৯২৬ সালে তৈরী মোটর গাড়ী —এই ছু'টি মনাকর্ষণী বা 'হবি' নিয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। আমার শিকার জীবনের কিছু বাস্তব ঘটনা বা অভিজ্ঞতার কথা—যা আপাততঃ পাঁচটি কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ —আপনাদের সম্মুখে বিনীত নিবেদনে সন্নিবেশিত হ'ল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সব বাস্তব কাহিনী ও কঠিন অভিজ্ঞতা সাহিত্য পর্যায়ে লেখা হ'লে হয়ত বইখানা মনোরঞ্জনে সমর্থ হ'ত। শিকারের কঠোর বাস্তব ঘটনাগুলি আটপৌরে লেখার মাধ্যমে বলতে সাহসী হয়েছি এই ভেবে যে বন-জঙ্গলের ঐ চিত্তাকর্ষক ঘটনাপ্রবাহ অনেকের ভাল লাগতে পারে; তা ছাড়া আগামী দিনের শিকারী ভাইয়েরা হয়ত গল্পগুলি পড়ে শিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'বার ইচ্ছা রাখবেন।

বই আকারে 'শিকার' প্রকাশিত হ'ত কিনা বেশ সন্দেহ ছিল —যদি না আমার স্নেহশীল স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু—বিশেষ করে শ্রীপঞ্চানন ঘোষ—যিনি তাঁর অক্লান্ত উৎসাহ দিয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য করে আমার এই প্রচেষ্টার সামিল না হতেন। তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। স্বজনদের মধ্যে

আমার শিকারের সবিস্তার বর্ণনা শুনে যাঁরা আমাকে সকল কথা সুসংবদ্ধ করে লেখার জন্য সর্বপ্রথম একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় দাদা শ্রীপ্রদ্যোতকুমার মুন্সী ও শ্রদ্ধেয়া বৌদি শ্রীমতি অনিন্দিতা মুন্সীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের বারবার অনুরোধ ও উৎসাহে আমি যে প্রেরণা লাভ করেছি তা অমূল্য; তাঁদের কাছে আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাই না। আমার গভীর শ্রদ্ধাই তাঁদের জন্য রইল।

পুস্তক সম্পাদনার গুরুভার ও প্রকাশনা কাজে আমার সহকর্মী ও সহোদর প্রতিম বন্ধুবর শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মূল্যবান সময় ব্যয় করে সঙ্কলনে সাহায্য করেছেন সে জন্য আমি বিশেষভাবে উপকৃত; বন্ধুবরের স্ত্রী শ্রীমতি ঘোষ বিষয়বস্তু পরিপাঠ করে কথাপ্রসঙ্গ গঠনে যে পরামর্শ দিয়েছেন সে বিষয় উল্লেখ না করা অমার্জনীয় হবে। এঁদের উভয়ের কাছেই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ঋণী রইলাম।

শিকার সফরে আমার যে সব শিকারী বন্ধু ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মিঃ কুট্স ও শ্রীভবানী গাঙ্গুলীর অবদান বিশেষ করে আনন্দ দেয়। মিঃ কুট্স আমাব অনেক শিকার যাত্রায় সঙ্গী হয়েছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা ও সাহায্য মূল্যবান ছিল সন্দেহ নেই। অন্যতম সঙ্গী শিকারী "ভবাদা"—শ্রীভবানী গাঙ্গুলীর শিকার পর্বে উৎসাহ, স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য ও তাঁর খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি যেমন আমাকে আকৃষ্ট করেছিল তেমনই পেয়েছিলাম আনন্দ তাঁর মধ্যে শিকারীর প্রশস্ত মনের পরিচয় পেয়ে। ভবাদা যেমন একজন ভাল শিকারী তেমনই একজন সাহসী, সক্ষম ও প্রেরণাদায়ক বন্ধু। এঁদের সাহায্য পাওয়া ভাগ্যের কথা। এই প্রসঙ্গে জঙ্গলের আদিবাসী সঙ্গীগণ বা সাধারণ কর্মীদের কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না। তাদের নিষ্ঠা, সাহস, কর্তব্যপরায়ণতা, তাদের

অপরিসীম কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার আমার স্মরণে চিরদিন সঞ্চিত থাকবে! আমার অভিজ্ঞতায় এইটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি—জঙ্গলে শিকার অভিযানে জঙ্গল দলটি বা Jungle Team পরিবেশ মাফিক মানিয়ে চলার মত উপযুক্ত হওয়া চাই এবং ঐ দলের সংগে শিকারীর সম্পর্ক খুব ভাল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হওয়া একান্ত দরকার।

উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি—ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন সাহা—যিনি গত বছর (১৯৭৫) Madam Cama-Mother of Indian Revolution বইখানি লিখে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ অনুগ্রহভাজন হ'বার সৌভাগ্য লাভ করেছেন—তিনি যে আমার এই প্রাথমিক লিখন প্রচেষ্টায় বিনা কার্পণ্যে সর্বপ্রকার সহযোগী হয়েছেন তার জন্য গৌরব বোধ করি। এ ছাড়া নিয়ত উৎসাহ, পরামর্শ ও সাহায্য দিয়েছেন সর্বশ্রী সহৃদয় বন্ধুগণ—সমর সেন, চন্দন দাসগুপ্ত। বইটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধির সহায়তা করেছেন সুবীর ঘোষ এবং শৌরি বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের সহকর্মী এবং 'ইস্কো' ইস্পাত কারখানার সিভিল ইঞ্জিনীয়র—কনট্রাক্টর শ্রীপরিমল রায় তাঁর পরিকল্পনা মত শিকারের সব স্থানগুলি মানচিত্রে সংস্থাপন করে দিক্‌দর্শনের কাজটি সহজ ও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করেছেন—এজন্য তাঁদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সবার কাছ থেকে সকল রকম সাহায্য না পেলে এ লেখা কোনক্রমেই সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠত না। পুনরায় আমার সহৃদয় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ সকলকেই জানিয়ে রাখি।

এই 'শিকার' পরিক্রমা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে স্থান লাভের অধিকার আশা করে না কিন্তু এক শিকারীর আজীবন সাধনা ও শিকারের বহু বাধা বিপত্তি ও দুর্ভোগের কথা—রম্য ভাবনার জাল

বুনে সফরের কোন কাহিনীকে রঞ্জিত করে তোলা হয় নি—এ কথা গ্রহণীয়। আশা রাখব আমার এই বিনীত প্রচেষ্টা পাঠক সমাজের সহানুভূতি ও আকর্ষণ লাভে বঞ্চিত হবে না।

৪১।২, আপকার গার্ডেন্‌স্
আসানসোল।

হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

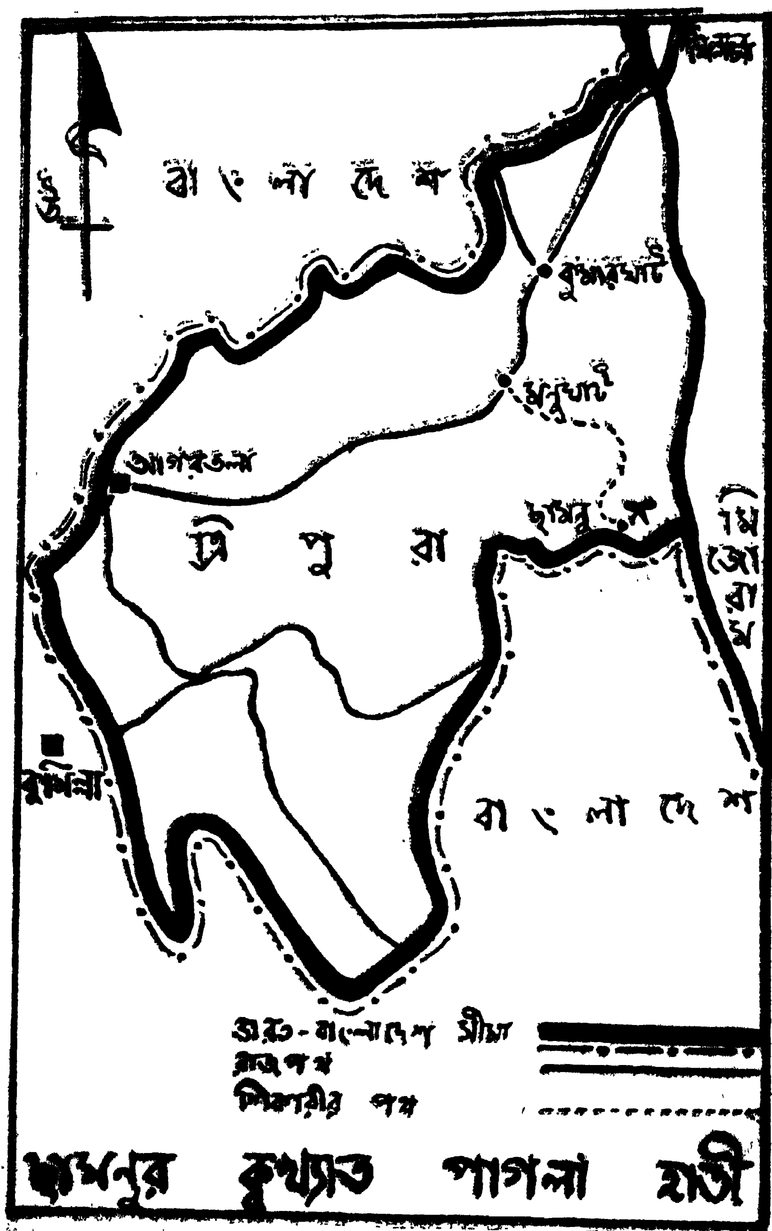
আলোচনা

'শিকার' রচনায় যে সমস্ত ব্যক্তিচরিত্র, সফরের নানা বৈচিত্র্যময় পরিবেশের মধ্যে, ক্রমবিকাশ হয়েছে তার মধ্যে শিকার যাত্রীরা সকলেই লেখকের একান্ত বন্ধুস্থানীয় ও শুভানুধ্যায়ী। বহু স্থানে শিকার ব্যবস্থায় যে সমস্ত 'জঙ্গলদল' লেখকের সঙ্গী হয়েছেন এবং কর্মপটুতায়, কর্তব্যজ্ঞানে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁকে সাহায্য করেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর কৃতজ্ঞতা ভাজন; এজন্য লেখক সকলের কাছেই ঋণী। বিভিন্ন অবস্থার চাপে কার্যকলাপে বা কথাবার্তায় যদি কোন বিরূপ বাক্য সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ করা হয়ে থাকে তবে তাহা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, কোনও প্রকার ব্যক্তি সমালোচনা করা বা হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য নহে।

বহু বছর ঘটনাগুলি ঘটে গেছে—শিকারসঙ্গীদের মধ্যে কেহ কোনওরূপ ক্ষুণ্ণতা বোধ করলে—লেখকের মার্জনা ভিক্ষা তাঁদের কাছে রাখা গেল।

লেখক

ছা-মনুর কুখ্যাত পাগলা হাতী



ছামনুর কুখ্যাত পাগলা হাতী

ছা-বস্তুর কুখ্যাত পাগলা হাতী

আমার বহুদিনের শিকারী জীবনের সফলতা, বিফলতা ও বিপত্তির অভিজ্ঞতা পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় যখন এলাম তখন শিকারের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে ভাবা একটু জরুরী মনে হোল। প্রত্যেক অভিজ্ঞ শিকারী বহুদিন শিকার করার পর আমার মত শেষ অধ্যায়ের কথা যে ভাবেন তা আমি হলপ করে বলতে পারি। শিকারের শেষ অধ্যায় বলতে কি বোঝায় তার একটু ব্যঞ্জনা দরকার। যাঁরা আমার মত বহুদিন শিকার করেছেন তাঁদের এই শেষ অধ্যায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে একবাক্যে বলবেন দু'টি ভীষণ, দুর্ধর্ষ ও অসম্ভব বুদ্ধিধারী হিংস্র জন্তু শিকাবের কথা। একটি হ'ল পাগলা হাতী ও অপরটি মানুষ-খেকো বাঘ। এই দু'টো জন্তু যখন যেখানে উপদ্রব সুরু করে তখন সেখানকার প্রত্যেক লোকের আহার-নিদ্রা সবকিছু ঘোচাতে হয় এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রাণ, ক্ষেতের ফসল, ঘরবাড়ি সবকিছু খোয়াতে হয়। এমন অনেক উপদ্রুত এলাকা দেখা গেছে, যেখানে মানুষ সবকিছু ফেলে তাদের প্রাণ নিয়ে বহুদিনের বাসস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। যাই হোক, শেষ অধ্যায়ে এসে এই দু'টো জন্তুর কথা মনে হ'ল সর্বাগ্রে। তখনও আমার হাতী শিকার হয়নি। কাজেই দু'য়ের মধ্যে অগ্রাধিকার পেল পাগলা হাতী।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—হাতী গুণ্ডা বা পাগলা হয় কেন? জন্তুজগতে যারা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে যেমন হাতী, বন্য মহিষ, বাইসন, হরিণ ইত্যাদি। তাদের মধ্যে দলীয় কয়েকটি নিয়মশৃঙ্খলা প্রচলিত আছে এবং দলের সকলেই সে সব মেনে নিয়ে একসঙ্গে বাস করে। এরা একে অন্যের প্রতি খুব স্নেহশীল এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় দলের বয়স্ক হস্তিনীই দলের মধ্যে নেতৃত্ব করে,

কারণ, দেখা গিয়েছে হস্তিনীদেরই দায়িত্ব ও পরিচর্যা জ্ঞান পুরুষ হাতীর চেয়ে অনেক বেশী হয়। আর একদিকে দেখা যায় দলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পুরুষ হাতীও সমস্ত দলের উপর সর্বাধিনায়করূপে নেতৃত্ব করে থাকে এবং সে-ই সমস্ত হস্তিনীদের হারেমের মালিক বলে গণ্য হয়। দলের কোনও বিপদে এই মদ্দাহাতী তার পালের সকল নিরাপত্তার ভার নিয়ে থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠ মাদীহাতী তার দলের পরিবারটির সর্বপ্রকার দেখাশুনা ও দল প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয়—আর মদ্দানেতা প্রজননকার্যের ও দলের বিপদ-আপদ মোকাবিলা করবার ভার নেয়। এই দলপতি সব সময় ঠিক দলের মধ্যে থাকে না, দল থেকে কিছু তফাতে আপন মনে চলাফেরা করে কিন্তু দলনেতৃর কাছ থেকে কোন বিপদ-সঙ্কেত পেলে তৎক্ষণাৎ দলের মধ্যে এসে সকলের নিরাপত্তার ভার নেয়।

চিরকাল একই মদ্দাহাতী দলের নেতৃত্ব করতে পারে না। দলের কোন কোন যুবক হাতী বেশ শক্তিশালী হয়ে হারেমের মালিকানা ও দলের নেতৃত্ব লাভের জন্য তার দলপতির সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই বাধিয়ে দেয়। এইসব লড়াইয়ে যতদিন পর্যন্ত আগের নেতাই জয়-লাভ করে, ততদিন পর্যন্ত তার নেতৃত্ব বজায় থাকে। যদি কখনও এই হারাজিত-লড়াইয়ে দলপতি হেরে যায়, তবে সে দলছুট হয়ে মনে মনে পরাজয়ের গ্লানি ও আক্রোশ এবং শারীরিক জখম নিয়ে একটা মারমূর্তিতে একা একা আপন মনে ঘুরে বেড়ায়—যাকে ইংরেজিতে বলে "লোন বুল"। সেই সময় হাতীটার মনের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে থাকে এবং এতদিনের নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত এবং শারীরিক জখম নিয়ে সে অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী হয়ে পড়ে। সেই সময় দেখা যায় মানুষ বা অন্য কোনও জন্তু-জানোয়ার তার সামনে এলেই মারমূর্তি নিয়ে ছুটে যায় এবং তাদের মেরেও ফেলে। এই স্বভাব ক্রমশঃ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, তখন মানুষের ঘরবাড়ি ও ফসলের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। ঐ ক্ষ্যাপা অবস্থায় ছুঁচারজন

লোক মারতে আরম্ভ করলেই বন বিভাগের লোক তাকে "পাগলা হাতী" বলে নির্দিষ্ট করে।

আরও এক কারণে হাতী গুণ্ডা বা পাগলা হয়ে ওঠে। মদ্দাহাতী বছরের কোন সময়ে "মস্ত" হয়ে যায়, তখন তার কপাল দিয়ে সব সময় একরকম আঠার মত তেলজাতীয় স্বেদ বা ঘাম নির্গত হতে থাকে। সেই স্বেদের গন্ধে হাতীর বিশেষ ধরনের স্নায়বিক চঞ্চলতার সৃষ্টি হয় এবং সেই স্বেদ বা ঘাম যতদিন থাকে ততদিন সে পাগলা হাতীর মত নানা রকম উৎপাত আরম্ভ করে দেয়। ওই সময় সে তার দলের হাতীর সঙ্গেও অকারণ ঝগড়া বা লড়াই বাধিয়ে দেয় এবং তখন মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার মারতে দেখা যায়। স্বেদ নির্গম বন্ধ হলে আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। গুণ্ডা বা পাগলা হাতীর ঐ সব উৎপাত বন্ধ করার জন্য সরকারের বন বিভাগের চীফ কনজারভেটর অব ফরেষ্ট ও ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনারের যুগ্ম অনুমতি ক্রমে সেই হাতীকে মেরে ফেলবার বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

হাতী বা বাঘের এই ধরণের ক্ষ্যাপামির জন্য আমরা মানুষরাও অনেক অংশে দায়ী—যেমন, হাতীকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্য "বারো বোরের" বন্দুক চালিয়ে অথবা বর্শা বা তীর-ধনুক মেরে তাকে জখম করে দেওয়া হয়—ফলে সেই আহত জন্তুটির মানুষের উপর বিশেষ করে আক্রোশ জন্মায় এবং ঐ অবস্থায় মানুষ দেখলেই সেই সব হাতীর প্রবল ইচ্ছা হয় যে তার এই জাতীয় শত্রুকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছড়ে মেরে চারটি গোদা গোদা পা দিয়ে পিষে ফেলতে এই ধরনের বদ্‌মেজাজী হাতীর মত বাঘকেও "মানুষ খেকো" করে তোলার জন্য আংশিকভাবে মানুষই দায়ী। যদিও এসব কারণ ছাড়া আরও নানা কারণ আছে, যার জন্য বাঘ গ্রাম বসতিতে ঢুকে মানুষ বা গৃহপালিত পশু মেরে খাদ্য সংগ্রহ করে। ঐ সকল কারণের মধ্যে বিশেষ একটি কারণ "Ecological imbalance" যার অর্থ বলা যেতে পারে—জীবজগত সংরক্ষণে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অভিজাত

করা—যাতে করে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং এজন্য মানুষের সভ্যতাই দায়ী। সে যা হোক, উদ্দেশ্য আমার পাগলা হাতী শিকার।

শিকার চেষ্টা কি হবে তা ত ঠিক করা গেল, অতঃপর আমার প্রথম কাজ হোল পাগলা হাতীর সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব খবরাখবর জোগাড় করা, প্রতিদিন কাগজে শ্যেনদৃষ্টি রাখা এবং আমার সব বন্ধুবান্ধবদের বলে রাখা, তাদের নজরে যদি কোন খবর পড়ে তাহলে তারা যেন দয়া করে আমাকে জানান। ১৯৬০ সাল থেকে আমার শিকারী জীবনের শেষ অধ্যায়ের অভিযান শুরু হল। আমাদের কাছাকাছি আসাম, ত্রিপুরা ও উড়িষ্যায় হাতী পাওয়া যায়। আমার কয়েকজন সুহৃদের মাধ্যমে আমি আসাম ও ত্রিপুরার সরকারী গেজেট জোগাড় করতে সুরু করলাম। হাতী বনবিভাগের সুরক্ষিত জন্তু; ১৮৭৯ সাল হ'তে পূর্বের বৃটিশ সরকার এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল সারা ভারতে। পুরাকালে হিন্দু রাজত্বে এবং পরে পাঠান-মোঘল আমলে হাতী সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। যদিও লিখিত আইন ছিল বলে জানা যায় না; কারণ হাতী রাজা-মহারাজা ও সম্রাটদের বাহন ছিল, যুদ্ধ এবং ভারবাহী হিসাবেও অত্যন্ত দরকারী প্রাণী ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রচুর প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষতি না করলে 'পাগলা হাতী' বলে ঘোষণা করা হয় না। হাতী পাগলা হলে বিভাগীয় কমিশনার ও চীফ কনজারভেটর-অফ-ফরেস্ট-এর যুগ্মসম্মতি-ক্রমে তাকে পাগলাহাতী হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং তখনই ওই হাতীকে মারবার জন্য হুকুম দেওয়া হয়। বনবিভাগের লোক জমিতে সেই হাতীর পায়ের ছাপ থেকে আন্দাজ করে তার উচ্চতা, দাঁতাল মদ্দাহাতী কিনা, হস্তিনী কি মাখনা ইত্যাদি প্রত্যক্ষদর্শীর খবরাখবরের মাধ্যমে সনাক্তকারক চিহ্ন জোগাড় করে,

হয়। এই সবের বিস্তারিত বিবরণ—এবং শিক

জন্য কত পুরস্কার দেওয়া হবে এই খবরগুলি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়।

আমাদের দেশে হাতী তিন রকমের আছে; যথা প্রথম—দাঁতাল বা মদ্দা হাতী, দ্বিতীয়—হস্তিনী, এদের দাঁত থাকে না; তৃতীয়—মাখনা, দাঁতবিহীন মদ্দা হাতীকেই মাখনা বলা হয়। সাধারণতঃ আমাদের দেশে হস্তিনী ও মাখনা হাতী উভয়েরই দাঁত হয় না কিন্তু খুব বড় হলে কখনও কখনও সরু সরু ছোট দাঁত হ'তে দেখা যায়। মাখনা হাতী সম্পর্কে কেউ যদি ভাবেন যে এরা নপুংসক, তাহলে বিশেষ ভুল করা হবে—এদের সন্তান উৎপাদনের শক্তি যথেষ্ট আছে এবং এরা খুব শক্তিশালী হয়। অনেক সময় দেখা গেছে, দলীয় নেতৃত্বের জন্য মদ্দা দাঁতাল হাতীর সঙ্গে মাখনা হাতীর লড়াইয়ে মাখনা হাতী প্রচণ্ড শক্তিতে শুঁড় দিয়ে দাঁতাল হাতীর দাঁত সবলে উপড়ে ফেলেছে। মাখনা হাতীকে ভগবান যেমন দাঁত দেননি, সেই ক্ষতিপূরণ করেছেন তার ঘাড়ে ও শুঁড়ে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে। দেখা যায় মাখ্না—দাঁতাল মদ্দাহাতীর চেয়ে বলিষ্ঠ হয় ও উচ্চতাতেও কিছু বড় হয়, তাদের লড়াই করবার ক্ষমতাও সাধারণতঃ বেশী হয়ে থাকে। হাতী মারার হুকুম সরকার দুই কারণে দিয়ে থাকেন। প্রথম—হাতী পাগলা হলে, দ্বিতীয়—হাতীর সংখ্যা খুবই বেড়ে গেলে। হাতীর সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে, কিছু হাতী মেরে হাতীর সংখ্যা কমান হয়। একে 'এলিফ্যান্ট পপুলেশন কনট্রোল' বলা হয়। সেই সময় সরকার 'এলিফ্যান্ট কনট্রোল লাইসেন্স' দিয়ে থাকেন। এই লাইসেন্সে সাধারণতঃ বন্য হাতী মারা হয়। আমাদের দেশে কোন কোন প্রদেশে দাঁতাল মদ্দাহাতী মারার সঙ্গে তিনটে মাদী হাতী মারতে হবে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এগুলো সাধারণ জংলীহাতী; স্বভাবতঃ ওরা নিরীহ ও ভীরু। পাগলা হাতীর সংগে ওদের স্বভাবের কোন মিল নেই।

আমার পাগলা হাতী শিকারের প্রস্তুতিপর্ব সুরু হোল ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে এবং তা ক্রমশই গড়িয়ে চলল ১৯৬৬ সালের

নভেম্বর মাস পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আমার নানা যোগাযোগ, আবেদন ও অনুরোধের পালা। আসাম ও ত্রিপুরার কমিশনার ও কনজারভেটর-অফ-ফরেস্টস্, এঁদের সঙ্গে নানা যোগা-যোগের ফলে আমার শিকার দরখাস্তের ফাইল ক্রমশঃ কেবল আয়তনেই বৃদ্ধিলাভ করলো কিন্তু কিছুতেই আর পাগলা হাতী শিকারের অনুমতি পেলাম না। ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে আমার কাকা স্বর্গীয় সত্যেন ব্যানার্জী, আই. সি. এস-এর ছোট ছেলের বিবাহ উপলক্ষ্যে আমাকে কোলকাতায় যেতে হয়। এই বিয়েতে উপস্থিত সুধীজনের মধ্যে আমার কাকার বিশেষ স্নেহের পাত্র, বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গের বনবিভাগের সর্ব উচ্চপদস্থ অফিসার, শ্রীকণক লাহিড়ী মহাশয়ের উপস্থিতি এবং তাঁর সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় গুসুংয়ের মহারাজা শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়কেও দেখি। মহারাজ খুবই অভিজ্ঞ শিকারী এবং শিকারী হিসাবে পেশাগত সাদৃশ্য থাকায় আমাকে খুবই স্নেহ করেন। তাঁদেরকে একযোগে আমার পাগলা হাতী শিকার করতে যাবার উদ্যমের কথা বলতে, মহারাজ আমাকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দেন ও আশীর্বাদ করেন। লাহিড়ী মহাশয় আমার গত কয়েক বছরের নানা প্রচেষ্টার কথা শুনে এবং এ-বিষয়ে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হ'লে দয়াপরবশ হ'য়ে বলেন, যদি ত্রিপুরাতে 'পাগলা হাতী' থাকে এবং সরকারী গেজেটে সেই খবর বার হ'য়ে থাকে, তাহলে তিনি আমাকে অনুমতির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আমার একান্ত অনুরোধে তিনি জানান যে, সপ্তাহকাল মধ্যে খবর নিয়ে তিনি আমাকে সমস্ত জানাবেন। দিন কয়েকের মধ্যেই লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে ত্রিপুরার চীফ ফরেস্ট অফিসার, শ্রী এন. সি. ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা একটি চিঠি পাই। তিনি আমাকে ত্রিপুরার কমিশনারের কাছে একটা আবেদনপত্র পাঠাবার কথা এবং তাঁর কাছে আমার আবেদনপত্রের একটা অনুলিপিও পাঠাবার কথা বলেছেন। আমি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিপুরার কমিশনারের কাছে

পাগলা হাতী মারার অনুমতির জন্যে আবেদনপত্র পাঠাই এবং তাঁকে তার একটা অনুলিপি পাঠাই। এইভাবে ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষ থেকে ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আমাদের বহু চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হয়। কিন্তু বনবিভাগের নিয়মকানুন অনুযায়ী যা-কিছু করার সমস্ত ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কমিশনার সাহেবের দপ্তর থেকে কোন অনুমতি পাওয়া গেল না। অনেক চিঠি লেখার পর ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ কমিশনার সাহেবের দপ্তর থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সই করা একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন—"উপস্থিত ত্রিপুরাতে কোন পাগলা হাতী নাই, অতএব আপনার আবেদনপত্র নাকচ হইয়া গেল"। এই চিঠি পেয়ে আমি অত্যন্ত বিমর্ষ ও হতাশ হয়ে পড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয় ও ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে খুব করুণস্বরে আমার মর্ম-যাতনার খবর দিয়ে চিঠি দিই। আশ্চর্য, ভট্টাচার্য মহাশয় কিন্তু আমার চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই টেলিগ্রাম করে আমায় জানান যে, ১লা মার্চ নাগাদ আমি যেন আগরতলায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং তখনই তিনি পাগলা হাতী শিকারের যাবতীয় অনুমতিপত্র কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে বার করে দেবেন। এই খবর পেয়ে শিকারের আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় আমার প্রাণ ভরে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার শিকারী বন্ধু ভবানী গাঙ্গুলীর কাছে গেলাম এবং তাকে এই সুখবরও জানালাম। খবর শুনে সে আনন্দে অধীর হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং কালবিলম্ব না করে আমরা যাত্রার প্রস্তুতি করতে লাগলাম।

অতঃপর প্রস্তুতি পর্ব। প্রথমে ঠিক হ'ল জীপে করে যাওয়া হবে আগরতলা। রাস্তার নক্সা দেখে কোন পথ দিয়ে যাওয়া হ'বে তা ঠিক করা হ'ল। আগরতলা মোটরপথে যাওয়া অনেকটা ঢেঁকিশাল-দিয়ে কটক যাবার মতন; অনেক ঘুরে প্রায় ১৫০০/১৫৫০ মাইলের মতন রাস্তা। ভবানী জীপ চালাতে অভ্যস্ত না হওয়ায়, আমার

একার পক্ষে জীপ চালিয়ে গিয়ে শিকার করে ফিরে আসা একটু বিপদজনক মনে হোল। তাই সন্ধানী হলাম—তৃতীয় শিকারী বন্ধুর, পাওয়াও গেল কাছেই—আমাদের এখানকার একজন পুলিশ অফিসার শ্রী এন. সি. সেন। তিনি আমাদের সাথে যেতে রাজী হলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর পক্ষে এক নাগাড়ে এক মাসের ছুটি জোগাড় করা অসম্ভব বলে জানালেন। সেই সময়ে আমাদের এক বিশেষ বন্ধু, উপস্থিত আসামের এক উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার, শ্রী এম. দাস মহাশয় বার্ণপুরে আসেন। তাঁকে আমাদের হাতীশিকার উদ্যোগের সমস্ত খবর, বিশেষতঃ জীপে করে ত্রিপুরায় যাচ্ছি বলাতে তিনি আমাদের জীপে করে ত্রিপুরায় যাবার জন্যে বিশেষভাবে মানা করেন। কারণ, সে সময়ে শিলচর থেকে ত্রিপুরা যাবার পথে মিজোদের উপদ্রব খুব উগ্রভাবে চলছিল। তিনি আমাদের বিমান-পথে যাবার কথা বলেন এবং আসামে ফিরে যাবার পথে কোলকাতায় তিনি আমাদের জন্যে তিনখানা প্লেনেব টিকিট কিনে রেখে যান। এতে আমাদের খুবই সুবিধে হয়। অন্যথায়, আমরা যথাকালে ত্রিপুরায় পৌঁছাতে পাবতাম না।

২৫শে ফেব্রুয়ারী রাত্রের গাড়ীতে আমরা কোলকাতা রওনা হলাম। ভোরে কোলকাতায় পৌঁছে প্রথমেই সংগ্রহ করলাম 'প্লেনের' টিকিটগুলি এবং পরে 'এয়ার ইণ্ডিয়াব' সেণ্ট্রাল বুকিং অফিসে গিয়ে মিঃ সেনের টিকিটটি ফেরৎ দিয়ে সোজা রওনা হলাম বিমানবন্দর অভিমুখে। সেখানে আমাদের আরেক বন্ধু শ্রী এ. কে. বিশ্বাসের বাড়ীতে উঠলাম। উনি 'এয়ার ইণ্ডিয়ার' আবহাওয়াবিদ। সেখানে আদরযত্ন ও খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে, বন্ধুটির সাহায্যে আমাদের বন্দুক প্রভৃতি জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়ার যে-সব বাধা ও নিয়মকানুন আছে, সেগুলোর ব্যবস্থা করে ফেললাম। আমরা দুপুর প্রায় তিনটের সময় আই. এ. সি-র "ফকার ফ্রেণ্ডশিপ" বিমানে চেপে, চারটের কিছু আগেই আগরতলায় পৌঁছুলাম।

বিমান বন্দরে পৌঁছে ভাবছি এরপর কি করবো—এই সময় একজন অল্পবয়সের যুবক এসে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমার নাম শুনে জানালেন—তিনি বনবিভাগের অফিস থেকে এসেছেন আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে এবং উপরমহলের নির্দেশমত তিনি আগরতলার 'সার্কিট হাউসে' আমাদের সে রাত্রের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে এসেছেন। তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা কাল-বিলম্ব না করে বনবিভাগের জীপে মালপত্র তুলে 'সার্কিট হাউসের' দিকে রওনা হলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই 'সার্কিট হাউসে' পৌঁছে, যত-শীঘ্র সম্ভব আমাদের মালপত্রগুলি নির্দিষ্ট কামরায় রেখে সেই জীপে-করেই আমরা বনবিভাগের অফিসে গেলাম। আলাপ হোল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সাথে, তিনি আমাদের প্রচুর খাতির-যত্ন করলেন। অসময়ে পৌঁছলেও তিনি নিজের চেষ্টায় আমার কাগজপত্র যদ্দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সমস্ত সরকারী নিয়মকানুন সেরে কমিশনার সাহেবের হুকুমনামাপত্র ইত্যাদি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন।

শিকারের ফি, ট্রেজারিতে জমা করার চালান ও রসিদ আমরা পেয়ে গেলাম সাথে সাথে। নিজের তরফে তিনি খবর পাঠিয়ে দিলেন বন ও পুলিশ বিভাগের সবকটি দপ্তরে যে আমরা পাগলা হাতী-শিকারের অনুমতি পেয়েছি এবং আমাদের নির্দেশ দিলেন আমরা যেন পরের দিন ভোরে রওনা হয়ে আগরতলা থেকে ৭৫ মাইল দূরে—'আগরতলা—কোলকাতা' রোডের ওপর মনুঘাটে যে বনবিশ্রামাগার আছে সেখানে গিয়ে পৌঁছাই। তিনি দুপুর তিনটের মধ্যে ওখানে আমাদের সাথে দেখা করবেন এবং ফরেষ্ট অফিসার ও ফরেষ্ট-রেঞ্জারদের ডেকে একটা ছোটখাট বৈঠক বসিয়ে আমাদের হাতী-শিকারের প্রকল্প ঠিক করে দেবেন। এই নির্দেশ পাবার পর আমাদের কয়েকটি সমস্যা দেখা দিল; যথা, প্রথমতঃ—বিমানপথে আসার জন্যে আমাদের একমাসের খাওয়া-দাওয়ার রেশন ইত্যাদি আনা সম্ভব

হয়নি ; দ্বিতীয়তঃ—সঙ্গে আমরা কোন পাচক নিয়ে যেতে পারিনি এবং তৃতীয়তঃ—রান্নার কোন বাসন-কোসনও আমরা নিয়ে যেতে পারিনি একটু কিন্তু করে, সাহসে ভর করে আমি ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে আমাদের সমস্যাগুলি পেশ করলাম। আশ্চর্য, তিনি প্রত্যেকটি সমস্যাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করে দিলেন। যে ভদ্রলোকটি জীপ নিয়ে বিমানবন্দরে আমাদের আনবার জন্য গিয়েছিলেন, তাঁকে নির্দেশ দিলেন—আগরতলা বাজারে আমাদের নিয়ে গিয়ে, রেশন ও আনুসঙ্গিক জিনিষ কিনতে সাহায্য করার জন্য। পাচক সম্বন্ধে তিনি বললেন—"এটা কোন সমস্যাই নয়। কারণ আপনাদের সঙ্গে আমাদের বনবিভাগের একজন 'ফরেষ্ট গার্ড' সব সময়ের জন্যই থাকবে, বনবিভাগের আইনকানুন ইত্যাদি ব্যাপারে আপনাদের সাহচর্যের জন্য। আপনাদের সুবিধার্থে আমবা এমন একটি লোক সঙ্গে দেব, যে নিজের রান্নার সঙ্গে আপনাদের কিছু রেঁধে খাওয়াতে পারবে। বনবিভাগেরই যে তৈজসপত্র আছে, তাই থেকে কিছু কয়েকদিনের ব্যবহারেব জন্য বার করে দেওয়া মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়।" আমরা অত্যন্ত খুসী হয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আগরতলা বাজারের দিকে রওনা হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কেনা হয়ে যাবার পর আমরা অতিকষ্টে ট্রেলার সমেত একটা জীপ ভাড়ার বন্দোবস্ত করলাম, যাতে করে ভোরে আগরতলা ছেড়ে আমরা মনুঘাটে পৌঁছাতে পাবি।

দূরত্বের তুলনায় ভাড়া কিছু বেশী,—মাথা পিছু ৩০ টাকা করে। যদিও সুরুতে আমরা থাকব তিনজন—আমি, ভবানী ও ফরেষ্ট গার্ড জিতেন, কিন্তু জীপওয়ালা আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে নিল যে, পথে সে তার সুবিধা ও সুযোগমত অন্য যাত্রীও ওঠাতে নামাতে পারবে। ওটাই ওখানকার দস্তুর হওয়ায় ওই ব্যবস্থায় রাজী হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না।

ব্যবস্থা অনুযায়ী পরের দিন ভোর ছ'টায় জীপ এল 'সার্কিট-

হাউসে'। আমরা ভোরবেলা থেকেই প্রস্তুত হ'য়ে ছিলাম। জীপ আসার সাথে সাথে মালপত্র ট্রেলারে চাপিয়ে আমরা মনুঘাটের দিকে রওনা হ'লাম। ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। আগরতলা থেকে ১৫।২০ মাইল আসার পর সুরু হোল বেশ ঘনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ। রাস্তায় অনেক জায়গায় লোক ওঠান নামান ইত্যাদি সেরে আমরা প্রায় তুপুর আড়াইটার সময় মনুঘাট বনবিশ্রামাগারের কাছে এলাম। মালপত্র বয়ে নিয়ে ভেতরে গিয়ে দেখি ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের পেঁীছাবার আগেই এসে তাঁর কর্মচাবীদের নিয়ে বৈঠক করে আমাদের পাগলা হাতী শিকারেব প্রাথমিক খসড়া করে ফেলেছেন। আমরা যেতেই তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে জানালেন যে মনুঘাট থেকে ১৮-২০ মাইল তফাতে ছা-মনু বলে একটা ছোট্ট জায়গা আছে, সেখানে একটা পাগলাহাতী খুবই উপদ্রব করছে। ইতিমধ্যে হাতীটা ৬।৭ জনকে মেরে ফেলেছে —সর্বশেষ লোকটি মারা পড়ে মাত্র ৩।৪ দিন আগে। তাঁর অনুরোধ, আমরা যেন প্রথমেই ওই হাতীটি মারবার চেষ্টা করি এবং ইতিমধ্যে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা অন্যান্য জায়গায় পাগলা হাতীর খবব জোগাড় কবে রাখবে' অতঃপর তিনি ছা-মনুব পাগলা হাতীটির যাবতীয় পরিচিতি আমাদের জানান। তাব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোল হাতীটির লেজটি কাটা। এই বিশেষ পরিচিতি মনে রাখার পক্ষেও খুব সহজ। এসত্বেও তিনি বারবার করে বলে দিলেন, যে একেবারে নিশ্চয় না হয়ে আমরা যেন গুলি না চালাই। যদি ভুলক্রমে ওই হাতীটি না মেরে আমরা অন্য কোনও হাতী মারি তাহলে আমাদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হবে। খুব বেশী টাকার জরিমানা সমেত জেলও হতে পারে। আমরা ভদ্রলোককে কথা দিলাম যে আমাদের তরফে নিয়মলঙ্ঘন করার কোনই সম্ভাবনা থাকবে না এবং আমরা যদি চিহ্নিত পাগলা হাতীটি খুঁজে বার না করতে পারি, তাহলে খালি হাতে ফিরে এসেই তাঁর সম্মান রাখার

চেষ্টা করবো। তিনি আমাদের ওই প্রতিশ্রুতি পেয়ে খুব খুশীমনে আমাদের বাকী ব্যবস্থার ভার মিঃ দাস বলে একজন বিভাগীয় ফরেষ্ট অফিসারের উপর দিয়ে আগরতলায় ফিরে গেলেন।

তারপর সুরু হোল মিঃ দাসের সঙ্গে আমাদের বৈঠক। কিন্তু প্রথম সমস্যা হোল ছা-মনু যাওয়া। মিঃ দাস বললেন, ওই পথে তাঁর কিছু কাজ আছে এবং তাঁকে কাল যেতে হবে। আমরা ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গে কিছুটা পথ যেতে পারি। আমরা তৎক্ষণাৎ সানন্দে রাজী হলাম। পরের দিন সকালে চা ও বিস্কুট সহযোগে প্রাতঃরাশ সেরে আমরা মিঃ দাসের সাথে জীপে চেপে বসলাম। ওই অঞ্চলের পথঘাট খুবই খারাপ। সামনেই সুবিশাল লংথরাই পাহাড় শ্রেণী।—তারই কোল দিয়ে দিয়ে রাস্তা। মাঝে মাঝে চোখে পড়ল দু-একটা ছোটখাট পাহাড়ী বসতি। সবই বাঁশের খুঁটির উপর ৫।৬ ফুট উচুঁতে মাচানের উপরে বাঁশের ছাউনির ঘরবাড়ী, ঐ বাঁশ দিয়েই ঘরের পাটাতন ও চার দেওয়াল তৈরী। চোখে পড়ল মেয়েদের গলায় নানা রঙের পুঁতির মালা এবং উপরের অঙ্গবস্ত্র কিছুই নেই। কোমর থেকে ছোট বহরের নিজেদের হাতে বোনা মোটা রঙ বেরঙয়ের লুংগি পরা ; শিশুরা অধিকাংশই উলঙ্গ, তাদের স্বাস্থ্যের ছ্চটা চোখে পড়ে, পুরুষরা বেশ স্বাস্থ্যবান, কোমরে এক ফালি কাপড়ের কপ্নি জড়ান। সকলেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এই বসতিগুলি সাধারণতঃ একটু উঁচু টিলার উপরেই দেখতে পেলাম। এর মধ্যে দিয়ে প্রায় দু' ঘণ্টা চলার পর বেলা দশটা নাগাদ আমরা এমন একটা জায়গায় এলাম, যেখান থেকে জীপে আর একটুও এগুনো সম্ভব নয়। মিঃ দাস বললেন, ওখান থেকে প্রায় ৭।৮ মাইল হাঁটাপথে গেলে পাওয়া যাবে ছা-মনুর 'বিট অফিস' এবং ওটাই হবে আমাদের 'বেস্ ক্যাম্প'। ওখানে আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে পাগলা হাতী শিকারের অভিযান সুরু করতে হবে। জীপ থেকে নেমে আমরা ভাবছি

আমাদের সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা কি করে ৭।৮ মাইল পথ যাব। কাছেই জনকয়েক মজুর একটা পাহাড়ী নদীর ওপর বাঁশ দিয়ে একটা পুল মেরামত করছিল। আমরা প্রথমে দ্বারস্থ হলাম তাদের কাছে। কিন্তু পর্যাপ্ত বকশিসের বিনিময়েও তাদের রাজী করাতে পারলাম না। এই সময় প্রায় শ'খানেক গজ দূরে, মাটির আল বেয়ে জন পনেরো লোককে ওপরে আসতে দেখলাম। ওদের দিকে মিঃ দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে, তিনি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "আপনাদের বরাত ভাল—ওই আলের অপর পারে বয়ে যাচ্ছে মন্নুনদী এবং ওই নদীপথে নৌকা করে এসেছে সদ্যবিবাহিত বর-কনে ও তাদের সহযাত্রীরা।" মিঃ দাস আমায় বললেন, "বুঝলেন—কেন বললাম আপনাদের বরাত ভাল?" আমি তখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি তাই বোকার মতন তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর তিনি বললেন, "ওই বর-কনে ও তাদের সহযাত্রীরা ছা-মন্নু থেকে নদীপথে ওখানে এসেছে। এবার ওদের নামিয়ে দিয়ে খালি নৌকা ছা-মন্নুর দিকে ফিরে যাবে। আপনারা ইচ্ছে করলে ওই খালি নৌকায় চেপে মালপত্র নিয়ে যেতে পারেন।" বলেই তিনি পাঠালেন জিতেনকে নৌকার মাঝির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই জিতেন ফিরে এল মাঝির সম্মতি নিয়ে। সময় নষ্ট না করে আমরা মালপত্র ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে তুললাম নৌকায়। এমন সময় বেশ শক্তসমর্থ গোছের একটি পাহাড়ী লোক এসে হাজির হোল নৌকার কাছে—বিদেশীদের দেখার সাধারণ কৌতুকবশতঃ বোধহয়। মিঃ দাস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে আমাদের সঙ্গে বন্দুকের বাক্স বয়ে ছা-মন্নু যেতে রাজী কি-না। লোকটি রাজী হওয়ায় মিঃ দাস আমাদের বললেন, বন্দুকগুলি নিয়ে আমরা যদি হাঁটাপথে ছা-মন্নু যাই, তাহলে নৌকার অনেক আগেই ছা-মন্নু পৌঁছে বিশ্রাম করতে পারব, কারণ নৌকা অনেক ঘোরাপথে যাবে। মালপত্র আগলে নৌকায় বসল জিতেন মাঝিদের

সঙ্গে এবং সুরু হল যাত্রা। আমি ও ভবানী পাহাড়ী লোকটার মাথায় বন্দুকের বাক্স চাপিয়ে জুতো-মোজা খুলে প্যান্ট গুটিয়ে নদী পার হয়ে এগিয়ে চললুম। কারণ মিঃ দাস বললেন নদীর যে পাড়ে আমরা আছি সে পাড়ের জঙ্গল এতই ঘন ও গভীর যে হাঁটা পথেও যাওয়া সম্ভব নয়, নদীর অপর পাড দিয়ে একটা 'পাকদণ্ডি' বা হাঁটাপথ আছে সেই পথ ধরে গেলে অনায়াসেই আমরা ছা-মন্নু পৌঁছুতে পারব। আমাদের বিদায় দেবার আগে মিঃ দাস ছা-মন্নর বীট অফিসার মিঃ চক্রবর্তীর কাছে আমাদের পরিচিতি ও সাহায্যের জন্য একটা চিঠি দিলেন। আমরা তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

প্রায় সাড়ে তিনটে সময় আমরা ছা-মন্নর বনবিভাগের বীট অফিসে এসে পৌঁছলাম। অফিসটি একটা মনোরম জায়গায়—দু পাশ দিয়ে পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে আর যতদূর দৃষ্টি যায় পাহাড় আর ঘন জঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না। দেখতে পেলাম ওখানে কয়েকটি কোয়ার্টার আছে—একটি বীট অফিসার শ্রীউষা চক্রবর্তীর আর একটি ফরেষ্ট গার্ড-এর—তারা সেখানে রয়েছে সপরিবারে। আর তার পাশেই গেস্টহাউস সমেত বীট অফিস। ফরেষ্ট গার্ড-এর কাছে আমাদের অভিপ্রায় জানাতে এবং উষা চক্রবর্তীর খোঁজ করাতে, সে গেষ্টহাউস খুলে দিয়ে চলে গেল বাজারে উষা চক্রবর্তীর সন্ধানে। নজরে পড়ল নদীর অপর পারে ছা-মন্নুর বাজার—নদী পারাপারের জন্য সংযোজক রয়েছে এক বাঁশের সেতু। গেষ্টহাউসটি হাফিলের তৈরী মনে হোল—প্রচুর জানালা ও এক দরজাওয়ালা ছোট পাকাঘর। ঘরের আসবাবের মধ্যে দুটো কাঠের চৌকি, একটি ছোট টেবিল, দুটো চেয়ার ও একটা কাঠের আলনা। পরিবেশ খুব মনোরম নিঃসন্দেহে কিন্তু সারাদিন প্রায় অভুক্ত অবস্থায় এতখানি পথ আসার পর আমাদের আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার মত মনের অবস্থা ছিল না।



হাতীর কষের দাঁত

দৈর্ঘ ৮১/২ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩৩/৪ ইঞ্চি, উচ্চতা ৯৫/৮ ইঞ্চি এবং
এই একটা দাঁতের ওজন ৫ কেজি।

বন্ধুবর ভবানীর খুব পেটা স্বাস্থ্য—কুস্তি ও ডন-বৈঠকের মাধ্যমে প্রচুর মেহনত করে সে তার শরীরটিকে তৈরী করেছে। কিন্তু সারাদিনে এককাপ চা ও কয়েকটা বিস্কুটের রসদে এই দুর্গমপথ হেঁটে আসার পর দেখলুম তার কথা বলারও কোন উৎসাহ নেই এবং মেজাজও খুব খিটখিটে। শরীর ও মনের দিক দিয়ে শ্রান্ত আমিও, কিন্তু তখন আমার চিন্তা নৌকা কখন পৌছবে মালপত্র ও জিতেনকে নিয়ে। হঠাৎ বেশ গর্জন করে নাক ডাকার আওয়াজ এল। দেখি আমার কুস্তিগীর বন্ধু ভবানী চৌকির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি অস্বস্তিতে সারা ঘর পায়চারী করতে লাগলাম।

অল্পক্ষণ মধ্যেই ঊষা চক্রবর্তী এলেন। দেখে বেশ অল্পবয়সের খুব উৎসাহী ছেলে বলে মনে হোল। তাই সুরুতেই 'তুমি' সম্বোধনে নেমে গেলাম। তাকে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানাতে এবং মিঃ দাসের চিঠি দেখাতে সে ব্যাপারটা সব বুঝতে পারল এবং অতি উৎসাহের সঙ্গে বলল যে, আমরা খুব ভাল দিনেই এসেছি। সে দিনটি ছিল হাটের দিন। হাটের দিনে আশেপাশের পাহাড়ী এলাকায় যত আদিবাসী আছে, তারা আসে ছা-মনুর হাটে কেনা-বেচা করার জন্যে। ভদ্রলোক বলল সে তক্ষুনি গিয়ে আদিবাসীদের মোড়ল ও কয়েকজন শিকারীকে ডেকে আনতে পারবে যারা পাগলা হাতীটার সঠিক খবরাখবর জানে। এদিকে সূর্য ঢলে আসছে দেখে আমি আর বিলম্ব না করে চক্রবর্তীকে ছা-মনুর হাটে পাঠিয়ে দিলাম আর শ্যেনদৃষ্টিতে পথে নজর রাখলাম মালপত্র নিয়ে জিতেন ফিরছে কি না। চক্রবর্তী অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এল জনচারেক পাহাড়ী আদিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে; আলাপ করিয়ে দিল তাদের মোড়লের সাথে। আমরা শুধুমাত্র সিগারেট দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করলুম এবং সবিনয়ে বললুম যে আমাদের মালপত্র এখনও রাস্তায় নৌকাপথে আসছে কাজেই ইচ্ছা থাকলেও অন্য কিছু দিয়ে

আপ্যায়ন করার সামর্থ আমাদের আপাততঃ নেই। চক্রবর্তী কিন্তু তাহার আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি রাখেনি। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে তার বাসা থেকে গরম চা নিয়ে এসে আমাদের সবাইকে দিল।

ত্রিপুরার ওই পাহাড়তলীতে দু'রকম আদিবাসী বাস করে। এক জাতীয়দের বলে চাক্‌মা ও অপর জাতীয়দের ত্রিপুরিয়ান আদিবাসী বলা হয়। চাক্‌মারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং ত্রিপুরিয়ানরা হিন্দু। চক্রবর্তী যাদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে এল তারা সবাই ত্রিপুরিয়ান আদিবাসী, বাস করে লংথরাই পাহাড়ের কোলে। দুর্ভাগ্যক্রমে পাগলা হাতীটি ওই লংথরাই পাহাড়ের কোলে ওদেরই ছ'জনকে মেরেছে। কথাবার্তার মাধ্যমে বুঝলাম আমরা আসাতে ওরা খুব খুসী হয়েছে এবং ভরসা পাচ্ছে যে, আমরা সত্যি-ই তাদের বিপদমুক্ত করতে পারবো। তারা অতি উৎসাহে আমাদের সবরকম সাহায্যে আসবে এরকম প্রতিশ্রুতিও দিল। সুযোগ বুঝে আমি মোড়লকে বললাম—তাহলে আজ রাতটা তোমরা আমাদের এখানে থেকেই যাও, পরের দিন খুব ভোরেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারবো হাতী-শিকারে। মোড়ল কিন্তু এতে রাজী হোল না, সে বললে—'সাহেব, আমি গ্রামের মোড়ল হয়ে কি করে গ্রাম ছেড়ে বাইরে থাকব, বিশেষতঃ এই বিপদেব দিনে? কথা দিচ্ছি, কা'ল ভোর ছ'টার মধ্যেই আমরা এসে আপনাদের নিয়ে যাব—মিথ্যে বলার দস্তুর নেই আমাদেব।' অতঃপর এ-প্রসঙ্গ তোলাই রইল যদিও মনে মনে আমি তেমন খুসী হলুম না। দীর্ঘকাল শিকার করে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, এইসব পাহাড়ী লোকেদের সময়জ্ঞান, দূরত্বজ্ঞান, একেবারেই নেই। কিন্তু কোন উপায় না থাকায় ওদের কথাতেই রাজী হতে হোল। ওরা যাবার সময় বলল, "কোন চিন্তা নেই—অভিজ্ঞ ট্র্যাকার, শিকারী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে আমরা হাতী-শিকারে সাহায্য করবো।"

সন্ধ্যের মুখে প্রায় সাড়ে ছ'টা নাগাদ দেখি আমাদের জিতেন্দ্রচন্দ্র

ছা-মনুর ঢাল বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে আসছে। মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম সারাদিন অনাহারে ও নৌকায় রোদে পুড়ে তার অবস্থাও ভবানীর মতন সঙ্গীন। যাই হোক নৌকা থেকে আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্র—বাক্স, বিছানা, রেশন ইত্যাদি নিয়ে এসে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরটাকে গুছিয়ে ফেললাম এবং জিতেনকে একটু চা বানাতে বললাম। দেখলাম জিতেনবাবু অত্যন্ত কাহিল হয়ে শুয়ে-পড়েছেন। চা বানানোর কথায় শুয়ে শুয়েই আমায় উত্তর দিলেন—"নৌকায় চাইপ্যা আমার গা গুলাইত্যাছে।" বুঝলাম সে উপস্থিত কিস্সু আমার করতে পারবে না। তখন আমি নিজেই জনতা স্টোভ জ্বালিয়ে চা এবং পরে রাত্রের রান্না সেরে ফেললাম। তারপর খেয়েদেয়ে যে যার বিছানায়। সারাদিনের ক্ষুধা, ক্লান্তি ও পথশ্রমের পর এই বিশ্রাম নিয়ে এলো পরম আকাঙ্ক্ষিত গভীর ঘুম।

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গলো খুব ভোরে। চা ও বিস্কুট সহযোগে প্রাতঃরাশ সেরে আমরা তৈরী হয়ে নিলুম—সঙ্গে অসময়ের জন্য দু-এক প্যাকেট করে খেজুরও রাখলাম। আগরতলার বাজার থেকে কেনা প্রচুর আটা, ময়দা ও ঘি কোন কাজেই লাগান গেলনা—রুটি বা পরোটা তৈরী করার ব্যাপারে; একমাত্র 'তাওয়ার' অভাবে। রুটি সেঁকার তাওয়া যে কী অমূল্য বস্তু তাঁর মূল্য বোঝা গেল এতোদিনে। জানা গেল ও অঞ্চলে তাওয়ার চলন নেই। সকালের খাওয়াটা একটু বেশী হওয়াই জরুরী ছিল, কারণ একবার শিকারে বেরুলে কখন ফেরত আসব তার কোন ঠিক থাকে না। যাই হোক, যা সম্ভাব্য ও প্রাপ্তব্য ছিল তাইতেই খুসী হয়ে আমরা সেই আদিবাসীদের পথচেয়ে বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলাম।

দেখা গেল কথার দাম আছে আদিবাসীদের—ছটার মধ্যেই হাজির হল তারা। আমরা তাদের চা, বিস্কুট ও সিগারেট দিয়ে আপ্যায়ন করলাম। তারা নিজেদের আদিবাসী ভাষা ছাড়া ভাঙা-ভাঙা পূর্ববঙ্গীয় ভাষাও বল্‌তে ও বুঝতে পারে। তাতে ওদের সাথে

কথাবার্তা বলা সহজ হল। বের হবার আগে আমাদের মালপত্র দেখাশুনা এবং আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের জন্য কোন রান্না না করার কথা জিতেনকে বলে দিলাম।

পথে বেরিয়ে আমরা ওদের জিজ্ঞেস করলাম, যে-এলাকায় হাতী উপদ্রব করছে সে এলাকা ওখান থেকে কতদূরে। তারা উৎসাহের সঙ্গে বলল—বেশী দূর নয়, এই মাইল ৬।৭ হবে। কিন্তু মাইলের পর মাইল চলার পরও সে-পথ যেন ফুরোয় না। অনেক চড়াই-উতরাই, খানা-ডোবা পার হয়ে, আমরা যখন আদিবাসীদের গ্রামে এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। সেদিন ১লা মার্চ—রোদের তেজ তখন প্রচণ্ড। আমার কাঁধে 'পার্ডির' ·৪৫০ 'ডবল ব্যারেল রাইফেল' ও ভবানীর কাঁধে 'ওয়েবলি স্কটের' ·৪৭০ 'সিংগল সট রাইফেল'। আমারটার ওজন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ পাউণ্ড এবং ভবানীরটা 'সিঙ্গল ব্যারেল' হওয়ায় কিছু হালকা। এই মালভার ওই রোদে বয়ে নিয়ে আসতেই আমাদের দম শেষ হয়ে যাবার জোগাড়। যাই হোক আমরা কোন রকমে এগিয়ে চললাম, মোড়লের মাচাবাড়ির দিকে। মোড়ল আমাদের ওপরে উঠে আসতে বলল। ওপরে ওঠার সিঁড়িও অভিনব, দেখলুম ৬।৭ ইঞ্চি মোটা একটা গাছের ডাল হেলান অবস্থায় মাচার দেওয়ালে লাগানো; এবং তাতে কিছুদূর অন্তর কুড়ুল বা কাটারি দিয়ে কেটে খাঁজ-খাঁজ করা এবং পাশে একটা বাঁশের হাতলের মতন। আমরা অতি সাবধানে ওই খাঁজে পা দিয়ে বাঁশ ধরে ধরে মাচাবাড়ীর ওপরে উঠলুম। মোড়লের বৌ আমাদের দু-ঘটি জল দিয়ে গেল। তাই দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এবং কিছু খেয়ে আমরা শান্ত হয়ে বসলুম। গ্রামের বহু লোক আমাদের দেখতে এল এবং সুরু হোল আমাদের বৈঠক—কি ভাবে অতঃপর এগুনো যায়। আমি মোড়লকে বললাম—তুমি যে অভিজ্ঞ ট্র্যাকার, শিকারী ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করবে বলেছিল 'তারা কোথায়?' মোড়ল

বলল, "তারা খাওয়া সেরে এখুনি আসছে।" কিছুক্ষণ পরেই জনতিনেক লোক নিয়ে একজন এগিয়ে এল। মোড়ল তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে বলল—'এই এখানকার সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্র্যাকার, নাম তারুমণি ত্রিপুরা'। মধ্যবয়সী সমর্থ মানুষ তারু। খুব ভাল লাগল ওর ছন্দময় নামটি শুনে। বাকী তিনজনও বেশ অল্পবয়সী। সবার সাথে হাত মিলালুম আমরা। আর দেরী না করে মোড়ল ও বাকী গ্রামবাসীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা শুভকার্যে রওনা হ'লাম।

মাইল কয়েক হাঁটার পর আমারা পাহাড়ের কোলে এসে পৌঁছলাম। তারপর সুরু হল পাহাড়ে চড়ার দুর্গম পথ। আমরা শহর থেকে এসেছি। প্রথম দিনেই ভারী রাইফেল কাঁধে চাপিয়ে ১২।১৪ মাইল পথ হেঁটে আসার পর, এই দুর্গম পাহাড়ের চড়াই-এর দিকে চেয়ে, আমাদের বুকের রক্ত প্রায় শুকিয়ে এল। কিন্তু নিরুৎসাহ হলে চলবে না, কারণ এইতো সবে সুরু। আমাদের মনের ও শরীরের সমস্ত শক্তি একসঙ্গে ক'রে সেই আদিবাসী চারজনের নির্দেশ অনুযায়ী আনরা পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। প্রতি পদক্ষেপে আমাদের মনে হ'তে লাগল আমাদের ফুসফুস বোধ হয় এবার ফেটে যাবে। সময় সময় মনে হল যে আমরাই বোধ হয় প্রথম মানুষ যারা এই দুর্গম পাহাড় ও জঙ্গল ভেদ করে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছি। প্রায় একশ গজ পাহাড়ে চড়ার পর আমরা যখন হাপরের মতন হাঁপাচ্ছি, তখন বোধহয় কপালগুণে কিছুটা সমতল জায়গা পেলাম। কিন্তু সে-পথও বেশ দুর্গম এবং ঘন 'এলিফ্যাণ্ট গ্রাস' দিয়ে ঢাকা। এলিফ্যাণ্ট গ্রাস লম্বায় ১৫।২০ ফুট এবং তাদের গোড়া আখের মতন মোটা। এর মধ্যে হাতীর পাল স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারে বলেই বোধহয় ওই নাম। স্বাভাবিক ভাবে এই বিশেষ ধরনের ঘাস ভেদ করে যাওয়া অসম্ভব। শুধুমাত্র ওর মধ্য দিয়ে হাতী চলে গেলে যে পথ তৈরী হয় সেই পথ ছাড়া আর কোন রাস্তা পাওয়া যায় না। আমরা অতিকষ্টে ও সাবধানে সেই পথ ধরে হামাগুড়ি দিয়ে হাতীর পায়ে দেবে

যাওয়া গলিপথের মধ্যদিয়ে এগুতে লাগলাম। এইভাবে ক্রমশঃ উঠতে উঠতে এবং কয়েকটা পাহাড় পেরিয়ে একটা পাহাড়ের মাথা বরাবর যখন এসে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় তিনটে। আমাদের দুজনের অবস্থা দেখে আদিবাসীদের মনে হয়তো কিছুটা দয়ার সঞ্চার হলো। তাই তারা আমাদের সেইখানে বসে একটু বিশ্রাম করার কথা বলল এবং তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হাতীর পাল দেখতে পায় কি না খবর নেবার জন্যে চারজন চারদিকে চলে গেল। আর আমরা দুই বীরপুরুষ অর্ধমৃতের মতন সেখানে বসে পড়ে হাপরের মত হাঁপাতে লাগলাম।

আধঘণ্টাখানেক পরেই দেখি সেই আদিবাসী চারজন খুব উৎসাহের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে আমাদের কাছে এল এবং খুব নীচু গলায় আমায় বলল—শিকারী সাহেব, আমরা 'মৈয়ুম দেখ্সি।' হাতীকে ওখানকার আদিবাসীরা মৈয়ুম বলে। তারা আমাদের মৈয়ুম দেখাবার জন্য তাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করল। আমরা আমাদের নির্জীব শরীর দুটোকে কোনরকমে তুলে ধরে আবার সেই ভারী রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে তাদের অনুসরণ করলাম। কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম, আমরা যে পাহাড়ে আছি তার সামনের পাহাড়ের চূড়োর ওপর ২৫।৩০টি হাতী, মাদী ও বাচ্চা সমেত মনের আনন্দে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পাগলা হাতীটা সে দলে নেই। প্রথম দিনেই এতগুলো হাতী দেখে মনে খানিক উৎসাহ পেলাম এবং হাতী দেখার ভান করে নিজেদের ক্লান্ত শরীর নিয়ে আরও কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দিলাম। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, সূর্য ডুবতে আর বেশী দেরী নেই, প্রায় পাঁচটা বাজে। এই দুর্গম পথ বেয়ে আমাদের আবার ফিরে যেতে হ'বে এই কথা ভাবতেই বুকের রক্ত প্রায় জল হয়ে এল। যা-হোক ফিরতেই হ'বে যখন তখন আর ওসব চিন্তা ছেড়ে আমরা ওখানেই প্রথম দিনের অভিযান শেষ করে পাহাড়ের ওপর থেকে নামতে সুরু করলাম। আবার সেই ঘন

জঙ্গল ও 'এলিফ্যাণ্ট গ্রাস' ভেদ করে হাতীচলা রাস্তাধরে অতি সাবধানে নামতে গিয়েও নিজেদের সামলান প্রায়ই কঠিন হচ্ছিল। আমরা বেশ কয়েকবার পড়ে গিয়ে হাঁটুতে, হাতে ও গায়ে চোট খেলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা কোনক্রমে যখন পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছলাম তখন গভীর অন্ধকার। একহাত তফাতে কি আছে আমাদের নজরে পড়ছে না। তারু এক নালাপথ ধরে আমাদের নিয়ে চলল তাড়াতাড়ি গ্রামে পৌঁছাবার জন্য। নালাপথে কিছু জল ও ছোট-বড় পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে আমরা প্রায় রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ওদের গ্রামে এসে পৌঁছলাম। সকাল ছ'টায় আমরা চা ও কয়েকটা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছিলাম তারপর আর সারাদিন পেটে অন্য কিছু পড়েনি। তার ওপর এতখানি পথ ভারী রাইফেল ঝুলিয়ে হাঁটা ও পাহাড়ে ওঠানামা করার পর আমাদের শরীরে আর কিছু ছিল না। গ্রামের পথে চলার সময় ঘন ঘন কয়েকবার বিদ্যুৎ চমকাল; মনে হল বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। শরীরটাকে কোনরকমে টানতে টানতে পথ চলছি আর ভাবছি বন্ধুবর ভবানীর কথা। তাকে যদি সারাদিনের এই অমানুষিক পরিশ্রমের পর কিছু খেতে দিতে না পারি তাহলে হয়তো আমাকেই খেয়ে ফেলবে। গ্রাম থেকে ছা-মন্নু আরও ১২।১৪ মাইল পথ। সেখানে না পৌঁছান পর্যন্ত আমাদের খাওয়া বা শোয়ার যে কি ব্যবস্থা হতে পারে তা আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। শরীরে কিন্তু আর বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই ছা-মন্নু ফিরে যাবার। এ-অবস্থায় আমরা মোড়লের মাচাবাড়ীর নীচে এসে পৌঁছলাম। মোড়ল আমাদের মাচার উপর উঠে আসতে বলল। আমরা কোনক্রমে মোড়লের মাচাবাড়ীর বারান্দাতে উঠে ধপাস্ করে বসে পড়লাম। তখন কথা বলারও কোন ক্ষমতা ছিল না। মোড়লের বৌ দু'ঘটি জল দিয়ে গেল—তাই দিয়ে আমরা হাত-মুখ ধুয়ে ও কিছুটা পান করে চুপ করে বসে রইলাম।

আকাশে বিদ্যুতের চমকানি তখন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। মোড়ল

আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ আপ্‌নাগো ছা-মনু যাওয়া হবে না। আকাশের যা অবস্থা তাতে এখুনি জোর ঝড়-জল হবে।" এই কথা বলতে না বলতেই ভীষণ ঝড় বৃষ্টি ও তার সঙ্গে এক একটি টেনিস-বলের মতন শীল পড়তে লাগল। মোড়ল আমাদের তার ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বাঁশের দরজা বন্ধ করে দিল। ঝড়ের দাপটে মাচাবাড়ীটা ছুলতে লাগল, ভয় হোল উড়িয়ে না নিয়ে যায়। আমাদের গায়ে তখন উপর থেকে নরম ন্যাতার মত অনবরত কিছু পড়ছে বলে মনে হোল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। জল-ঝড় কমে গেলে—প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর বুঝতে পারা গেল কী বস্তু ফুল-চন্দনের মত আমাদের মাথায় ও সর্বশরীরে পড়ে প্রায় ঢেকে ফেলেছে ছুজনকে। দেখা গেল মাচাবাড়ীর বাঁশের মেঝের উপরেই মাটীর বেদী করা উনোন—ওদের রান্না করার ব্যবস্থা, তাও একটি চুলো নয়—ছুই ছুইটি; কারণ বাঁশের বেড়া দিয়ে একই ঘরকে ছুই ভাগ করা এবং প্রত্যেক ভাগেই একটি রান্নার উনোন বানানো। ঘরেই রান্না করার দরুণ বছরের পর বছর জমে উঠেছে মোটা পরতের ঝুল। ঝড়ের দাপটে সেগুলি খসে পড়ে আমাদের প্রায় কবরই দিয়ে ফেলেছিল। যা'হোক করার ত কিছু ছিল না। আমরা ছুই বন্ধু শিকারের জাঙ্গল হ্যাট্ (Jungle hat) ছুটী সমস্ত মুখ ও নাকের উপরে টেনে দিয়ে প্রত্যেকেই ছুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলাম। এদিকে বিদ্যুতের ঝিলিকে দেখা গেল বড় বড় শীলে মাচাবাড়ীর বারান্দা ও আশপাশ যতদূর দৃষ্টি যায় সব সাদা হয়ে গেছে। ৪০।৫০ মিনিট ধরে ভীষণ ঝড় হ'বার পর ঝড়ের বেগ একটু কমতে ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হোল এবং বৃষ্টির ফলে শীল গলতে সুরু করল আর ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বরফ গলার ঠাণ্ডা মিলে আমাদের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। এইভাবে কাটালাম ঘণ্টাদেড়েক, ঝড়-জলও কমল। ইতিমধ্যে সেই অন্ধকার ঘরে কে যেন এসে কাঠ জ্বেলে উনোনটা খুঁচিয়ে আগুন তুলতেই সেই

আগুনের আভাতে আমাদের দেখে মোড়লের স্ত্রী খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল আর আমরা দুই বন্ধু অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম অত হাসির কারণ কি? আমরা দুজনে পরস্পরের দিকে চাইতেই ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল—মোড়ল রমণীর হাসির অর্থ কি? প্রায় পোষা ভাল্লুকের মত আমরা দু'টি প্রাণী সর্বাঙ্গে কাল কাল ঝুলের চাপড়া দিয়ে ঢেকে বসে আছি, একে অপরকে চেনা ভার হয়ে উঠেছে। শিকারী সাহেবদের এ অবস্থা দেখে না হেসে পারা যায়—এই বোধহয় ছিল মোড়ল রমণীর মনের কথা। আমরা দুজনে অপ্রস্তুত বোধ করে তাড়াতাড়ি ঝুল ঝেড়ে পরিষ্কার হবার জন্য বাইরে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে ঘরে এসে দেখলাম তৈরী হয়েছে আমাদের জন্যে শয্যা—একটি ময়লা তোষক, দুটো বালিশ ও দুটো লেপ দিয়ে। তোষক ও লেপের অবস্থা দেখে মনে হল তিনপুরুষের তেলকালির ময়লা কোদাল দিয়ে চেঁছে নিলেও পরিষ্কার হয়ে উঠবে না। আমাদের দু'জনের শরীরের তখন যা অবস্থা যে, ওই শয্যাই আমাদের কাছে রাজশয্যার থেকেও ভাল মনে হোল। আমরা আমাদের অবসন্ন ক্লান্ত শরীর দু'টি সেই রাজশয্যায় এলিয়ে দিতে মোটেই দেরী করলাম না। এমন সময় ভবানী আমায় বলল—'দাদা শোবার ব্যবস্থা তো মোটামুটি একরকম হোল কিন্তু খিদেতে যে পেটের নাড়ি হজম হবার জোগাড় হয়েছে।' আমি অতি নিচু গলায় তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, মোড়ল ও তার স্ত্রী আমাদের অনেক যত্ন করছে, ওরা অত্যন্ত গরীব, খাওয়ার কথা কি করে বলা যায়? রাতটা কোনরকমে ঘুমিয়ে কাটিয়ে নাও, তারপর সকাল-বেলায় যা হোক কিছু করা যাবে। কথাটা যে তার খুব মনোমত হোলনা তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। কিন্তু আমি যে নাচার।

এরপর আমি তারুকে জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে মদ পাওয়া যায় কি না? সে বলল—'পর্যাপ্ত'। আমি তার হাতে দশটা টাকা দিয়ে

বললাম কিছু মদ জোগাড় করতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা এক হাঁড়ি মদ এনে আমাদের সামনে ধরল। আমরা অতিকষ্টে তাদের বোঝালাম যে, মদ আমরা খাইনা—এ-ব্যবস্থা কেবল তাদের জন্যে। দু-চার গ্লাস পেটে পড়ার পর 'মদের ক্রিয়া' সুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে। তারু আমাকে 'বুড়ো শিকারী' ও ভবানাকে 'জোয়ান শিকারী' বলে ডেকে মদের ঘোরে বলতে লাগল যে, তারা এবং সমস্ত গ্রামবাসীরা আমাদের দু'জনের ওপর খুব খুশী। যে-ভাবেই হোক তারা আমাদের গুণ্ডা মৈয়ুম পাইয়ে দেবার জন্যে সবরকম সাহায্য করবে। আমি আমার রাজশয্যায় শোয়া অবস্থায় তাকে ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, এই ঝড়-জল ও বরফের মধ্যে কি হাতী এই এলাকায় থাকবে? তারা সকলেই একবাক্যে আমাকে বোঝাতে লাগল যে, আমাদের বরাত ভাল তাই এসময় ঝড়-জল ও বরফ পড়ছে। হাতী ঠাণ্ডা পেলে এই জঙ্গল ছেড়ে কোথাও যাবে না, কারণ তারা এই আবহাওয়া খুব ভালবাসে। যাহোক তারা আমাদের বিশ্রামের জন্য এই ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেল, আর আমরা শুয়ে শুয়ে পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা তাদের মদ খাওয়ার সোরগোল শুনতে পেলাম।

পরিশ্রান্ত অবস্থায় আমরা একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলাম; হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গল মোড়লের ডাকে। জেগে দেখি মোড়ল-বৌ দুটো শান্‌কিতে করে সামান্য কিছু ভাত, একটু জলের মত পাতলা ডাল আর পাতায় মোড়া একটু নুন ও দু'ঘটি জল এনে আমাদের বিছানার পাশে রাখল। মোড়ল সবিনয়ে বলল যে, তারা গরীবলোক এর বেশী তাদের আর কিছু নেই—আমরা যেন কষ্ট করে একটু খাই। আমরা রাজশয্যা তো আগেই পেয়েছিলাম, এবার রাজভোগের ব্যবস্থা দেখে অত্যন্ত খুশী হ'লাম এবং অযথা সময় নষ্ট না করে সেই রাজভোগের সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেলাম। ভোর সাড়ে পাঁচটায় সামান্য চা-বিস্কুট খাবার পর রাত প্রায় সাড়ে ন'টায় ওই সামান্য খাবারও

কণামাত্র না ফেলে আমরা অতি তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করে জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরেরদিন ভোরে আমরা বিছানা থেকে উঠে কাছাকাছি একটা পাহাড়ী ঝরণাতে গেলাম এবং হাতমুখ ধুয়ে পেটভরে জল খেলাম। ফিরে এসে মোড়লের মাচাবাড়ীর বারান্দাতে বসে একটা ছোটখাট বৈঠক হোল, কিভাবে আমাদের সেদিনের অভিযান সুরু হবে সেই ব্যাপার নিয়ে। আমি মোড়লকে আর তারুকে জিজ্ঞাসা করলাম তাদের জঙ্গলের কোন দেবতা আছে কিনা, কারণ আজ বেরুবার আগে আমরা সেখানে পুজো দিয়ে যেতে চাই। তারা একবাক্যে বলে উঠল—'লংথরাই বাবা' যার নামে এই পাহাড়—খুব জাগ্রত দেবতা —তারা সবাই খুব মানে। আমি পূজোর ব্যবস্থা করার জন্য মোড়লকে টাকা দিলাম এবং শুনলাম পূজোতে একটা কালো মোরগ, নারকেল, চিনি, বাতাসা ও মোমবাতি লাগে। গ্রামের পূজারীকে সব জিনিস দিয়ে পূজো পাঠান হোল, আর আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম পূজারী ফিরে আসা পর্যন্ত। ঘণ্টা দেড়েক পরে, পূজারী খুব হাসিমুখে ফিরে এসে বলল, "লংথরাই বাবা আপনাদের ওপর খুবই খুশী হয়েছেন। আপনারা গুণ্ডা মৈয়ুমকে অবশ্যই মারতে পারবেন।" মোড়ল পূজোর প্রসাদ, নারকেল, চিনি বাতাসা, সকলের হাতে একটু একটু করে দিল এবং আমরা সেই প্রসাদ মুখে দিয়ে জল খেয়ে রওনা দিলাম। গ্রাম থেকে ২।৩শ গজ দূরে একটা জায়গায় এলাম, যেখানে ৪।৫ দিন আগে এক হতভাগ্য গ্রামবাসী প্রাণ হারিয়েছিল পাগলা হাতীর পায়ের নীচে। তারু আমাদের সেই জায়গাটা দেখাল এবং বোঝাবার চেষ্টা করল, ওই হতভাগ্য লোকটির পরিবার এক-টুকরো হাড় বা মাংস কিছুই খুঁজে পায় নি তার সৎকার করার জন্য। আমরা দেখলাম সেখানকার মাটির খানিকটা জায়গার রঙ কিছুটা বদলে গেছে। তারু আমাদের বলল, ওখান থেকে খানিকটা মাটি নিয়েই তার পরিবারের লোকেরা তার সৎকার করেছে।

অতঃপর আমরা চললাম এগিয়ে। আমরা আমাদের ভারী রাইফেল দুটো দুজন গাইড ছোকরার কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে বললাম। এতে আমাদের পথশ্রম কিছুটা লাঘব হল এবং আমরা অক্লেশে পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে লাগলাম। একই পথ ধরে আমরা এগিয়ে গিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়োয় উঠে অনেক জংলী হাতীর পাল দেখতে পেলাম ; একসংগে প্রায় ৩০।৪০টা হাতী ; তারমধ্যে দু-একটা দাঁতাল এবং বেশীর ভাগ মাদী ও বাচ্চা। পাগলা-হাতী দলে থাকে না তা আমরা জানতাম। অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম পাগলাহাতীর কিন্তু নিরাশ হলাম। সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে সন্ধ্যের অন্ধকারে আবার আমরা মোড়লের বাড়ী ফিরে গেলাম।

সেদিনও আগের দিনের মত আমরা মোড়লের মাচাবাড়ীর বারান্দায় উঠে ধপাস করে বসে পড়লাম। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং পেটে কিছু না পড়ায় শরীর স্বভাবতই ক্লান্ত লাগছিল। কিন্তু তুলনামূলকভাবে আগের দিনের থেকে কষ্ট অনেকটা কম মনে হল। মোড়লের বৌ-র দেওয়া জলে মুখ, হাত, পা ধুয়ে এবং মোড়লের হাতে ওদের মদ খাবার জন্য দশ টাকা দিয়ে আমরা আমাদের রাজশয্যায় আশ্রয় নিলাম। আধশোয়া অবস্থাতেই বসালাম এক বৈঠক—উদ্দেশ্য, যদি আমরা সত্যিসত্যিই পাগলাহাতী দূরে দেখতে পাই, তাহলে তাকে কি করে বন্দুকের নাগালের মধ্যে আনতে পারবো। প্রশ্ন শুনে তারু ও তার তিনসংগী উৎসাহের সংগে বলে উঠলো—"বুড়া শিকারী সাহেব, আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা অতি সহজ উপায়ে 'গুণ্ডা মৈয়মকে' আপনার বন্দুকের সামনে এনে দেব।"

আমাদের হাতী শিকারের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। পুঁথিগত বিদ্যা ছিল কিছু—'জন হাণ্টার', 'টেলার', 'বেল' ইত্যাদির লেখা আফ্রিকার জঙ্গলে হাতী শিকারের কাহিনী পড়ে। কিন্তু বলাবাহুল্য

তা' পর্যাপ্ত নয়। তাই তারুকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের হাতী তাড়িয়ে আনার সহজ উপায়টি কি? বাঘ বা হরিণ শিকারের বেলায় যেমন 'বীট' করার প্রথা আছে—যার মাধ্যমে বাঘ বা হরিণকে বন্ধুকের নাগালে আনা যায়, তার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার আছে, সেরকম কোন উপায়ে একটা বিরাট পাগলাহাতীকে 'বীট' করে বন্দুকের সামনে আনা যায় কিনা সেই প্রশ্নটা আমাদের মনে ছিল। তখনই তারু আমাকে বোঝাল যে, তারা বাঁশের কঞ্চি থেকে খুব তাড়াতাড়ি একরকমের বাঁশি তৈরী করে ফেলতে পারে। সেই বাঁশি বাজালেই যেদিক থেকে বাঁশির আওয়াজ আসছে, হাতী তার উল্টোদিকে ছুটে পালাবে। হাতী ওই বাঁশির আওয়াজ একেবারেই সহ্য করতে পারে না। তারা আমাকে বোঝাল যে, গুণ্ডাকে যখন আমরা দেখতে পাব, তখন আমরা বাঁশি বাজিয়ে গুণ্ডাকে লুকিয়ে জঙ্গলের মধ্যে এমন জায়গায় বাঁশির 'রোখ' রাখব যে সেই-সেই জায়গা থেকে বাঁশি বেজে উঠলেই হাতীকে একটা নির্দিষ্ট পথ দিয়ে তাড়িয়ে আনা যাবে। এই কঞ্চির বাঁশির আওয়াজ কিন্তু খুব জোর নয়—অনেকটা কলাপাতার ভেঁপুর মত প্যাঁ-প্যাঁ করে আওয়াজ হয়। জানিনা ত্রিপুরা ছাড়া আর কোথাও এই প্রথায় হাতী 'বীট' করে কিনা। আমি এটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু ব্যাপারটা পরীক্ষাসাপেক্ষ বলে তখনকার মত চুপ করে রইলাম। তারপর তারুকে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম—উপস্থিত হাতীগুলো যে পাহাড়ে ঘুরছে তারা যদি তাড়া খায়, তাহলে তারা কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় পালিয়ে যাবে? কারণ 'বীট' আরম্ভ করার আগে প্রত্যেক শিকারীর জানা প্রয়োজন তাড়া খেলে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারেরা সাধারণতঃ কোন্‌দিকে পালায়। তারু উত্তরে বলল—"বুড়ো শিকারী সাহেব, তাড়া খেলে হাতীদের পালাবার পথ আছে মাত্র দুটো। একটা তাদেরই গ্রামের মধ্য দিয়ে, অপরটি পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। হাতী দিনের বেলায় তাড়া খেলে গ্রামের পথে আসতে চায়

না, তখন তারা ধরে জঙ্গলের পথ। আমরা তিনটি পাহাড় পেরিয়ে সবচেয়ে যে উঁচু পাহাড়ে গতকাল যাই, যেখান থেকে জংলী হাতীর পাল আমরা দেখেছি, সেই পাহাড়ের চূড়ো পেরিয়ে তারা পরের পাহাড় শ্রেণীতে চলে যায়। পরের পাহাড়শ্রেণী পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) এলাকায়। একবার যদি হাতীর পাল কোন কারণে এই পাহাড় ছেড়ে পাশের পাহাড়-শ্রেণীতে চলে যায় তাহলে তাদের ফিরে আসতে দেখা যায় এক থেকে দু'মাস পরে।" এইসব নানা আলোচনা করতে করতে রাত সাড়ে ন'টা বাজল এবং মোড়লের বৌ এনে হাজির করল আমাদের বরাদ্দ খাবার। আমরা হাসিমুখে তা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লুম।

এইভাবেই প্রতিদিন আমাদের অভিযান চলতে থাকল—সকালে 'রাজশয্যা' থেকে উঠে ঝরণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে একপেট জল খেয়ে সকাল আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ পাগলা হাতীর সন্ধানে বের হওয়া (আর ফিরে যখন আসি তখন সন্ধ্যের ঘন অন্ধকার।) নিজেদের অভুক্ত এবং ক্লান্ত শরীর কোনরকমে টেনে নিয়ে মোড়লের মাচা-বাড়ীতে ফিরে আসি এবং নিয়মিত দু'লোটা জল, যা মোড়লের বৌ বা আর কেউ আমাদের জন্যে এগিয়ে দেয়, তাই দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এবং খেয়ে নির্দিষ্ট রাজশয্যাতে আমাদের ক্লান্ত শরীর দুটো এলিয়ে দিই। তারপর মোড়ল ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের সংগে সুরু হয় নানা গল্প ও হাসি-ঠাট্টা এবং প্রতিদিন না ভুলে মোড়লেব হাতে তুলে দিই দশটা করে টাকা ওদের 'মদ' খাবার জন্য। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ মোড়লের বৌ নিয়ে আসে শান্‌কিতে করে ভাত, ডাল আর নুন ও লোটায় করে জল। আমরা একবস্ত্রে ক'দিন ধরে আছি। অলিভ রঙের প্যাণ্ট ও বুশ কোট, গেঞ্জি, আণ্ডারওয়ার এবং রুমালের যে অবস্থা তা ব্যবহার করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। পাহাড়ে যাতায়াতের পথে মার্চ মাসের দুর্ধর্ষ গরমে এবং রোদে আমরা প্রায় ভাজাভাজা হয়ে গিয়েছি—ঘামে জামা-প্যাণ্ট সব ভিজে গিয়েছে,

আবার তারই মাঝে ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে আমাদের প্রায় স্নান করিয়ে দিয়েছে। সেই জামাকাপড় আবার গায়েই শুকিয়েছে। এইভাবেই পার হোতে থাকল দিনের পর দিন।

৯ই মার্চ ১৯৬৭ সাল বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ আমি ও ভবানী আমাদের সঙ্গীদের নিয়ে তিনটে পাহাড় পেরিয়ে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে কিছুটা নীচে একটা খাদের মধ্যে বসলাম হাঁপাতে হাঁপাতে, রোদ বাঁচিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নেবার জন্য। আমাদের কারুর মুখে কোন কথা নেই। কথা বলা বা কোনরকম আওয়াজ করা শিকার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। আমি আপনমনে ভাবছি, দৃষ্টি সামনের পাহাড়ের দিকে নিবদ্ধ। এইভাবে না খাওয়া, না চান করা, না কাপড়জামা বদলানো অবস্থায় আমরা কতদিন আর এই অভিযান চালিয়ে যেতে পারবো। এখনও পর্যন্ত আমরা নির্দিষ্ট পাগলা হাতীটার দেখা পর্যন্ত পেলাম না। ভগবান কি আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন না? হঠাৎ নিজেকে যেন বড় অসহায় বলে মনে করতে লাগলাম। জানিনা আমার এই অবস্থা দেখে ভগবানের দয়া হয়েছিল কিনা—আমি উদাসভাবে সামনে পাহাড়ের দিকে চেয়ে বসেছিলাম ঠিক কতক্ষণ খেয়াল নেই। এমন সময় হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, সামনের পাহাড়ে, বাঁ দিকে একটা দাঁতাল হাতী। হাতীটার সারা গা ধুলো-মাটিতে ভরা—চলতে চলতে শুঁড়ে করে ধুলো-মাটি তুলে নিজের গায়ে ও পিঠের ওপর ছড়াচ্ছে। কেন যেন আমার মনে হল এই হাতীটাকে তো আমরা এর আগে কখনও দেখিনি। এই ক'দিনে আমরা ঐ পাহাড়শ্রেণীতে যে ক'টি জংলী হাতী ছিল তাদের প্রত্যেকটিকেই আমরা চিনে ফেলেছিলাম এবং সব ক'টিরই চালচলন মায় ছোট বাচ্ছাগুলির স্বভাব জানা ও চেনা হয়ে গিয়েছিল। একান্ত মনোযোগ দিয়ে এবং সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে হাতীটাকে তখন দেখতে লাগলাম। হাতীটা নিজের মনে এঁকে বেঁকে, আস্তে আস্তে পাহাড়ের ওপর আরও উঁচুর দিকে উঠে যাচ্ছে, তখন হাতীটার

সমস্ত বাঁদিকের শরীরটা লম্বালম্বিভাবে আমাদের নজরে এলো—দেখতে পেলাম হাতী বেশ বড়সড় ধরণের। এইভাবে আরও কিছুটা উপরের দিকে উঠে যাবার পর, হাতীর সমস্ত পেছন দিকটা আমার নজরে পড়ল, তখন দেখলাম তার লেজটি ছয় থেকে আট ইঞ্চির মত মাত্র শরীরে লেগে আছে, বাকীটা নেই। দলীয় কোন প্রচণ্ড লড়াইয়ে, দলপতির আসন লাভের জন্য অন্য কোনও শক্তিশালী হাতী—এই হাতীটির লেজ ছিঁড়ে নিয়েছে এবং এরপর থেকেই দলছুট হয়ে গুণ্ডা হয়ে গিয়েছে হয়ত। তারু আমাদের খুব কাছেই বসেছিল, তাকে ইশারায় ডেকে দেখালাম। তারু হাতীটাকে দেখেই আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে খুব নীচু-গলায় আমায় জানালো—"বুড়া শিকারী সাহেব' এইডাই আমাগো গুণ্ডা-মৈয়ুম। এইডাই আমাগো গ্রামের পাঁচডি লোক মারছে।" খানিক-পরে হাতীটা আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আমি তখন সেই পাহাড়ের খাদটা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। তারু এবং তার তিন সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এইটিই সত্যি-কি তোমাদের লোক মেরেছে? তারা সকলেই একবাক্যে বলে উঠল—'কি বলতাছেন বুড়া শিকারী সাহেব, আমরা এই গুণ্ডাকে চিনি না?' আমি শুনে বললাম—তোমরা এই গুণ্ডাকে আমাদের দিকে তাড়িয়ে আনতে পারবে ত? আমার কথা শুনে তারু ও তার তিন-সঙ্গী একটু মুচকি হেসে-আমাকে বলল—'বুড়া শিকারী সাহেব, আপনার হুকুম হলেই কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এই গুণ্ডা মৈয়ুমকে বাঁশি বাজিয়ে আপনার সামনে হাজির করে দেব।' হঠাৎ মাটির দিকে চেয়ে আমার নজরে পড়ল যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কথাবার্তা বলছিলাম সেটাও একটা হাতীচলা পথ। পথটি আমার বাঁদিক থেকে উঠে এসে আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গা দিয়ে ডানদিক চেপে, পাহাড়ের চূড়ো বেয়ে অপর পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। আমার সামনেই রাস্তার ধারে দেখলাম একটা বাজপড়া গাছ—গুঁড়িটা রয়েছে প্রায় পাঁচফুটের মতন মাটিতে লেগে

এবং গুঁড়িকে জড়িয়ে কিছু লতাপাতা জন্মেছে। সামনের দিকে আরেকটু নজর করতেই দেখলাম ১৫।২০ হাত নীচে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দিক থেকে আরেকটা হাতীচলা-রাস্তা ডানদিকে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ো পেরিয়ে গেছে। তখনই, আমাদের সান্ধ্যবৈঠকে তারুর বর্ণনা—যে হাতী তাড়া খেলে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ো বেয়ে পাকিস্তানে চলে যায়, সে রাস্তা যেন এইটেই বলে মনে হোল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এইটেই কি হাতীদের এই এলাকার পাহাড় পেরিয়ে পাকিস্তান এলাকায় চলে যাবার রাস্তা? তারু সম্মতি জানিয়ে বলল—'হাঁ বুড়া শিকারী সাহেব, এই রাস্তার কথাই ত ক'য়দিন সান্ধ্যবৈঠকে আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি।' আমি তখন আমার কর্তব্য ঠিক ক'রে ফেলেছি। আমি তারুকে বললাম—আমি এই বাজপড়া গাছের আড়ালে বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালাম, যাতে হু'টো রাস্তার যে-কোনটা ধরে হাতী এলেও আমি তার মোকাবিলা করতে পারি। আমার কথা শুনে তারু এবং তার তিন সঙ্গী সমস্বরে বলে উঠল—'বুড়া শিকারী সাহেব,—আপনি ক্ষ্যাপছেন—আপনারে মৈয়ুম মাইরা ফেলব—তার থেইকা আপনে একটা গাছে চইড়া বসেন।' পাগলা হাতী এক ভীষণ ভয়াবহ জিনিস, মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকে মোকাবিলা করা নেহাৎই হুঃসাধ্য। তবুও আমি কিন্তু গাছে চড়তে একদম নারাজ। আমার কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা—ত্রিপুরার সব ক'টি পাহাড়ই বেশ কিছুটা মাটি দিয়ে ঢাকা; যদিও তার ওপর অনেক বড় বড় গাছ জন্মেছে, কিন্তু আমার ধারণা, সেগুলো হাতী যে-কোন সময় সামান্য ধাক্কাতেই মাটিতে ফেলে দিতে পারে। এ অবস্থায় গাছে চড়ে থাকলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধেই বেশী হবার সম্ভাবনা। তখন ভবানী আমাকে খুব গম্ভীরভাবে বলল—'দাদা, গোঁয়ারতুমি করবেন না। এরা যা বলছে, তা শুনুন। আপনি গাছে চড়েই হাতীর অপেক্ষায় থাকুন।' আমি ভবানীকে বললাম—আমি আমার মন ঠিক করে ফেলেছি। আমি

এইখানেই এই বাজপড়া গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবো! এতে হয় হাতী আমাকে মারবে, নয়ত আমি হাতীকে মারবো—তুমি যদি গাছে চড়তে চাও, তাহলে নিজের পছন্দমত একটা গাছে চড়ে বস। আর তারু ও তার তিন সঙ্গীকে নিয়ে যাও। তুমি গাছে চড়ে বসলে পর তারা বাঁশী বাজিয়ে বীটের ব্যবস্থা করবে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম, সেখান থেকে পাহাড়ের নীচটা কয়েক'শ গজ নেমে গেছে। তারপর আবার পাহাড়টা ক্রমশঃ উঁচুর দিকে উঠে গেছে এবং ওর পরের পাহাড়েই আমরা কিছুক্ষণ আগে পাগলা হাতীটাকে দেখতে পেয়েছিলাম। সেই পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, আমাদের ঠিক সামনাসামনি পাহাড়টার ওপর, মনে হোল বেশ একটা মোটা গাছ এবং তার একটা মোটা ডাল মাটি থেকে ১৫।২০ হাত ওপরে ছড়িয়ে আছে। ভবানীকে সেই গাছ দেখিয়ে বললাম, ওই গাছ যদি পছন্দ হয় তাহলে সে যেন চড়ে বসে। তখন আর দেরী না করে ভবানী, তারু ও তার তিন সঙ্গী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ভবানী ও তারুদের কয়েকটা বিন্দুর মতন আস্তে আস্তে অপর পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে দেখলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ভবানীকে একটা বিন্দুর মতন আস্তে আস্তে গাছে চড়তেও দেখলাম। এতে কতক্ষণ সময় গেছে আমার খেয়াল নেই; বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি সেই বাজপড়া গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আমার '৪৫০ দোনলা রাইফেলে দুটো গুলি ভরে নিয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, যদি সত্যিই তারু ও তার সঙ্গীরা পাগলা হাতীকে তাড়িয়ে আনতে পারে, তাহলে আমি হাতীর ঠিক জায়গায় গুলি করতে পারবো কিনা। আমার পুঁথিগত বিদ্যে—'জন হাণ্টার', 'টেলার', 'বেল'—ইত্যাদির লেখা থেকে। এঁরা হাতীর কোন্ কোন্ জায়গায় গুলি করেছেন তা মনে মনে ঝালিয়ে নিলাম। প্রত্যেক অভিজ্ঞ হাতী

শিকারীই বলেছেন মারমুখী তেড়ে আসা হাতীকে রুখতে হলে গুলিকে তার মস্তিষ্ক ভেদ করে মগজে পৌঁছে দিতে হবে এবং তা যদি না পারা যায় তাহলে মারমুখী হাতীর হাত থেকে শিকারীর বাঁচার কোনই সম্ভাবনা নেই। প্রত্যেক অভিজ্ঞ শিকারীই বলেছেন যে, হাতীর মস্তিষ্কে গুলি পৌঁছাবার জায়গা মাত্র তিনটি,—যথা, হাতীর শুঁড় মাথার কাছে যেখানে শেষ হয়েছে সেই সংযোগস্থল থেকে ৪।৫ ইঞ্চি ওপরে গুলি করলে সোজা মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায়। এটা সম্ভব যদি হাতী একেবারে সামনা সামনি এসে পড়ে। আর হাতী যদি পাশ থেকে আসে, তাহলে হাতীর দুধারের কানের পাশে যে খাঁজের মত আছে, সেই খাঁজের মধ্যে এমন একটা তির্য্যক কোণে গুলি লক্ষ্য করতে হবে যাতে সেটা মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায়। হাতীর মাথার ওপরে দুটি বড় রুটির মতন মাংস আছে, তার তলায় হাতীর বয়স অনুযায়ী ৭ থেকে ৯ ইঞ্চি মোটা হাড় আছে; ঠিক সেই হাড়ের নীচে ছোট একটি বানরুটির মাপের মস্তিষ্কটিই হওয়া উচিত—একমাত্র লক্ষ্যস্থল, —এ ছাড়া মারমুখী তেড়ে আসা হাতীকে রুখতে পারা অসম্ভব। অনেক অভিজ্ঞ শিকারীর মতে হাতী মারতে হ'লে খুব ভারী দোনলা রাইফেল প্রয়োজন এবং যদ্দূর সম্ভব কাছ থেকে গুলি করাও দরকার। তাঁদের মতে ২০ পা দূর থেকে গুলিও দূর-পাল্লা। অতএব, তাঁদের মত অনুযায়ী হাতীকে মারতে হ'লে ১০।১৫ হাতের মধ্যে এনে এক গুলিতে হাতী মারা উচিত। কী সাংঘাতিক ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা।

জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মনে মনে এইসব আওড়াচ্ছি আর ভাগ্যের উপর ভর করে বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি কতক্ষণ তার ঠিক নেই। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর হঠাৎ শুনতে পেলাম তারু ও তার তিন সঙ্গীর প্যাঁ প্যাঁ করে বাঁশির আওয়াজ। খানিক পরে মড় মড়, কড় কড় করে গাছপালা ভাঙ্গার শব্দ শুনে বুঝলাম হাতী নীচে নামছে। সামনের পাহাড়ের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম, আমাদের সেই নির্দিষ্ট পাগলা হাতীটা

আরও তিনটে মাদী হাতী নিয়ে বুলডোজারের মতন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গাছপালা, মাটি, পাথর ঠেলে নেমে আসছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, হাতী যখন পাহাড় থেকে খুব জোরে নেমে আসে, তখন তাদের পেছনের পা দু'টো ও সামনের পা দুটো এগিয়ে দিয়ে পেছনটা মাটিতে রেখে বরফে স্কেট করার মতন নামতে লাগল। চার চারটে হাতীর পর পর নেমে আসা দেখে, আমার বুকটা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল কিছুক্ষণের জন্য—কিন্তু আমি তখন বেপরোয়া, তখন আমার মনের বা শরীরের যা-অবস্থা, তাতে আমি পরমুহূর্তেই যে-কোনো চরম ঘটনার জন্য নিজেকে তৈরী করে নিয়েছিলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, যদি কপালগুণে হাতী কোনরকমে আমার বন্দুকের নাগালে আসে, তাহলে হয়ত আমি হাতীকে মারবো—নয় হাতীই আমাকে মারবে। এইভাবে মনস্থির করে আমি পাগলা হাতীর আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখলাম হাতী চারটি অপর পাহাড় থেকে মড় মড়, কড় কড় করে নামতে নামতে উপত্যকায় মিলিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সময় চলে গেল কিন্তু হাতীগুলিকে আর দেখা যাচ্ছিল না। মনের মধ্যে নানা চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে—গুণ্ডা মৈয়ুম কি আমার বন্দুকের নাগালে আসবে না। লংথরাই বাবা কি আমায় দয়া করবেন না। এমন সময় আমার পঞ্চম চিন্তা—স্নায়ুতে যেন আভাষ পেলাম—বিপদ আসছে। আমি আমার বাঁদিকের হাতীচলার রাস্তায় যেটা ক্রমশঃ নীচের উপত্যকা থেকে আমার দিকে উঠে পাহাড়ের চুড়ো পেরিয়ে গেছে, সেইদিকে আমার সমস্ত মন সংবদ্ধ করে শ্যেনদৃষ্টিতে হাতের রাইফেল শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম সেই বাজপড়া গাছটাকে আড়াল করে। যে রাস্তার উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি, তার ১৫।২০ হাত নীচে আরেকটি রাস্তা; এই-দুটি রাস্তা বাজপড়া গাছ থেকে আমার বাঁদিকে ৩০।৪০ হাত দূরে এক জায়গায় মিলে গিয়ে পাহাড়ের ঢালের দিকে মিলিয়ে গেছে। আর

নীচের রাস্তাটি আমার ডানদিক দিয়ে গিয়ে পাহাড়ের চুড়োয় মিলিয়ে গেছে। আমি আমার বাঁদিকে দুই রাস্তার সঙ্গমস্থলের দিকে তাকাচ্ছি আর মনে মনে প্রার্থনা করছি, যেন হাতী দুই রাস্তার সঙ্গমস্থল থেকে আমার দিকের রাস্তায় উঠে আসে, যাতে আমি সোজা মগজে গুলি করতে পারি। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ সামান্য খখস্‌খস্‌ আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং দেখলাম পাগলা হাতীটা তার শুঁড়টা আকাশের দিকে তুলে হনহন করে নীচে থেকে ওপরের দিকে উঠে আসছে এবং পেছনে আসছে মাদী হাতী তিনটে। ঐ চারটি বিরাটকায় জানোয়ার এতো নিঃশব্দে ও ত্রস্ত গতিতে উঠে আসছে দেখে আমি আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বাজপড়া গাছের আড়ালে নিজেকে যতদূর সম্ভব লুকিয়ে, রাইফেল শক্ত করে ধরে ভগবানের কাছে বারবার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি, হাতীটা যেন আমি যে-রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি ঠিক সেই-রাস্তাতেই সোজা উঠে চলে আসে ; তাহলে আমার পক্ষে তার শুঁড় ও মস্তিষ্কের সঙ্গমস্থলে গুলি বসিয়ে দেওয়া মোটেই কষ্টকর হবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচে দুই রাস্তার সঙ্গমস্থলে পাগলা হাতীটাকে শুঁড় মাথায় তুলে এগিয়ে আসতে দেখলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য হঠাৎ কেন জানি না পাগলা হাতীটা সঙ্গমস্থলে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল এবং পরমুহূর্তে দেখলাম পেছনে যে তিনটী মাদী হাতী ছিল তার প্রথম বড় মাদীটা পাগলা হাতীকে পেরিয়ে নীচের রাস্তা ধরে হনহন করে এগুতে লাগল এবং সেইসঙ্গে দেখলাম পাগলা হাতীটাও মাদী হাতীটার পেছন নিয়েছে ও বাকী মাদী হাতী দুটো তাদের অনুসরণ করছে। এই অবস্থা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম যে, ওপর-থেকে নীচে গুলি করলে হয়তো আমার গুলি মস্তিষ্কেই পেঁছিবে না। অন্যথায় হাতী হয়তো আমাকেই মেরে ফেলবে। কিন্তু আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ যে, হয় হাতী আমাকে মারবে না হয় আমি হাতীকে মারব। এ সুযোগ যদি আমি আজ হারাই, তাহলে আর কোনদিন হয়তো সুযোগ নাও

আসতে পারে। মনের মধ্যে যখন এইসব চিন্তা তোলপাড় করতে লাগল। তখন দেখলাম প্রথম মাদী হাতীটা শুঁড় নামিয়ে ঠিক আমার নীচের রাস্তা দিয়ে আমাকে পেরিয়ে হন্‌হন্ করে চলে যাচ্ছে। পাগলা হাতীটা কিন্তু দেখলাম সব সময় শুঁড় উপর দিকে তুলে বিপদের গন্ধ শোঁকবার চেষ্টা করছে। বাজপড়া গাছের লাইনের কাছাকাছি যখন পাগলা হাতীটা নীচে এসে পড়ল তখন সে আমার গন্ধ পায় এবং তৎক্ষণাৎ শুঁড় গুটিয়ে আমার দিকে লক্ষ্য করে বিকট একটা হৃদয় বিদারক চীৎকার করে পাহাড় বেয়ে নীচে থেকে ওপরে উঠে আসতে আরম্ভ করে—তখন আমার ও পাগলাহাতীর ডানদিকের কপালটার দূরত্ব ৮।১০ হাতও নয়। হাতীর চার্জের এই সাংঘাতিক চীৎকারে (যাকে ইংরাজীতে "ট্রামপেট" বলে) অনেক শিকারীর স্নায়ু বিকল করে দেয় এবং সে অবস্থায় সে সম্বিত হারিয়ে ফেললে অনায়াসেই হাতী তখন শুঁড়ে পেঁচিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে তার জীবন শেষ করে দেয়। বই পড়ে জেনেছি ও অভিজ্ঞ শিকারীর কাছে শুনেছি, হাতীর এই চার্জের সামনে পড়লে কারুরই নিস্তার নেই। তৎক্ষণাৎ যদি সমস্ত সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করে ঠিকমত গুলি করে হাতীকে না মেরে ফেলা যায়, তবে মুহূর্তের মধ্যেই কি শিকারী কি অন্যলোকের দেহটা একটা তাল পাকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হাতীর সময় লাগে না—দৌড়ে পালাবার কোন চেষ্টা করলেই নিশ্চিত মৃত্যু। আমি ঐ অবস্থায়ই তখন পড়ে গেছি। সাক্ষাৎ যমের মত তার এই ভীষণ মারমুখো মূর্ত্তিতে সে আমার দিকে নীচ থেকে উঠে আসতে লাগল এবং সেই এক খণ্ডমুহূর্তের মধ্যে আমাদের দুইটির জীবন ও মৃত্যু যেন বলে দিল এ সঙ্কটে যে সফল হবে সে-ই জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে। মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমি হাতীটার ডানদিকের কানের খাঁজের ওপর যথাযথ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম এবং গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম পাগলা হাতীটা পেছন মুড়ে বসে পড়ল। সবচেয়ে আশ্চর্য্য জিনিস

দেখলাম যে, মাদী হাতীটা, যেটা সবচেয়ে আগে চলে যাচ্ছিল, আমার গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সে লাট্টুর মতো ঘুরে এসে—বসে পড়া পাগলা হাতীটাকে শুঁড়ে করে তার পেছনটা একটু তুলে ধরে সাহায্য করল পাহাড়ের ঢালবেয়ে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাকী মাদীহাতী দুটোও একই প্রথায় গুলি খাওয়া পাগলা হাতীটাকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। সাধারণতঃ পাগলা-হাতীর সঙ্গে অন্য কোন হাতীকে দেখা যায় না, কিন্তু 'বীটের' ফলে যখন সকলেই প্রাণভয়ে পালাতে চায়, তখন তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না বলেই মনে হ'ল। যখন হাতী চারটে গড়িয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে, দেখলাম পাগলা হাতীটার ডানদিগের রগ ও কানের কাছ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্তের ধারা বইছে। হাতীটা খুবই জখম হয়েছে নিঃসন্দেহে কিন্তু সে যে সম্পূর্ণ মরেনি সেটা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। তাকে পুরোপুরি মারতে হলে এবং তাকে এই মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হলে, আরও একটি গুলির দরকার, কিন্তু তখন আমি নিরুপায়। আমি আমার দোনলা রাইফেল থেকে একটি গুলি ছুঁড়ে অপরটি সংরক্ষণ করেছিলাম হাতীর পাল্টা আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য। নানা উত্তেজনায় এইসব ভাবতে ভাবতে দেখলাম হাতী চারটে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের উপত্যকাতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তখন অতি করুণভাবে মনে মনে বললাম—ভগবান এ-কী করলে? এত কষ্টের পর যদিবা পাগলা হাতী পেলাম, তাকে এক গুলিতে মারতে পারলাম না? এই হাতী যদি গুলি খাওয়া অবস্থায় আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তাহলে এর নৃশংসতা যে-আরও বাড়বে। এমনিভাবে কতক্ষণ সময় গেছে জানিনা, হঠাৎ আমার নজরে পড়ল চারটে কাল কাল বিন্দুর মতন, উপত্যকা থেকে অপর পাহাড়ে যেখানে ভবানী বসে আছে সেদিকে ওঠবার চেষ্টা করেছে। —অনেকক্ষণ লক্ষ্য করার পর বুঝতে পারলাম মাদী হাতী তিনটে

তাদের মাথা ও শুঁড় দিয়ে জখমী পাগলা হাতীটাকে অপর পাহাড়ে ঠেলে ওঠাবার অক্লান্ত চেষ্টা করেছে। আমি তখন একদৃষ্টিতে ভবানীর দিকে লক্ষ্য রেখে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম যে, জখমী পাগলা হাতীটা যেন ভবানীর বন্দুকের নাগালে এসে পড়ে এবং ভবানী একগুলিতে তাকে যন্ত্রণা থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে পারে। এই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলাম, ভবানী সেই গাছের ডালের ওপর একটু যেন নড়ে-চড়ে নীচের দিকে তার রাইফেল তুলে নিশানা নিচ্ছে। কয়েক মিনিট পরেই ভবানীর '৪৭০ রাইফেল গর্জে উঠল আর আমি ভগবানকে ডাকতে লাগলাম, হে ভগবান! ভবানীর গুলি যেন পাগলা হাতীর মাথা ভেদ করে তার যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটায়। খানিক পরে আমি আমার পাহাড় থেকে চীৎকার করে ভবানীকে জিজ্ঞাসা করলাম,—সে ঠিক পাগলা-হাতীটাকেই মারতে পেরেছে কি-না? ভবানী চীৎকার ক'রে আমায় জবাব দিল—'হাতী মরেছে, ভাববার কিছু নেই—হাতী মরেছে—একটু পরে আস্তে আস্তে নেমে আস্থন।' আমি তার কথা শুনে পাহাড়ের ঢালবেয়ে নীচের উপত্যকার দিকে নামতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি ও ভবানী গিয়ে দেখলাম বিরাট জন্তুটি অতি অসহায়ভাবে, রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে পড়ে আছে। অল্পকিছুক্ষণ আগে যার ভীষণমূর্তি ছিল, যার ভয়ে আমাদের হৃৎকম্প হচ্ছিল, সেই বিরাট জন্তুটি এখন নিথর নিশ্চল হ'য়ে আমাদের সামনে মাটিতে লুটিয়ে আছে। খানিক্ষণের মধ্যেই তারু ও তার তিন সঙ্গী খুব খুশী মনে হাসতে হাসতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। তখন বেলা প্রায় দেড়টা হবে। ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই আমি তারুকে বললাম যে, সময় নষ্ট না করে সে যেন তার দুই চ্যালাকে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়, কুড়ুল আনার জন্য। কারণ দাঁত-দুটো আমরা আজই খুলে নিতে চাই, নাহলে এগুলো চুরি যাবার সম্ভাবনা আছে। তারু আমার কথা শুনে তার সঙ্গীদের থেকে

দুজনকে গ্রামে পাঠিয়ে দিল কুড়ুল আনবার জন্য। আমরা প্রথমে হাতীর গায়ে লাগা দুটি গুলির লক্ষ্যস্থল ও আঘাতের স্থান পরীক্ষায় ব্যস্ত হলাম, দেখলাম আমার গুলিটি হাতীটার কপালের ডানদিকের কানের সামনের খাঁজ ভেদ করে নীচের দিকে গিয়ে ভিতরের বাঁ দিকের দাঁতের গোড়ায় লেগে (টাস্কের গোড়ায়) আবার উপরের দিকে উঠে কপাল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে। যাকে বলে ricocheted (রিকোসেটেড্) শট্ বা গুলি। আর ভবানীর গুলি আমার গুলির কয়েক ইঞ্চি তফাৎ দিয়ে ঢুকে হাতীটার মগজে পৌঁছেছে। যা হোক আমরা একটা টিলার ওপরে বসে মরা হাতীটাকে পাহারা দিতে লাগলাম। হঠাৎ ভবানী আমার হাতটা ধরে ইশারা করে, বাঁদিকের বেশ কিছুদূরে একটা জায়গা দেখাল; সেখানে দেখি প্রায় ৩০।৪০টা হাতী—দাঁতাল, মাদী ও বাচ্চা মিলিয়ে, সব এক লাইন ধরে, কান খাড়া করে, আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের থেকে সেই হাতীগুলোর দূরত্ব ৩।৪শ' গজের বেশী হবে না। ভবানী ভয় পেয়ে বলল—'দাদা—এদের মতলব কি? এরা আমাদের পাল্টা আক্রমণ করবে নাতো?' আমি কিন্তু হাতী-গুলোর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম কেন তারা এই উদগ্রীব নয়নে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কারণ, আমার মনে হ'ল এবং ভবানীকেও তাই বললাম যে আমরা হয়ত হাতীটা মেরে এই পাহাড়শ্রেণী থেকে অন্য পাহাড়শ্রেণীতে পালাবার রাস্তা রুখে দিয়েছি; যতক্ষণ না আমরা এখান থেকে সরে যাই, ততক্ষণ তারা এ-এলাকা ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তান এলাকায় চলে যাবার রাস্তা পাচ্ছে না। আরও বেশ কিছুক্ষণ হাতীর পালের দিকে তাকিয়ে থাকার পর যখন দেখলাম যে, প্রত্যেকটি হাতী মায় বাচ্চাসমেত এক সারিতে উদগ্রীব নয়নে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন আমার মনে হল এরা সকলে তাদেরই একজনের মৃত্যু হওয়াতে আন্তরিক শোক প্রকাশের জন্য তারা পরপর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। ইংরাজীতে যাকে বলে মোর্নিং প্যারেড। আশ্চর্য্য একটা বাচ্চা হাতীকেও লাইন ভাঙ্গতে দেখলাম না। ইতিমধ্যে তারুর দুই চ্যালা গ্রাম থেকে কুড়ুল নিয়ে এসে দাঁত-দুটি খুলে বার করতে করতে বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজিয়ে দিল। যাই হোক আমরা আর সময় নষ্ট না করে হাতীর দাঁতদুটো নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে সুরু করলাম। রাত্রে গ্রামে ফিরে এসে মোড়লকে দাঁতদুটি দেখাতে সে খুবই খুশী হল। আমরাও যে খুবই খুশী এটা জানাবার জন্য মোড়লকে বললাম যে, আজ আমরা তোমাদের গ্রামের সব ছেলে মেয়ে বুড়ো যে যেখানে আছে সবাইকে মদ খাওয়াব ; তার জন্য যা টাকা বা যা কিছু আয়োজন দরকার হয় কর। এই বলেই মোড়লের হাতে তিনখানা দশটাকার নোট গুঁজে দিলাম। তারপর আমরা যথা-রীতি হাতমুখ ধুয়ে, জল খেয়ে আমাদের সেই রাজশয্যার পাশে দাঁত দুটোকে রেখে, খুব নিশ্চিন্ত হয়ে আরামে বিশ্রাম করতে লাগলাম। অনেক রাত পর্যন্ত আমি ও ভবানী শুয়ে শুয়ে পাগলা হাতীর ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তেড়ে আসার কথা আলোচনা করছিলাম। আমার কিন্তু ওই বিরাট জানোয়ারটাকে গুলি করার পর তাকে প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে খুবই খারাপ লাগছিল। হাতীটার উগ্রমূর্তিই যেন ভাল ছিল। প্রতি পদক্ষেপে ভীমদর্পে পাহাড় কাঁপিয়ে সামনের পাহাড় থেকে হাতীটা আমার পাহাড়ের দিকে যখন আসছিল, তখন তার সেই ভীষণ চেহারা দেখে, আমার বলতে বাধা নেই, হৃৎকম্প উঠেছিল মুহূর্তের জন্য। জানিনা জীবনে আর কোনদিন পাগলা হাতী মারার সুযোগ হবে কি না—আমার নিজের মতে একটাই যথেষ্ট। হাতীটা মারার পর তেজস্বী একটা প্রাণহানির জন্য আমার এমন কষ্ট হোল যা বলে বোঝাতে পারবো না। আমার নিজের ইচ্ছায় এ-জীবনে আর কোন পাগলা হাতী মারতে যাব কিনা তাতে বেশ সন্দেহ আছে। যতদিন পর্যন্ত পাগলা হাতী মারতে পারিনি ততদিন প্রতিমুহূর্তেই আমার মনে হোত যে, শিকারী জীবনটাই বুঝি

ব্যর্থ হয়ে গেল কিন্তু এখন ঠিক তার বিপরীত। ভবানী আমাকে বলল দাদা, "ভোর চারটের সময় একটা লোক নিয়ে 'ছামনু' রওনা হব। আমাদের ক্যামেরাটা আনা দরকার—পাগলা হাতীর কয়েকটা ছবি আমাদের তুলতে হবে। আর হাতে তৈরী করে আনবো কয়েকটা পরোটা যা দিয়ে আমরা বহুদিন পর আমাদের প্রাতরাশ করতে পারব।" আমি বললুম—পরোটার থেকেও বেশী জরুরী আমার চা ও চুরুট। আমি চা ও চুরুট খুবই ভালবাসি। এই ৯।১০ দিন একপেয়ালা চাও আমাদের পেটে পড়েনি। আর দেখতে পাইনি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় চুরুট। আমি অনেকদিন থেকে বর্মাচুরুট খাই—সব সময়েই আমার মুখে একটা চুরুট লেগে থাকে। পকেটে চুরুটের বাক্সে ৪টে চুরুট ও মুখে একটা নিয়ে গত ১লা মার্চ আমরা রওনা হয়েছিলাম হাতী শিকার অভিযানেঃ সব শেষ হয়ে গিয়েছিলো সেদিনই; তারপর থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত আর রসদ পাইনি। অবশ্য তার অভাবও বোধ করিনি তেমন। কারণ এ'কদিন আমাদের ধ্যানজ্ঞান ছিল পাগলা হাতী শিকার। আজ সে পর্ব হয়েছে সমাধান, তাই অন্য নেশাগুলো চাড়া দেবার অবকাশ পাচ্ছে। ভবানী বলল—সে সবই ব্যবস্থা করে নিয়ে আসবে, এমন কি ঊষা চক্রবর্তীকেও।

ভবানী ঘুম থেকে উঠে পড়ল রাত তিনটের সময় এবং একটি লোক সংগে নিয়ে সে ছামনুর পথে রওনা হল। যাবার সময় আমায় বলে গেল যে, সকাল আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে ফিরে আসবে সবকিছু নিয়ে। ভবানী চলে যাবার পর, আমি আবার সেই রাজ-শয্যাতে পাশ ফিরে আরেকটা ঘুমে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। পরের দিন সকালে আমার কোন তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে উঠে ঝরণার জলে হাত মুখ ধুয়ে, মোড়লের মাচাবাড়ীর বারান্দাতে বসে গ্রামবাসীদের সাথে গল্প আরম্ভ করলাম। সকালে গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে আমার কাছে এল কৃতজ্ঞতা জানাতে যে 'গুণ্ডা মৈয়ুম' মেরে আমরা তাদের বিপদমুক্ত করেছি। মোড়লের

কাছে শুনলাম, সমস্ত গ্রামের লোক দু' কারণে আমাদের উপর খুব খুশী। প্রথম, আমরা গুণ্ডা মৈয়ুম মেরেছি ; দ্বিতীয় এই সুযোগে তারা বহুদিন পরে হাতীর মাংস খেতে পারবে। ওরা হাতীর মাংস খেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু প্রচুর ইচ্ছা থাকা সত্বেও ১২।১৪ বছরের মধ্যে তারা সে সুযোগ পায়নি। কারণ বনবিভাগের লোকেরা তাদের উপর খুব কড়া নজর রেখেছে—লুকিয়ে হাতী শিকার ক'রে তার মাংস খাওয়া খুবই কঠিন। সকাল আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে গ্রামে খুব একটা চাঞ্চল্য নজরে পড়ল। প্রত্যেকে কপাল থেকে পিঠে ঝোলান অবস্থায় একটা বাঁশের ঝুড়ি নিয়ে কাটারি হাতে জঙ্গলের দিকে যেতে লাগল। আমি মোড়লকে জিজ্ঞেস করলাম—এরা কোথায় যাচ্ছে ? —জঙ্গলে কাঠ কাটতে ? মোড়ল একটু হেসে আমাকে জানাল —বুড়া শিকারী সাহেব, ওরা সব হাতীর মাংস কাটতে যাচ্ছে। আমি শুনে মোড়লকে বললাম,—ওদেরকে বলে দাও আমরা হাতীর পা চারটে চাই। তাছাড়া জোয়ান শিকারী সাহেব হাতীর ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরা আনতে গেছে, সে ছবি না তোলা পর্যন্ত ওরা হাতীটাকে যেন না কাটে। শুনে মোড়ল আমাকে বলল—শুধু তো এই গ্রামের লোক মাংসের জন্য যাচ্ছে না—আশেপাশে যত গ্রাম আছে সেখানকার সবাই খবর পেয়ে চলে গেছে। যাই হোক আমি খবর পাঠাচ্ছি। ইতিমধ্যে ভবানী বীট অফিসার উষা চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। ভবানীকে দূরে থেকে আসতে দেখে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—চা ও চুরুট এনেছ তো ক্যামেরার সঙ্গে ? ভবানী হাসতে হাসতে বলল,—'সবই এনেছি।' ভবানীর সংগে গ্রামের যে লোক গিয়েছিল, তার কাঁধে একটা 'হ্যাভার স্যাক' ঝুলতে দেখলাম ; ওরা সবাই মাচার উপরে উঠে এল, আমি মোড়লকে খুব তাড়াতাড়ি এক হাঁড়ি গরম জল করতে বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ভবানীর আনা চা ও চিনি নিয়ে এক হাঁড়ি চা বানান হোল। আমি একটা বড় লোটাতে করে এক লোটা

চা খেলাম। ভবানী ঝোলা থেকে চার খানা আধ ইঞ্চির থেকেও মোটা মোটা পরোটা বার করলো এবং সেই চারখানা পরোটা মাচার ওপরে যতজন লোক ছিল সবাই ভাগ করে খেলাম। প্রত্যেকের কপালে এক একটি 'টফির' মাপের টুকরো জুটলো। চা পর্ব শেষ করে ৯টার পর আমরা ক্যামেরা ও রাইফেল নিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হ'লাম। প্রায় এগারটা নাগাদ আমরা হাতীর কাছে পৌছে দেখি ১২৮ জন লোক প্রত্যেকে এক একটা করে ঝুড়ি নিয়ে উপস্থিত এবং তারা হাতীর পেট ও পিঠ থেকে মাংস কাটতে সুরু করেছে। আমরা দেখে অবাক হলাম যে তাদের সঙ্গে কাটারি থাকা সত্ত্বেও তারা বাঁশ কেটে, একহাত লম্বা ছুরির মতন করে, সেই ছুরি দিয়ে হাতীর পুরু চামড়া ও মাংস কেটে কেটে বার করছে। আমি মোড়লকে জিজ্ঞাসা করলাম—এদের সঙ্গে কাটারি থাকা সত্ত্বেও এরা কাটারি দিয়ে মাংস না কেটে বাঁশের ছুরি দিয়ে হাতীর মাংস কাটছে কেন? মোড়ল একটু হেসে একটা বড় কাটারি নিয়ে হাতীর মাংসের ওপর অনেক রকম কসরৎ করে চালিয়ে দেখাল কাটারি বা কুড়ুল দিয়ে মাংস কাটা বেশ কষ্টকর। তার থেকে অতি সহজ উপায় তারা বার করেছে—একটা বাঁশকে কাটারি দিয়ে দু'আধখানা করে, দু'পাশটা কাটারি দিয়ে ধার বানিয়ে, সেই দিয়ে মাংস কাটা সহজ। সত্যিই দেখলাম, প্রায় ক্ষুরের মতন ধার হচ্ছে ওই বাঁশের ছুরিতে এবং তাই দিয়ে হাতীর পুরু চামডা ও মাংস মাখনের মত কেটে নামিয়ে ফেলতে তাদের এতটুকু পরিশ্রম হচ্ছে না। এক একটা মাংসের চাঁই ৩।৪ ইঞ্চি মোটা, ১২ থেকে ১৪ ইঞ্চি চওড়া এবং প্রায় ২ ফুট করে লম্বা—যা তারা সহজেই বাঁশের ছুরির সাহায্যে কেটে বার করছে। আমরা পৌছবার আগেই মাংস কাটতে সুরু করার জন্য মোড়ল তাদের 'আদি' ভাষাতে বেশ খানিক বকাবকি করল। তখন তারা হাতীটা ছেড়ে একটু পাশে সরে দাঁড়াল। আমি তখন কয়েকটা ছবি তুললাম। ভবানী আমাকে

বেশী ছবি তুলতে বারণ করলো কারণ অনেকখানি মাংস কেটে বার করে নেবার পর হাতীটার চেহারা বিসদৃশ হয়ে পড়েছিল। আর তাছাড়া ওর ইচ্ছে, ফেরার পথে মনুঘাটে গিয়ে বিভাগীয় বনবিভাগের অফিসারের মাধ্যমে আমরা যদি আরও দু একটা পাগলা হাতীর সন্ধান পাই তাহলে তা শিকার করে তার ছবি তুলবে, তার জন্য কিছু ফিল্ম রেখে দেওয়া দরকার। ত্রিপুরার সরকারি গেজেট অনুযায়ী সে বছর প্রায় ৭।৮টা হাতীকে পাগলা বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আমাদের অনুমতি রয়েছে, সারা ত্রিপুরাতে যেখানে যত পাগলা হাতী আছে তা শিকার করার। যা হোক আমাদের কপাল ভাল, হাতীর পা চারটে তখনও অক্ষত ছিল। আমি তারু ও তার সঙ্গীদের বললাম, হাঁটু থেকে হাতীর পা চারটে কেটে ফেলতে এবং তার থেকে হাড় মাংস সব বার করে নিতে। পা থেকে হাড় মাংস বের করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হোল। বিকেল তিনটা সাড়ে তিনটার মধ্যে আমরা পা চারটি থেকে যদ্দুর সম্ভব হাড় মাংস বের করে ফেললাম আর ওদিকে ১২৮ জন অদিবাসী ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অতবড় হাতীটার সমস্ত মাংস মায় হাড় পর্যন্ত চেঁচে বার করে ফেলল। নিজের চোখে না দেখলে এ দৃশ্য বিশ্বাস করা খুব মুস্কিল। আগেই বলেছি পাহাড়ের আসে পাশে এবং ওপরে জঙ্গলের গভীরতা খুবই বেশী। গাছগুলোর ঘনত্ব আমাকে আকর্ষণ করছিল খুব—তাই তার একটা ছবি তুলে স্মৃতি হিসেবে রাখলুম। তারপর আর দেরী না করে আমরা বেরিয়ে পড়লুম, মোড়লের মাচা বাড়ী অভিমুখে।

বেলা ৫টা নাগাদ মোড়লের বাড়ী পৌঁছে মোড়লের বৌর কাছে জমা রাখা হাতীর দাঁত দুটি নিয়ে ওদের বাচ্চা দুটোকে মিষ্টি খাবার টাকা দিয়ে, উপস্থিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তাদের অফুরন্ত আশীর্বাদ নিয়ে আমরা ছা-মনুর পথে রওনা হলাম। ছা-মনু পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে সাতটা বাজল। ছা-মনুর বিট অফিসে থেকে আমাদের জিতেনচন্দ্র এ কদিন খুব আরামে একা একাই

আমাদের রেশনের সদ্ব্যবহার করেছেন। আমরা পৌঁছেই তাকে দিয়ে একটু চা বানিয়ে খেয়ে সোজা কুয়াতলায় গেলাম। তুর্গন্ধময় জামাকাপড় ছেড়ে খুব ভাল করে স্নান করলাম প্রায় এগার দিন পরে। স্নান করার পর নিজেদের বেশ পরিষ্কার ও ঝরঝরে মনে হতে লাগল। জিতেনকে জিজ্ঞেস করলাম—জিতেন আজ রাত্রে তুমি কি খাওয়াইবা? তার উত্তরে জিতেন বলল—"আজ্ঞে ডাইল চড়াইমু, ভাত করুম আর একটা আলুপিঁয়াজের তরকারী করুম।" স্নান করে ভবানী ও আমি আমাদের বিছানাতে লম্বা হয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম, সারা গা হাতে পায়ে বেশ ব্যথা ও ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। তুই বিছানাতে তুই বন্ধু শুয়ে বেশ কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তা বলতে লাগলাম—যতক্ষণ না জিতেন তার পাকা হাতের ডাইল আর আলু পিঁয়াজের তরকারী নিয়ে এলো। তখন রাত সাড়ে নয়টা। আমরা পেটভরে সেই 'পরমান্ন' খেয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে ভীষণ ঝড় ও জলে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালা দিয়ে জল আসছিল; সেই জানলাগুলো ভাল করে বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়লাম। পরের দিন কেবল খেলাম, ঘুমালাম আর গল্প করে কাটালাম ভবানী ও আমি। মাঝে মাঝে ঊষা চক্রবর্ত্তীও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছিল, অবশ্য একটা কাজ আমাদের করতে হচ্ছিল সময়ে সময়ে; তা হোল হাতীর পা চারটির তত্ত্বধান। হাতীর পায়ের যে সব জায়গা থেকে মাংস ও হাড় বার করে নেওয়া হয়েছে সে সব জায়গায় প্রচুর পরিমাণে নুন গুঁজে দেওয়া এবং হাত দিয়ে সে নুন সব জায়গায় রগড়ে দেওয়া, তারপর কয়েক ঘণ্টা পর পর সেগুলো থেকে বেরুন জল ফেলে দিয়ে, আরও কিছু নুন দিয়ে পা চারটিকে বিনা রোদ্দুরে হাওয়ায় শুকিয়ে তোলার ব্যবস্থা করা।

১০ই মার্চ হাতী মেরে ছা-মনু ফিরে আসার পর ১৩ই মার্চ পর্য্যন্ত আমরা কেবল খাওয়া, ঘুম, আর বিশ্রাম করে কাটিয়ে দিলাম। ঊষা

চক্রবর্তী এ' কদিন আমাদের খুব আদর যত্ন করল। মুরগী, মাছ, মাংস রান্না করে আমাদের খাওয়াল কারণ আমাদের জিতেনবাবু রান্নার অভ্যাস তাই, তার পরিবারই রাঁধেন, তিনি কেবল খাইতেই জানেন—একথা তিনি প্রথম দিনেই স্পষ্টভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ১৩ই মার্চ রাত্রে ঊষা চক্রবর্তী খুব হন্তদন্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল এবং খবর দিল যে, বীট অফিসের সামনে যে খাড়া পাহাড় আছে সেই পাহাড়ের ওপরে এক আদিবাসীদের ছোট্ট গ্রামে গতকাল একটা মস্তবড় 'গণেশ হাতী' খুব অত্যাচার করে গেছে। ওই 'গণেশ হাতীটাকে' পাগলা হাতী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সরকারী গেজেটে তার সব বর্ণনা দেওয়া আছে। গণেশ হাতী বলে তাদের, যাদের একটা মাত্র দাঁত গজায় এবং ওই একদাঁতওয়ালা হাতীর দাঁতটি খুবই বড় হয়। এরা সাধারণ হাতীর থেকে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে এবং কিম্বদন্তী আছে যে ওরা দেবতার হাতী—কেউ ওদের মারতে পারে না। ঊষা আমাদের বলল, ওই গ্রাম থেকে লোক এসে তার কাছে খবর দিয়ে গেছে যে, সে যদি শিকারীদের নিয়ে গিয়ে ওই হাতী মেরে দিতে পারে তাহলে গ্রামের লোক বেঁচে যায়। আমার চাইতে কিন্তু ভবানীর উৎসাহই খুব বেশি। সে আমাকে বলল—"দাদা, আজ ৩,৪ দিন আমরা খুব বিশ্রাম করেছি এখন আমরা আবার স্বচ্ছন্দে হাতী শিকারে যেতে পারি।" ঊষা চক্রবর্তীকে ভবানী বলে দিল, কাল ভোরেই আমরা হাতী শিকারে রওনা হ'ব।

পরের দিন ভোরে ভবানী জিতেনের সাহায্যে হাতে গড়া কয়েকটা পরোটা করে ফেলল; চায়ের সঙ্গে তাই খেয়ে আমরা ঊষা চক্রবর্তীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। খুব সাবধানে বাঁশের পুল পেরিয়ে আমরা নদীর অপর পারে পৌঁছে ৩।৪ মাইল হাঁটার পর আমরা পাহাড়ে চড়তে লাগলাম। পাহাড়টা খাড়া এবং বেশ কয়েক শ' গজ সোজা উপরে উঠে গেছে। কয়েকদিন

বিশ্রামের পর আবার পাহাড়ে চড়তে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমরা হাপরের মতন হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে নিজেদের নিয়ে পাহাড়ের চূড়োর ওপরে উঠে তারপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কিছুদূর যাবার পর আমরা গ্রামে পৌঁছে একটা মাচাবাড়ীতে উঠলাম। ঊষা চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এইটাই কি গ্রামের মোড়লের বাড়ী? তার উত্তরে সে বলল—হাঁ, এটাই মোড়লের বাড়ী আর ওই বুড়ো লোকটি যে বাঁশের হুঁকো খাচ্ছে সেই এখানকার মোড়ল। আমরা ওখানে শিকার করতে যাওয়াতে মোড়লের তেমন উৎসাহ দেখলাম না। অগত্যা ঊষা চক্রবর্তীকেই জিজ্ঞাসা করলাম—এ গ্রামে আদিবাসীদের মধ্যে কোন শিকারী আছে কি না, যে আমাদের হাতী দেখাতে পারবে এবং গণেশ হাতীর কাছে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে। তারই উৎসাহে কয়েকজন লোক জোগাড় হোল এবং আমরা পাহাড় ভেঙ্গে আবার বেরুলাম হাতীর সন্ধানে। উপস্থিত আদিবাসীদের একজন আমাকে খবর দিল যে হাতীর পাল খুব কাছেই যে ঝরণাটা রয়েছে সেইখানে আছে এবং এইমাত্র সে তাদের আওয়াজ শুনে আসছে। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর অনেক পাহাড় চড়াই ওতরাই করে ও অনেক ঝরণা পার হয়ে আমরা একপাল হাতী দেখলাম বটে, কিন্তু গণেশ হাতীর কোন সন্ধান পেলুম না। বিকেলের দিকে গ্রামে ফিরে এসে মোড়লের সঙ্গে দেখা করলাম। মোড়ল তার বাঁশের হুঁকো থেকে একটু মুখ সরিয়ে, আমাদের দিকে চেয়ে, একটু হেসে বলল—সে অনেক শিকারী দেখেছে কিন্তু ওই গণেশ হাতীটাকে কেউ মারতে পারেনি। ওর ধারণা কেউ তা পারবেও না। কারণ ওটা দেবতার হাতী। ওখানে আর বেশিক্ষণ না থেকে আমরা ছা-মনুর দিকে রওনা হলাম। ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। তারপর স্নান করে খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে বেশ রাত হোল। মাঝ রাত থেকে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হোল। পরের দিন ১৫ই মার্চ, সারাদিন রাত

ঝড় ও জল চলল এক নাগাড়ে। পরের দিন সকাল বেলায় দেখি, বৃষ্টি একটু ধরেছে। আমাদের বীট অপিসের দুপাশ দিয়ে যে পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছিল সেই নদীটা বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন বান ডাকবে—আর ওপরের আকাশ ঘন কাল মেঘে ঢাকা। চা জলখাবার খেতে খেতে আমার মনে হোল, এবার আমাদের এখান থেকে ফেরা দরকার। আকাশের চেহারা দেখে কেন জানি না আমার ধারণা হোল, এই ঝড় জল বেশ কিছুদিন ধরে চলবে এবং তাড়াতাড়ি যদি এখান থেকে না ফিরতে পারি, তাহলে আমরা হয়তো অনির্দিষ্ট কালের জন্য এখানে আটকা পড়ব। ভবানীকে আমার মনের কথা জানাতে সেও সমর্থন করলো। ইতিমধ্যে ঊষা চক্রবর্তী এসে হাজির—গল্প করার জন্য। আমরা তাকে আমাদের মনের কথা বললাম এবং সেও তা সমর্থন করল। অতঃপর সমস্যা হোল, কি করে মনুঘাটে যাওয়া যায়। আসার সময় বনবিভাগীয় অফিসার মিঃ দাস জীপে করে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর আমরা নৌকায় ও হেঁটে, মালপত্র ও নিজেদের নিয়ে ছা-মনুর বীট অফিসে পৌঁছেছিলাম। কিন্তু এবার? ঊষা চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই নদীতে অনেক নৌকা বাঁধা রয়েছে, ওই নৌকাতে চেপে আমরা মনুঘাট পর্যন্ত যেতে পারি কি না? মনুঘাটের ফরেষ্ট বাংলোর পাশেই একটা পাহাড়ী নদী দেখেছিলাম; আমার যেন মনে হোল এই নদীটাই মনুঘাটের 'বাংলোর' পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। ঊষা চক্রবর্তী বলল, আমার ধারণা ঠিকই। এই নদীপথে এখন মনুঘাট যাওয়া খুবই সহজ— স্রোতের টানে নৌকায় আমরা অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে পৌঁছাতে পারবো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনস্থির করে ফেলে আমাদের জিনিসপত্র গোছাতে আরম্ভ করলাম এবং ঊষা চক্রবর্তীকে পাঠালাম একটা নৌকা ভাড়া করার জন্য। তখন আমি, ভবানী ও জিতেন মিলে আমাদের জিনিসপত্রগুলো খুব তাড়াতাড়ি বাঁধাছাঁদা করে

ফেললাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঊষা চক্রবর্তী এসে আমাদের খবর দিল যে, একটা ছোট নৌকা কয়েক বস্তা সরষে নিয়ে মনুঘাটের দিকে যাবে—তাতে করেই আমরা মনুঘাটে যেতে পারব তিরিশ টাকা ভাড়ায়। মাঝিরা খেতে বসেছে—খাওয়া হলেই তারা রওনা দেবে। অতএব আমরা তাড়াতাড়ি যেন আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে ঘাটে গিয়ে নৌকায় চড়ে বসি। আমরা আর কাল বিলম্ব না করে তাই করে ফেললুম। আমাদের কপালগুণে সেদিন সারাদিন মেঘ করে রইল এবং ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়ায়, খোলা নৌকাতে চেপে, স্রোতে ভেসে, সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটা চারটার মধ্যে আমরা মনুঘাটে এসে পৌঁছালাম। নিজেরাই মালপত্র নামিয়ে কোনরকমে বনবিশ্রামাগারে উঠলাম এবং বনবিভাগীয় 'অফিসার মিঃ দাস ও রেঞ্জারদের খবর পাঠালাম। তাঁরা আসতে ঊষা চক্রবর্তীর কাছ থেকে পাওয়া পাগলা হাতী মারার যাবতীয় বিবরণ ও চিহ্নগুলি দেখালাম। তাঁরা তাঁদের নিয়ম অনুযায়ী হাতীর পা চারটির মাপজোক করলেন এবং দাঁতদুটির ওজনও মেপে নিয়ে বললেন যে হাতীটার বয়স অল্প। জানলুম গড়পড়তা এদের আয়ু প্রায় ৭০।৮০ বছর। হাতীটার উচ্চতা ছিল প্রায় ৯ ফুট। ওঁরা আমায় জিজ্ঞেস করলেন,—আমরা হাতীটার শরীরে কোন পুরোন জখমের দাগ বা জখম দেখতে পেয়েছিলাম কি না! আমরা হাতীর ডানদিকের পায়ের কিছু ওপরে একটা ১২ বোরের বন্দুকের গুলির সীসে খুঁজে পেয়েছিলাম; সেটা আমাদের সঙ্গেই ছিল—তাঁদের দেখালাম ও বুঝিয়ে বললাম যে, গুলির আঘাতটা সম্পূর্ণভাবে সেরে গিয়েছিল কিন্তু গুলিটা চামড়ার তলাতেই ছিল। সে রাত্রে ওদের সাথে অনেক আলাপ আলোচনা হোল এবং এও জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁরা আর কোনও পাগলা হাতীর খোঁজ খবর পেয়েছেন কি না? তখন মিঃ দাস অতি উৎসাহে আমাদের বললেন, ওখান থেকে ৪০।৫০ মাইল দূরে, শিলচরের দিকে এগিয়ে গেলে 'মাছমারী'

বলে একটা আদিবাসীদের গ্রাম আছে, সেখানে একটা খুব বড় 'গণেশহাতী' ভীষণ অত্যাচার করছে। আমরা যদি ইচ্ছে করি পরের দিন তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারেন, কারণ পরের দিন তিনি জরুরী সরকারী কাজে সেখানে যাচ্ছেন। ভবানীর খুব ইচ্ছে আমরা ওখানে যাই। আমিও শেষ পর্যন্ত রাজী হতে বাধ্য হলুম। পরের দিন ১৭ই মার্চ সকাল-বেলা চা ও জলখাবার খেয়ে আমরা মিঃ দাসের জীপে চড়ে, তাঁর সাথে রওনা হলাম 'মাছমারী' অভিমুখে। সারা রাস্তায় বেশ ঝড় বৃষ্টি পেলাম। পথে মিঃ দাস তাঁর সরকারী কাজের ব্যাপারে বেশ কয়েক জায়গায় নেমে অনেক সময় লাগালেন। আমরা মাছমারীতে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সেখানকার রেঞ্জার ও বনবিভাগের অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে 'গণেশহাতীর' নানানরকম খবর সংগ্রহ করে পরের দিন আমরা 'গণেশহাতীর' সন্ধানে বনে জঙ্গলে এবং পাহাড়ে হেঁটে ঘুরলাম সারাদিন কিন্তু 'গণেশহাতীর' দর্শনই পেলুম না। প্রত্যেক আদিবাসী আমাদের বলল—"আপনারা শিকারী হিসাবে এখানে আসাতে, গণেশহাতী হাওয়ায় আপনাদের আসার খবর পেয়ে এ এলাকা ছেড়ে অনেকদূরে চলে গেছে। কি করে জানি না, যখনই কোন শিকারী আসে সে খবর যেন সে হাওয়ায় পেয়ে থাকে।" আমাদের কপালগুণে মিঃ দাসের সরকারী কাজ তখনও শেষ না হওয়ায় তাঁকে সেখানে থাকতে হয় এবং তাতে আমাদের ফিরে যাবার সুবিধে হল। আমি তখন আকাশের পরিস্থিতি ও গণেশ হাতীর উধাও হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সব কিছু ভেবে চিন্তে মিঃ দাসের জীপেতেই ফিরে যাওয়া মনস্থ করলাম। ফেরার পথেও সারাক্ষণ ঝড় ও জলের বিরাম ছিল না। সে রাত্রেও সারারাত মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় চলতে লাগল। ১৯ তারিখ সকালে মন্থুঘাট বন বিশ্রামাগারে বসে আমি ঠিক করে ফেললাম আমরা ওখানেই হাতী শিকার পর্ব শেষ করে নিজেদের

জায়গায় ফিরে যাব। মিঃ দাস আমাদের খুব আদরযত্ন করলেন এবং সে রাত্রে আমাদের খেতে বললেন। রাত্রে খাবার সময় আমি তাঁকে বললাম যে, আমরা কালই আগরতলা ফিরে যেতে চাই—ফেরার যানবাহন ব্যাপারে তিনি কোন সাহায্য করতে পারেন কি না? তিনি বললেন—"আগামীকাল তাঁকে এক বিশেষ কাজে তেলমুচা যেতে হবে,—তেলমুচা থেকে আগরতলা মাত্র ৩০।৩৫ মাইল দূরে। আমরা ইচ্ছে করলে তেলমুচা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যেতে পারি।" আমরা তাই শুনে খুবই খুসী হয়ে তাঁকে বললাম যে তেলমুচায় পৌঁছে গেলে আমরা সেখান থেকে নিজেরাই কোন ব্যবস্থা করে আগরতলা পৌঁছতে পারবো।

পরের দিন ২০শে মার্চ ভোর থেকেই ভীষণ ঝড়, জল ও বজ্রপাত হতে লাগল। আমরা সকাল দশটা নাগাদ খাওয়া দাওয়া সেরে মালপত্র নিয়ে মিঃ দাসের জীপে রওয়ানা হয়ে সারারাস্তা বৃষ্টিতে ভিজে ঢোল হয়ে বেলা আড়াইটা নাগাদ 'তেলমুচায়' এসে পৌঁছলাম। পৌঁছেই এক লরীওয়ালাকে পাওয়া গেল—তার খালি লরী আগর-তলা ফিরে যাচ্ছে। তাইতেই আমরা আমাদের মালপত্র ও জিতেনকে তুলে নিলাম আর আমরা বসলাম ড্রাইভারের পাশে। মিঃ দাসকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা রওনা হলাম এবং আগরতলা বাজারে পৌঁছে গেলাম প্রায় চারটে নাগাদ। লরীওয়ালা 'সার্কিট হাউস' পর্যন্ত আমাদের নিয়ে যেতে রাজী হোল না। অগত্যা আমরা কয়েকটা সাইকেল রিকসা ভাড়া করে 'সার্কিট হাউসে' গিয়ে পৌঁছলাম। এই ২০ দিন পরে শহরের আবহাওয়া, ইলেকট্রিক আলো, কলের জল ইত্যাদি দেখে আবার নিজেদের সভ্য জগতের মানুষ বলে মনে হতে লাগল। আমরা 'সার্কিট হাউসে' মালপত্র গুছিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্রাম করলাম।

পরের দিন সকালে আমরা বনবিভাগের অফিসে গেলাম ভট্টাচার্য্য সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য। তিনি আমাদের সফলতার খবর

শুনে খুবই খুশী হলেন। তাঁর কাছে আমরা ছামন্থু ও মন্থুঘাটের অফিসারদের কাছ থেকে পাওয়া হাতীমারার নানা কাগজপত্রের সঙ্গে হাতীর দাঁত দুটি ও পা চারটি পেশ করলাম। তিনি আমাদের বললেন যে ওই পাগলা হাতীটি মারার জন্যে ২০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, আমরা সেই পুরস্কার নিতে ইচ্ছুক না হাতীর দাঁত দুটি? তাঁকে সবিনয়ে বললাম—কোন পুরস্কারের লোভে জীবনে কখনও শিকার করিনি; শুধু স্মৃতিরক্ষার্থে কিছু না কিছু নিদর্শন শিকার শেষে নিয়ে এসেছি, যেমন এ যাত্রায় হাতীর দাঁত দুটি ও পা চারটিই শুধু আমাদের কাম্য—এর জন্য আপনার অনুমোদন পেলে কৃতার্থ বোধ করব। এ কথা শুনে তিনি খুব খুসী হ'লেন দেখলাম এবং নিদর্শনগুলি নিয়ে যাবার জন্য 'ট্রানজিট পারমিট' ইত্যাদি কমিশনার সাহেবের দপ্তর থেকে করিয়ে দিলেন। তখন তিনি কথাচ্ছলে আমাদের বললেন যে, কেন তিনি বারবার আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন শিকারে যাবার সময় —ওই নির্দিষ্ট পাগলা হাতীটি ছাড়া অন্য কোন হাতী না মারার জন্য। কারণ তার আগের বছর কোলকাতা পুলিশের একজন পদস্থ অফিসার ও তার বন্ধু তিনটি নিরীহ মাদীহাতীকে বিনা অনুমতিতে মারেন এবং বনবিভাগের লোক তাদের অকুস্থলে ধরে ফেলে চালান করে দেয়। তা নিয়ে অনেক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত অনেক ধরাধরির পর কমিশনার সাহেব তাদের ছেড়ে দেন। যদিও ভট্টাচার্য্য মশায় জানতেন যে, লাহিড়ী সাহেবের বন্ধু হিসেবে কোন রকম বেআইনি কাজ আমরা নিশ্চয়ই করবে না, তবুও শিকারের শুরুতে সাবধানবাণী জানান তিনি কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন এবং তা আমরা যথারীতি মেনে এসেছি বলে তিনিই আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জানালেন।

অতঃপর ফেরার পালা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তার সহকর্মীদের অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিনই বিকেলের প্লেনে আমরা রওনা

হ'লাম কোলকাতা। এই শিকার অভিযানে সাফল্যের জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগের সর্বোচ্চপদস্থ অফিসার শ্রীকনক লাহিড়ী মহাশয় ও ত্রিপুরার শ্রীএন. সি. ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে। আর কৃতজ্ঞ—আমার শুভানুধ্যায়ী শিকারী বন্ধুদের কাছে, যারা নানা ভাবে আমার অভিযান সাফল্যে সহায়তা করেছেন। এই শিকার অভিযান বর্ণনার শেষে আমার একটি মাত্র বক্তব্য যে, কোন রকম বিশেষ শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে এটা লেখা হয়নি। কল্পনার কিছুমাত্র আশ্রয় না নিয়ে শুধুমাত্র বাস্তব ঘটনাকে সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছি—পড়ে তাঁরা যদি আনন্দ লাভ করেন তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হ'বে।

রাজস্থানে বাঘ শিকার

দিল্লী

উ

মথুরা

ভরতপুর

আগ্রা

জয়পুর

বনাস নং

খান্ডার

বাগোরা

চম্বল নং

গোয়ালিয়র

সোয়াই মাধোপুর

সেওপুর

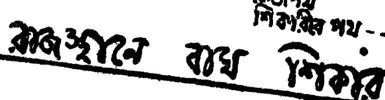
শিবপুরী

কোটা

রেল পথ

রাজপথ

শিকারীর পথ



রাজস্থানে বাঘ শিকার

রাজস্থানে বাঘ শিকার

বাগোরা—রাজস্থান

শিকার আমার পেশা নয় কিন্তু একটা সুস্থ নেশা হিসাবে ধরা যেতে পারে। জঙ্গলে শিকারের সন্ধানে যাওয়া, সেখানকার প্রকৃতির অপূর্ব শোভা দেখা, সেখানকার লোকজন ও তাদের আচার ব্যবহার জানা এইসবের মাধ্যমে নানা দেশ দেখা আমার একটি মনোজ্ঞ নেশাতে দাঁড়িয়েছিল। এ নেশায় মেতে প্রতি বছরই শিকারের নাম নিয়ে মাস খানেকের মত জঙ্গলে ঘুরে আসার জন্য ব্যস্ত হতাম; যদি কোনকারণে বছরে একমাস কি অন্ততঃ তিন সপ্তাহ জঙ্গলে না কাটাতে পারতাম, তাহলে আমার মন-মেজাজের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যেত। এই ভাবেই প্রতিবছর শিকারে যাই; কখনও কিছু শিকার পাই; বেশীর ভাগ সময় খালি হাতেই ফিরে আসি। আমার বন্ধুবান্ধবেরা অনেকেই আমায় ঠাট্টা করে বলেন—"তুমি প্রতিবছর শিকারে গিয়ে যে টাকা বাঘের পেছনে খরচ কর এবং খালি হাতে ফেরৎ আস তার চাইতে তুমি যদি কোলকাতায় চিড়িয়াখানায় গিয়ে খাঁচার বাইরে থেকে একটা বাঘকে গুলি করে মেরে ফাইন দিয়ে আস, তাহলেও তোমার অনেক সস্তা পড়বে।" অবশ্য তাঁরা এই কথা বলতে পারেন কারণ বিশ বছর অনেক কষ্ট করে অনেক জঙ্গলে ঘুরে, মোষ, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি বাঘকে লোভ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রথম বাঘ আমি মারি, ১৯৫৪ সালের ৫ই মার্চ,—রাজস্থানের বাগোরা বলে একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গাতে, চম্বল নদীর ধারে বেহড়ের মধ্যে। অভিশপ্ত চম্বলের বেহড়ের কথা আপনাদের সকলের জানার কথা।

আপনারা প্রথমেই মনে করতে পারেন, এত জায়গা থাকতে আমাকে সুদূর রাজস্থানে বাঘ মারতে যেতে হল কেন? আগেই বলেছি, আমার প্রায় ২০ বছর লেগেছিল প্রথম বাঘ শিকার করতে। আমি ভারতের নানা বনে জঙ্গলে বাঘের পেছনে ঘুরেছি প্রতিবছর। অন্ততঃ একমাস ছুটি নিয়ে, অনেক আবেদন নিবেদন কাঠখড় পুড়িয়ে শিকারের পারমিট জোগাড় করে, বহু শিকারের 'ব্লকে' গিয়েছি; প্রচুর কষ্ট করেছি, না খাওয়া না শোওয়া, মাইলের পর মাইল হাঁটা, মাচানে রাতের পর রাত বসে থেকে মশার কামড় খাওয়া ও আনুসঙ্গিক অর্থব্যয় করার পরেও বাঘের কোন হদিশই পাইনি। আমার মনের অবস্থা তখন খুবই খারাপ; তার ওপর বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্টা ত লেগেই আছে। এই ভাবেই ঘুরতে লাগল বছরের পর বছর। কাগজে শিকারের ছবি ও ঘটনাবলী জেনে এবং আমার জানাশুনা শিকারী বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে যখন দেখতাম তাদের শিকার করা বাঘ ও তার ছবি, তখন মন আমার আরও খারাপ হয়ে যেত। মনে মনে ভাবতাম, কবে আমার কপাল খুলবে, কবে ওদের মতন আমি একটা বাঘ মারতে পারবো। আমার বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমি অনেকবার এই আক্ষেপের কথা বলেছি এবং যথারীতি নানা উপদেশও এসেছে। একদিন এক সন্ধ্যায় বার্ণপুরে আমার এক বন্ধু ডাঃ এ. কে. বিশ্বাসের বাড়ীতে এক মজলিসে এইসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ডাঃ বিশ্বাস এখানকার ধাতুতত্ত্ববিদ—মাত্র কয়েক বছর হল এখানে এসেছেন। ভদ্রলোক অতি সজ্জন। তাঁর একটি বিশেষ গুণের জন্য অনেকেই তাঁর বাড়ী আসতেন—যেটি হল তাঁর সুনিপুণ কোষ্ঠি বিচার করার ক্ষমতা। আমার নিজের এবিষয়ে খুব একটা ঝোঁক ছিল না। আমি যখনই তাঁর বাড়ীতে যাই তখনই দেখি আমার পরিচিত কয়েকজন ভদ্রলোক কোষ্ঠিবিচার করাচ্ছেন। ফলাফল জানার পর তাঁরা কিছু গল্প করে চলে যেতেন। •হঠাৎ কেন জানি না

একদিন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—আপনি তো সব্বাইকে ভবিষ্যৎ বাণী শোনাচ্ছেন, আর আপনার সঙ্গে আমার এতদিনের বন্ধুত্ব কিন্তু আমাকে তো কিছু বলছেন না। আমার কথা শুনে তিনি একটু হেসে বললেন, 'বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি ?' আমি বললুম, আমার কোষ্ঠি নেই, আমার হাত দেখে বলুন দেখি—আমি কবে একটা বড় বাঘ মারতে পারবো ? আমার কথা শুনে তিনি খুব খানিক হেসে উঠলেন এবং বললেন--"বাঘের কথা হাতে লেখা থাকে না, আর আমি হাত দেখি না। যাই হোক বলছেন যখন হাতটা দেখি।" আমি হাত বাড়ালাম—তিনি কী খানিক দেখে আমাকে বললেন---"আপনি যদি রাজস্থানে বাঘশিকার করতে চান আমি তাহলে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সেখানে আমার এক দাদা আছেন, তাঁর নামও ডাঃ এ. কে. বিশ্বাস—তিনি 'খাণ্ডার' বলে রাজস্থানের এক ছোট জায়গার হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। উপস্থিত যদিও তিনি সেখানে নেই, তিনি বদলী হয়ে গেছেন 'কোটা' হাসপাতালে কিন্তু তিনি খাণ্ডার অঞ্চলে বাঘ শিকারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আমি জার্মানি থেকে ফিরে খাণ্ডারে দাদার কাছে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে প্রতিদিন রাত্রে বাঘের ডাক শুনেছি এবং বহুদিন খুব কাছে বাঘের ভীষণ হুঙ্কার গর্জনও শুনেছি। হাসপাতাল থেকে কিছুদূরে রাস্তার ধারে একটা পুকুর ছিল, সকালে সেখানে গিয়ে দেখতাম পুকুর পাড়ে হয় একটা বড় উট বা একটা বড় মোষ আধ খাওয়া অবস্থায় পড়ে আছে। ওখানে ভীষণ বাঘ—বাঘের ভয়ে সন্ধ্যার পর কেউ বড় একটা বার হয় না। যদিও এসব অনেক বছর আগেকার কথা, তবুও আমার মনে হয় সেখানে এখনও প্রচুর বাঘ আছে। আপনি যদি যেতে রাজী হন, তাহলে দাদাকে লিখে সব খবর কিছুদিনের মধ্যেই আপনাকে আনিয়ে দিতে পারি।" আমি তাঁর কথা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠে বললাম, আপনি আজই দাদাকে চিঠি লিখে দিন, উনি যদি আমায় সাহায্য করেন তাহলে

আমি যাবই যাব।

কথামত কাজ হল। ডাক্তার সাহেব কোটা থেকে উত্তরে লিখেছেন যে, তিনি কোটার চীফ কন্‌সারভেটার-অব-ফরেস্টস্‌ এর সাথে দেখা করেছেন এবং শিকারের সব ব্যবস্থা করবার জন্য 'টঙ্ক'এর বিভাগীয় ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করেছেন। এঁদের দুজনকেই ডাক্তার সাহেব খুব ভাল করে চেনেন। শিকারের পারমিট ব্যাপারে যা কিছু করার তিনিই করতে পারবেন বলে ভরসা দিয়েছেন। এইভাবে চিঠির মাধ্যমে কিছু খবরাখবর আদান প্রদানের পর,—অবশেষে পারমিট ফি ইত্যাদি পাঠিয়ে বাগোরায় শিকারের পারমিট পেলাম। রাজস্থানে মাসের প্রথমার্ধের জন্য শিকারের পারমিট দেওয়া হয় অর্থাৎ প্রথম ১৫ দিন শিকার করা চলবে এবং বাকী ১৫ দিন 'অবসর সময়,' তখন শিকার করা চলবে না। পারমিট ফি ৫০ টাকা এবং বাঘ মারতে পারলে 'রয়েলটি' দিতে হয় ৭৫ টাকা —এই ওখানকার নিয়ম। আমার পারমিট ১লা মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ —কেবলমাত্র মাংসভূক প্রাণীদের শিকার করার জন্য। মাংসভূক প্রাণী অর্থে, কেবল বাঘ মারাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য—"যেন তেন প্রকারেণ।"

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি, আমি আসানসোল থেকে "ভেস্টিবিউল এক্সপ্রেসে" চেপে বসলাম বেলা দুটো নাগাদ। আসানসোল স্টেশনে আমার ২।১টি শিকারী বন্ধু আমায় গাড়ীতে চাপিয়ে দিতে এসেছিলেন, তার মধ্যে আমার এক বিশেষ বন্ধু ভবানী গাঙ্গুলীও ছিলেন। তিনি পরে আমার অনেক শিকার অভিযানে সাথী হয়ে ছিলেন। দিল্লীতে পৌঁছে আমি আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠে সেখানে জিনিসপত্র রেখে স্নান আহার সেরে দিল্লীর সেণ্ট্রাল বুকিং অপিসে গেলাম রাজস্থানের কোটা জংশনের একটা টিকিট কেনার এবং বার্থ রিজার্ভেসানের জন্য। সব ব্যবস্থা করে বাড়ী ফিরে, চা খেয়ে আবার বের হলাম

আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করতে, পরে বাড়ী ফিরে রাত্রের খাওয়া সেরে রওনা হলাম স্টেশনের দিকে। গাড়ী রাত সাড়ে এগারটায় দিল্লী থেকে ছাড়বে এবং ভোর সাড়ে ছ'টা—সাতটায় কোটা গিয়ে পৌঁছাবে। আমার বার্থ রিজার্ভ করা ছিল। দিল্লী স্টেশনে আমাকে তুলে দেবার জন্য আমার ছোট মামা ও মাসি এসেছিলেন কষ্ট করে। গাড়ী ছাড়লে তাঁরা শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন এবং আমিও আমার বার্থে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু ভাল ঘুম হোল না। মনের মধ্যে নানা রকম ভাবনা; কোটার ডাঃ বিশ্বাস কেমন লোক হবেন, রাজস্থানের জঙ্গল কি রকম, কোটা থেকে বাগোরা কতদূর, কি ভাবে যেতে হবে এবং সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে বসার পরও বাঘ পাব কি না ইত্যাদি নানান চিন্তায় কিছু ঘুম ও কিছু জাগা অবস্থায় কাটিয়ে সকাল ৭টায় কোটায় এসে পৌঁছলাম। জিনিসপত্র স্টেশনে নামিয়ে ভাবছি এবার ডাঃ বিশ্বাসের বাড়ী খুঁজে বের করবার পালা। ডাঃ বিশ্বাস কোটাতে নিজে একটি ছোট বাড়ী করেছেন—আপাততঃ সেখানেই ওঠার ব্যবস্থা। স্টেশনে ভীড়ের মাঝে একটি অল্প বয়সের ছোকরা পরিষ্কার বাংলায় আমায় জিজ্ঞেস করল—"আপনি কি ডাঃ বিশ্বাসের বাড়ী যাবেন? আপনার নাম?" আমি সম্মতি জানিয়ে নাম বলতে সে বলল, "আমি এসেছি আপনাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য।" আমরা স্টেশন থেকে বাইরে এসে দুটি টাঙ্গা করে—একটাতে আমার যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে ছেলেটি উঠল এবং অপরটাতে আমি ও আমার বন্দুকের বাক্স নিয়ে বসলাম। আমার বন্দুক তিনটির মাপে আমি এই বিশেষ বাক্সটি ভাল সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরী করে নিয়েছি দূরপাল্লার যাতায়াতের জন্য। তিনটি বন্দুক ও তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে বাক্সটার ওজন যথেষ্ট। এর একটা বিশেষ সুবিধে এই যে, চট্ করে কেউ রেলের কামরা থেকে কোথাও নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এবং নাড়াচাড়ার জন্য অন্ততঃ দুজন লোকের সাহায্য

প্রয়োজন। যাহোক বাক্সটা টাঙ্গাতে চাপাইতেই টাঙ্গাটা একদিকে হেলে গেল; আমি আমার ওজন দিয়ে তার কিছুটা হ্রাস করে চালাতে বললাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা কোটার ভীমগঞ্জ মণ্ডীতে ডাঃ বিশ্বাসের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লাম। ডাঃ বিশ্বাস এগিয়ে এসে আমার সাথে আলাপ করলেন এবং মিসেস বিশ্বাসের সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন। এঁরা স্বামী-স্ত্রী লোক খুবই ভাল। এঁদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে—ছেলেমেয়ে ছুটির স্বভাবও খুব মিষ্টি। যে ক'দিন আমি এঁদের এখানে ছিলাম সে ক'দিন আমি একবারও বুঝতে পারিনি যে আমি কোন নূতন জায়গায় রয়েছি। বিদেশে বাঙালীরা যে কত সজ্জন তা না দেখলে বোঝা যায় না। বিকেলের দিকে ডাঃ বিশ্বাস আমাকে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী নিয়ে গেলেন—প্রফেসর জে. সি. ব্যানার্জি, তিনি কোটার গভর্ণমেণ্ট কলেজের ইংরাজীর প্রফেসর। এঁর সাথে আলাপ করে বেশ ভাল লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁদের বাড়ীতে গল্প হল; ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন চায়ের টেবিলে ডাঃ বিশ্বাসের সাথে আমার বাগোরা যাবার বিষয় নিয়ে কিছু কথাবার্তা হোল। ডাক্তার সাহেব তার চিঠিতে শেষের দিকে আমাকে লিখেছিলেন যে, সব ব্যবস্থার ভার তাঁর। আমি খালি বন্দুক আর গুলি নিয়ে তাঁর কাছে কোটাতে এসে পৌঁছলেই তিনি যা যা ব্যবস্থা করার সব করবেন। সেই কথার সুর টেনে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে সব ব্যবস্থার কি করেছেন? যথা—আমাদের রেশন, রাঁধার বাসন আর জনতা স্টোভ, কেরোসিন তেল ইত্যাদি। এ শুনে তিনি একটু ভেবে বললেন, "রান্নার বাসনপত্র আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে নেব—কি কি চাই তার একটা ফর্দ আমাকে দিন। চা, বিস্কুট, কফি, জনতা স্টোভ, কেরোসিন তেল, সাবান, মোমবাতি, দেশলাই এ সব এখান থেকেই কিনতে হবে। আর বাকী চাল, ডাল, আটা, ঘি, তেল ইত্যাদি আপনি সব খাওয়ারেই



বাগোরায় বাঘ শিকার

লংথরাইয়ের আদিবাসীগণ হাতীর মাংস কাটায় ব্যস্ত

পাবেন। তিনি আরও বললেন যে তিনিও আমার সংগে শিকারে যাবেন বলে ১লা মার্চ থেকে ৭ দিনের ছুটি নিয়েছেন। এই খবরটিতে আমি খুবই খুসী হ'লাম কারণ সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় একজন পরিচিত লোক সংগে থাকা ভাল—কিন্তু উচ্ছ্বাস চেপে রেখে তাঁকে বললাম,—আপনি আমার সংগে এই কষ্ট করবেন? তিনি বললেন, প্রথম জীবনে মিলিটারীতে ঢুকে, লড়াইয়ের সময় কাজ করেছেন নানান অপ্রতিকূল অবস্থায়—ফলে কষ্ট সহ্য করা প্রায় অভ্যেসেই দাঁড়িয়ে গেছে; তার ওপরে এই ধরণের শিকার অভিযানে সহযাত্রী হবার আকর্ষণই আলাদা। কোটা ছাড়ার আগে বাকী ৪।৫ দিন যা হাতে ছিল, সে সময়ে ডাক্তার সাহেব আমাকে অনেক জায়গা ঘুরিয়ে দেখালেন এবং অনেকের সাথে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন।

২৯শে ফেব্রুয়ারী আমরা কোটা থেকে দিল্লীর দিকে সোয়াই-মাধোপুর বলে একটা জায়গায় ট্রেনে এলাম; সোয়াই-মাধোপুর থেকে ৭০।৭৫ মাইল এগিয়ে কোটা। আমি দিল্লী থেকে যাবার সময় সোয়াই-মাধোপুর পেরিয়ে গিয়েছিলাম কোটাতে। যা হোক বিকেল ৪টা নাগাদ সোয়াই-মাধোপুরে এসে পৌঁছলাম। আমাদের জিনিস-পত্র স্টেশনের বিশ্রামাগারে রেখে ডাক্তার সাহেব আমাকে নিয়ে ওখানকার কয়েকজন গভর্নমেণ্ট অফিসার, যথা জেলাশাসক, সহকারী জেলাশাসক, বিভাগীয় ফরেস্ট অফিসার এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এঁদের সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন ও পরে কয়েকজন রাজস্থানী ব্যবসাদারের সাথেও আলাপ করিয়ে দিলেন। ডাক্তার সাহেব সন্ধানে ছিলেন ওই ব্যবসাদারদের কাছ থেকে একটা জীপ গাড়ী পাওয়া যায় কি না। আমার নিজের কিন্তু পরের জীপ নেবার তেমন ইচ্ছে ছিল না। যাই হোক স্বস্তি পেলাম যখন জীপ পাওয়া গেল না—প্রতিটি জীপ অচল দেখলাম। সে রাত্রে আমাদের খাওয়া দাওয়া সেরে স্টেশনের বিশ্রামাগারেই রাত কাটাতে হল।

পরের দিন ১লা মার্চ্চ সকাল নয়টার সময় আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে

গেলাম। ওই সময় সোয়াই-মাধোপুর থেকে খাণ্ডার অভিমুখে একটা বাস ছাড়ে, সেটাই আবার দুপুর দুটো-তিনটের মধ্যে খাণ্ডার থেকে সোয়াই-মাধোপুর ফিরে আসে। মালপত্র নিয়ে বাসের কাছে গেলে ডাক্তার সাহেবকে দেখতে পেয়ে অনেকে একসঙ্গে বলতে লাগল—'আরে হাম লোগনকা ডাকদার সাব আগিয়া'। সকলেই বলে উঠল, এতদিন পর হঠাৎ আপনার দর্শন পাব ভাবতেই পারিনি। যা হোক কেমন আছেন? কি ব্যাপার, এখানে? ডাক্তার সাহেব সবার সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, "ইনি আমার একবন্ধু, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন বাঘ শিকার করার জন্য-- ইনি একজন খুব বড় শিকারী।" আমি খুব লজ্জা বোধ করলাম আমাকে বড় শিকারী বলার জন্য। আমি চুপিচুপি ডাক্তার সাহেবকে বললাম, এটা কি বলছেন, আমি মোটেই বড় শিকারী নই, আমি আজ পর্যন্ত একটা বাঘও মারতে পারিনি। ডাক্তার সাহেব বললেন, "তাতে কি হয়েছে—এবার বাঘ নিয়েই ফিরবেন—তাছাড়া শিকার আপনি ত অনেকদিন ধরেই করছেন, না হয় একটা বাঘই পাননি। এবার আপনি নিশ্চয়ই বাঘ নিয়ে ফিরবেন।" আমি তাঁর কথা শুনে বললাম—ভগবান যেন আপনার কথা রাখেন এবং আমার দিকে মুখ তুলে চান। তবে ডাক্তার সাহেব আপনি জেনে রাখুন, যদি ভগবান দয়া করে আমার সঙ্গে বাঘের কোনরকমে ভেট মোলাকাত করিয়ে দেন তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, আমি এক গুলিতে বাঘকে ধরাশায়ী করতে পারব।

আমার সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে, এতদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েও বাঘের সঙ্গে আমার ভেট-মোলাকাতই হোল না। বহুদিন ধরে শিকারে গিয়ে গিয়ে আমার নিজের ওপর একটা আস্থা জন্মেছে, স্নায়ুগুলোও আমার দৃঢ় হয়ে উঠেছে, ভয় কাকে বলে প্রায় ভুলতে বসেছি। হাতে বন্দুক থাকলে আমি যে কোনরকম বিপদের সামনে যেতে ভয় পাই না। আমার শিকারী জীবনে আমি প্রচুর দুঃসাহসিকতার কাজ করেছি। অনেক সময় অবশ্য বাড়ী ফিরে যখন ভাবতে বসেছি, শীর

ও স্থির মস্তিস্কে, তখন মনে হয়েছে, এটা আমার করা উচিত হয়নি কিন্তু আমি দেখেছি আমার হাতে বন্দুক থাকলে আমার উচিত অনুচিতের কথা খুব কমই মনে থাকে, এটা অবশ্য মোটেই ভাল গুণের পরিচয় নয়, অন্ততঃ ভাল শিকারীদের পক্ষে। শিকারীদের সবসময় খুব ধীর স্থির হওয়া দরকার। বন্ধুরা বলে থাকে—আমি এমনিতে খুব ধীর ও স্থির কিন্তু আমার সবচেয়ে দোষ হোল আমি অনেক সময় বিপদকে ভয় না পেয়ে তার মধ্যে এগিয়ে যাই, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি বিশেষ ভাবি না। যাই হোক, এই ভাবে বছরের পর বছর আমি জঙ্গলে ঘুরে ও নানা বিপদের সম্মুখীন হয়ে, নিজের স্নায়ুগুলোকে বেশ শক্ত করে ফেলেছিলাম, নিজের ওপর বেশ একটা আস্থাও জন্মেছে। কেন জানিনা বেশ কিছুদিন থেকে আমার মনে হয়েছিল, আমি যদি কখনও বাঘকে সামনে পাই, তাহলে তাকে আমি এক গুলিতে মারতে পারবো। কখনও মনে হোত, এত চেষ্টা করে এত জঙ্গল ঘুরে বাঘের দেখা পাচ্ছি না,—যদি দেখা পাই তাহলে হয় আমি তাকে মারি নয় সে আমাকে মারুক, এইভাবে বহু বছর খালি-হাতে ফিরে গিয়ে আমার মুখ আর বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতে পারছি না। আমার বাড়ীর শোবার ঘরের চার দেওয়ালে ই. পি. গী'র তোলা জঙ্গলে বাঘের স্বাভাবিক চলাফেরার ছবি টাঙ্গান আছে—প্রমাণ মাপের। ই. পি. গী এই বিশেষ ধরণের ছবি তোলার জন্য আমাদের দেশে খ্যাত। আপনারা অনেকেই তার তোলা ছবি দেখে থাকবেন। আমার এই ছবিগুলো খুব ভাল লাগে এবং এই ছবিগুলো আমার শোবার ঘরে এমন ভাবে টাঙ্গিয়েছি যে, বিছানাতে শুলেই অন্ততঃ তিন দেওয়ালের ছবির বাঘ আমার চোখে পড়ে। আপনারা শুনে হাসবেন, আমি বছরের পর বছর এই বাঘগুলোকে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেছি। বহুলোক টাকার স্বপ্ন দেখে, আবার অনেকে মিষ্টিমুখের মেয়েদের স্বপ্ন দেখে—আমি কিন্তু খালি বাঘের স্বপ্ন দেখেছি বছরের পর বছর। অনেক সময় এই সব ছবির বাঘগুলোর দিকে তাকিয়ে ভেবেছি, যদি

ঠিক ওই অবস্থাতে বাঘের দেখা পাই তাহলে বাঘের কোন জায়গাতে আমার গুলিটা বসাব। যাক্ আমার কথা।

অতঃপর আমাদের বাস ছাড়ল সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ। পুরোন ঝরঝরে বাস, তার ওপর লোকজন ও মালপত্র দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ঠাসা। আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে দু'পাশের পাহাড় আর জঙ্গল দেখতে দেখতে চললাম। ১লা মার্চের সকাল হলেও কিন্তু তার মধ্যেই রোদের তাপ সে সময় যথেষ্ট মনে হল। লক্ষ্য করলাম পাহাড়গুলোর গায়ে যে সব জঙ্গলের মতন দেখা যাচ্ছে তার ডাল পাতা যেন সব জ্বলে গেছে—কেউ যেন পেট্রল দিয়ে পাহাড়ের সব গাছপালাগুলোকে পুড়িয়ে দিয়েছে। একটাও সবুজ পাতা আমার চোখে পড়ল না। পথে নানান জায়গায় লোকজন ও মালপত্র নামাতে নামাতে অবশেষে খাণ্ডারে এসে পৌঁছলাম—বেলা তখন দেড়টা হবে। বাসটা খাণ্ডারের বাজারে এসে থামল। সামনে চেয়ে দেখি একটা পাহাড়—ঠিক রাস্তার ওপরেই—যেন রাস্তাটাকে বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অপর পারে যাবার আর পথ নেই। সোয়াই-মাধোপুর থেকে খাণ্ডার আন্দাজ ৩০ মাইলের পথ।

বাস থেকে নেমে সামনের পাহাড়টাকে ভাল করে দেখলাম—পাহাড়টার চূড়োর ওপরে একটা পুরোন আমলের দুর্গ,—দুর্গটা কোন্ আমলের জানবার ইচ্ছে হোল,—কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন সদুত্তর পেলুম না। ডাক্তার সাহেবকে দেখে সেখানকার সব লোকজন ছুটে এল। আগেকার মতন এবারও বলে উঠল—'আরে! হামলোগনকা ডাগদার সাব আ গিয়া।' ওই দুর্গওয়ালা পাহাড়টার নিচে বেশ বড় আকারের একটা গ্রাম গড়ে উঠেছে, তার নাম খাণ্ডার। গ্রামটা কতদিন আগেকার জানা গেল না। সামনেই বাঁহাতি একটা দোতলা পাকা বাড়ী দেখা গেল, সেটা ওখানকার হাসপাতাল,—সেখানে ডাক্তার সাহেব আগে কাজ করতেন। ওই হাসপাতালের পিছনে আছে থানা ও এক তহশীলদারের অফিস। ওই তিনজন

সরকারী কর্মচারী ছাড়া বাকী সব স্থানীয় রাজস্থানী বাসিন্দা। এদের মাঝে ডাক্তার সাহেব যে বিশেষ পরিচিতজন তা লক্ষ্য করলাম। যদিও ডাক্তার সাহেব খাণ্ডার ছেড়ে গেছেন প্রায় ৪।৫ বছর আগে কিন্তু ওখানকার লোকেরা তাঁকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনার মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে, তারা তাঁকে ভোলেনি। তারা সবাই ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ধরল এবং জানতে চাইল এতদিন পর তাঁর ওখানে আসার কারণ কি? ডাক্তার সাহেবকে তখন যথাযথ বোঝাতে হোল। এমন সময় বাসের ড্রাইভার এসে ডাক্তার সাহেবকে বলল—"চলিয়ে ডাকদার সাব, বাস লেকর আপলোগনকা 'সামান' ডাক বাংলো মে পোঁছা দে।" একটু দূরে, রাস্তা থেকে একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আমরা সি. পি. ডব্লউ. ডি-র বাংলোতে পৌঁছে বাস ড্রাইভার, ক্লীনার ও আমরা সবাই ধরাধরি করে মালপত্র নামালাম। বাংলোর চৌকিদারকে ডেকে ডাক্তার সাহেব আমাদের স্নানের জন্য জল দিতে বললেন এবং আমাদের খাবারের জন্যে কিছু ডালরুটি করতে বলা হল। আমরা কোন রকমে স্নান সেরে ডালরুটি খেয়ে একটু আরাম করতে যাব, এমন সময় দেখি দলে দলে খাণ্ডারের লোক ডাক্তার সাহেবের সংগে দেখা করতে আসছে। সকলের সংগে হাত মিলিয়ে, তাঁর এখানে আসার কারণ সকলকে জানাতে হোল আমাকে দেখিয়ে। তিনি বললেন, ইনি আমার এক বন্ধু, বাংলাদেশ থেকে এখানে বাঘ শিকার করতে এসেছেন। ওখানকার কিছু কিছু লোক কোলকাতার নাম শুনেছে দেখলাম। আমার পরিচয় ডাক্তার সাহেবের মুখে 'বহুত ভারী শিকারী' শুনে সকলে চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখতে লাগল। বিকেলের দিকে একজন রেঞ্জার আমাদের সংগে দেখা করতে এল। বোঝা গেল ওখানে বনবিভাগের একটা দপ্তর আছে। রেঞ্জার ভদ্রলোকটির সংগে শিকার নিয়ে আমার নানা কথাবার্তা হল। খানিক পরে তিনি আমাকে ও ডাক্তার সাহেবকে একটা লরীতে করে ৪।৫ মাইল দূরে সোয়াই মাধোপুরের দিকে নিয়ে

গেলেন, বনবিভাগের একটা আবাদ দেখবার জন্য। তখন বিকেল চারটে সাড়ে চারটে হবে। কাঠের দরজা খুলে আমরা ভিতরে গেলাম। বাংলো থেকে বেরুবার সময় রেঞ্জার সাহেব আমাকে একটা বন্দুক নেবার কথা বলেছিলেন—কাঠের দরজা দিয়ে আবাদী এলাকায় ঢুকেই তিনি আমায় বন্দুকে গুলি ভরতে বললেন এবং সেই সংগে সাবধান করে দিলেন যে যদিও ওইখানেও গুলি করা বা জানোয়ার মারা নিষেধ কিন্তু তবুও কিছুটা সতর্ক হওয়া দরকার। কথা না বলে পায়ের আওয়াজ না করে আমরা তাঁর পিছু নিলাম। কয়েক পা যেতেই আমার নজরে পড়ল খানিক দূরে এক জায়গাতে কিছুক্ষণ আগে বাঘে পায়খানা করে গেছে। তখন বুঝলাম রেঞ্জার সাহেব কেন আমাকে বন্দুক আনতে বলেছিলেন। আমরা কিছুদূর খুব সাবধানে যেতেই একটা বাঁকে গিয়ে দেখি, একসঙ্গে ২৫।৩০টা নীলগাই বা নীলা। বিহারে একে "ঘোড়তড়াস" বলে। আমার মতে বিহারীরাই এই জন্তুটির ঠিক নামকরণ করতে পেরেছে, কারণ নীলের ধারে কাছে এদের রঙ নয়—এদের গায়ের রঙ ধূসর—অনেকটা ঘোড়া বা গাধার মতন দেখতে। মাদিগুলো থেকে মর্দাগুলো দেখতে অনেক সুন্দর হয়। মর্দাগুলোর ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা সিং এবং গলার কাছ থেকে ফিতের মতন লম্বা দাড়ি হয়। বয়স অনুপাতে এই দাড়ি বেড়ে প্রায় মাটি পর্যন্ত ঠেকে। আমরা কিছুদূর বাদ বাদ দু' তিন দল নীলগাই দেখলাম এবং সাথে সাথে কয়েক জায়গায় বাঘের পায়ের দাগও দেখলাম। এই আবাদী এলাকা খুব বড় নয়। আমরা একদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে অপর দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম, তারপর লরী করে ডাকবাংলোয় ফিরলাম।

বাংলোয় এসে দেখি অনেক লোক ডাক্তার সাহেবের সংগে দেখা করতে এসেছে। আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম, এদের কাছ থেকে জেনে নিন, বাগোরা এখান থেকে কতদূর এবং আমরা কিভাবে যেতে পারি। আমার কথা শুনে তিনি সকলের সামনে এই প্রশ্ন

করলেন। জানলুম খাণ্ডার থেকে প্রায় ১৮।১৯ মাইল পথ বাগোরা। কিন্তু রাস্তা খুবই খারাপ থাকায় উট, ঘোড়া বা গরুর গাড়ী ছাড়া যাওয়া মুস্কিল। ডাক্তার সাহেব উট চাপতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল গরুর গাড়ী করে যাওয়া হবে। শুনেই উপস্থিত রাজস্থানী লোকেরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠল—'ডাকদার সাব কা খাতির কা বাস্তে মেরা বয়েল গাড়ী হাজির।' তাদের মধ্যে আবার কয়েকজন বলে উঠল—'মেরা বয়েল আউর গাড়ী বহুত মজবুত, আউর মেরা বয়েল বহুত ফরোয়ার্ড চলনেওয়ালা।' এইভাবে দু'টি খুব ফরোয়ার্ড চলনেওয়ালার সংগে আমাদের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। আমি তাদের বুঝিয়ে বলে দিলাম রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে তারা যেন গরুর গাড়ী নিয়ে ডাক বাংলোতে আসে। ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেবের ওখানকার হাসপাতালের পুরোন চাকর "মহারাজ" এসে হাজির। তার সংগে ডাক্তার সাহেবের অনেক কথাবার্তার পর সে বলল—'ডাকদার সাব, আপ যেতনা দিন ইহাঁ শিকার কা বাস্তে রহিয়ে গা, আপকো-খাতির কা বাস্তে হাম হাজির।' ডাক্তার সাহেব এই কথা শুনে তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—"তোমাকে এইখানকার ডাক্তার আমার সংগে যাবার জন্যে ছুটি দেবেন কি?" সে তার উত্তরে বলল—'মেরী নোকরী যায়ে কি রহে, আপকো খাতির কা বাস্তে হাম হাজির।' এর কয়েক মিনিট পরে আরেকজন লোক এ'ল, যার কাজ টীকে দিয়ে বেড়ান—ওখানকার "ভ্যাক্সিনেটার"। সেও ঠিক মহারাজের মতন বলে উঠল, "আপকো খাতির কা বাস্তে হাম হাজির—উসমে নোকরী যায়ে কি রহে।" আমি বুঝলাম আমাদের সঙ্গীর সংখ্যা আরও দুজন বাড়ল। আমি ভ্যাক্সিনেটারকে একটু চালাক চতুর দেখে একটা ফর্দ করে কিছু টাকা দিয়ে বললাম—তুমি ইতিমধ্যে আমাদের শিকারের ক্যাম্পের জন্য এই রেশনগুলো কিনে আন, আমরা ভোর চারটের সময় এখান থেকে রওনা হব। তাকে চাল, আটা, তেল, ঘি, নুন, চিনি ইত্যাদি কত কি লাগবে, সব হিসেব করে বলে দিলাম যেন

সব গুছিয়ে তাড়াতাড়ি কিনে ভালমত বেঁধে আনে, যাতে আমি সেগুলোকে একটা বাক্সে ঠিকমত সাজিয়ে রাখতে পারি ; না হলে রাস্তার ধূলোয় সব নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের ডাকবাংলার সামনে রাস্তা পেরিয়েই দেখলাম একটা পুরোন মন্দির মতন রয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওটা ওখানকার বালাজীর মন্দির। ওখানকার লোকেরা বালাজীর মন্দিরে পূজো না দিয়ে কোন শুভকাজে হাত দেয় না। আমি এই কথা শুনে মনে করলাম আমিও ত একটা শুভ কাজেই বের হচ্ছি, পূজো দিয়েই যাই না কেন। আমার ইচ্ছা ওদের জানিয়ে দিয়ে বললাম, পূজোয় কি কি লাগে আমায় বল—কিনে নিয়ে পূজা দেবো। ওরা বলল পূজোয় কোন জিনিসপত্র লাগে না, বালাজীকে প্রণাম করে আপনার যা ইচ্ছা সেই ক্ষমতা মত টাকা কি পয়সা মন্দিরের অর্ঘ্যপাত্রে রেখে দিন। কারণ ওখানে তিথি অনুযায়ী পূজা হয় এবং সেই সময় পূজারী আসে। সব সময় সব দিন আসে না। ডাক্তার সাহেব এবং আমি দুজনেই মন্দিরে গেলাম এবং পূজো দিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে এলাম। ফিরে এসে দেখি ওখানকার তহশীলদার সাহেব আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অতি বিনয়ের সংগে ডাক্তার সাহেবকে বললেন, 'আমি গ্রামের বাইরে গিয়েছিলাম তাই আপনার সংগে দেখা করতে পারিনি। আমাকে মাপ করবেন।' তিনি আমাদের দুজনকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খুব খাতির যত্ন করলেন এবং জানালেন যে তাঁর বাড়ীতেই আমাদের দু'জনের রাত্রের খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। তারপর তহশীলদার সাহেবের বাড়ীতে আমাদের একটা মজলিসও বসল, চা ও লাড্ডুর সংযোগে। কথায় কথায় বুঝলাম ডাক্তার সাহেব আমাদের শিকারের ব্লক বাগোরা সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানেন না। নানা কথার মধ্যে আলোচনা হল এই ১৮।১৯ মাইল পথ কি করে যেতে হবে, ওখানে গিয়ে থাকার কি ব্যবস্থা ইত্যাদি। এইসব ব্যবস্থাপনার সমস্যায় ডাক্তার সাহেব একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সত্যিই ওখানে থাকার প্রশ্নটা

খুব বড় প্রশ্ন। তহশীলদার সাহেবকে ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—"ওখানে থাকার ব্যাপারে আপনি কোন সাহায্য করতে পারবেন কি? কাল ভোরেই তো আমাদের যাত্রা।" তহশীলদার সাহেবের মুখ দেখে মনে হোল না, তাঁর দ্বারা কিছু করা সম্ভব। হঠাৎ চোস্ত হিন্দিতে তিনি বললেন, দাঁড়ান, আমি আমার চাপরাশি ফকরুদ্দীনকে ডাকি। সে হয়তো কিছু বলতে পারবে, কারণ তার শিকার সম্বন্ধে খুব 'তাজরুফা' আছে। তাকে আমি আপনাদের সংগে পাঠাব, 'আপ লোগন কা খাতির কা বাস্তে।' কিছুক্ষণ পরে ৪০।৫০ বছরের একজন লোক আমাদের সেলাম করে দাঁড়াল—তহশীলদার সাহেব বললেন "এই আমাদের চাপরাশি ফকরুদ্দীন। এখানে যত বড় বড় শিকারী আসে, সকলেই ফকরুদ্দীনকে চায়। শিকারে ও খুব হুঁসিয়ার। ও চায় তো 'খোঁজ' করে শেরকে আপনাদের সামনে হাজির করে দেবে।" ফকরুদ্দীনকে জিজ্ঞেস করা হোল বাগোরায় আমাদের থাকা ব্যাপারে সে কোন হদিশ দিতে পারে কিনা? ফকরুদ্দীন খানিক মাথা চুলকে বলল—'একঠো স্কুল ঘর থা, সায়েদ টুট গিয়া। আচ্ছা ঠরিয়ে, হাম দরিয়াফ করকে বাতাতা' বলে ও চলে গেল। এমন সময় আরেকটি লোক—আমাদের ঘরে ঢুকল, সে ওখানকার হালুইকর। যেখানে বাস্‌টা এসে থামে, সেখানে তার চা লাড্ডু ও সেও-এর একটা দোকান আছে। সে ডাক্তার সাহেবকে অনেক সেলাম করে বলল—"আমার দোকান বন্ধ করতে বলে আপনার কাছে এলুম; এখন বলুন আপনাদের জন্যে কি করতে পারি। শুনলাম ভোরে আপনারা চলে যাবেন; আমি দোকানে বলে এসেছি, আপনাদের রাস্তায় খাবারের জন্যে খুব ভাল করে পুরি তরকারী ও কিছু মিঠাই ঠোঙ্গায় ভাল করে বেঁধে, আজ রাত্রে আপনাদের বাংলোয় পোঁছে দেবার জন্যে। বাগোরা পোঁছতে দিন ডুবে যাবে—রাস্তা বহুত খারাপ।" ডাক্তার সাহেব তাকে বললেন, 'তা তো হোল, এখন বাগোরায় গিয়ে আমরা কোথায়

থাকবো তা তো এখনও পর্যন্ত ঠিক করতে পারলাম না।' হালুইকর সে কথা শুনে বলল 'হাম সব বন্দোবস্ত কর দেতা।' বলেই সে তহশীলদারের বাড়ী থেকে বেরিয়ে তার দোকানে গেল এবং সংগে একটা কাগজের খালি ঠোঙ্গা নিয়ে ফিরে এল। সে সেই ঠোঙ্গাটা ছিঁড়ে একটা পেন্সিল দিয়ে আমাদের সামনে রাজস্থানী ভাষাতে কি খানিকটা লিখল এবং ডাক্তার সাহেবের হাতে দিয়ে বলল,—"এই চিঠি আপনি বাগোরার ঠাকুর সাহেবকে দেবেন। তিনি আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেবেন, আপনাদের কোনই তক্‌লিফ হবে না।" এই ছেঁড়া ঠোঙার কাগজে পেন্সিলের লেখাটুকু যে কত দরকারী তা পরে বুঝেছিলাম। আমরা হালুইকরের দেওয়া সেই পরিচিত পত্র খুব যত্ন করে রাখলাম এবং তহশীলদারের বাড়ীতে সে রাত্রের খাওয়া সেরে ডাকবাংলোয় ফিরে গেলাম। রাত তিনটের সময় উঠে জনতা স্টোভে চা বানিয়ে ডাক্তার সাহেবকে কয়েক কাপ চায়ে খুসী করে নিজেকেও বেশ কয়েক কাপ চায়ে তৃপ্ত করান হল। শুনলাম সকালে উঠে কয়েক কাপ চা না খেলে ওনার প্রাতঃক্রিয়া হয় না। আমাদের জিনিসপত্র গোছানই ছিল—বাইরে বেরিয়ে দেখি মহারাজ আর 'ভেক্সিনেটারে' মিলে হাসপাতাল থেকে একটা মোটা গদী ও একটা চাদর নিয়ে এসেছে এবং যে গাড়ীতে আমি ও ডাক্তার সাহেব চাপব সেটাতে পাতছে। ওখানে গরুর গাড়ীতে ছই ব্যবহারের চল নেই। বুঝলাম আমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। একে মার্চ মাসের দুই তারিখ, তায় রাজস্থানের গরম এবং যা শুনলাম, সারাদিনটাই লাগবে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে। ছই না থাকায় সারাদিনের রোদ আমাদের মাথার ওপর দিয়েই যাবে। যাই হোক, আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের জিনিসপত্র গাড়ীতে তুলে আমি ও ডাক্তার সাহেব তৈরী হয়ে ভোর ৪টের আগেই আমাদের দলবল সমেত রওনা হলাম।

দেখা গেল, আর কিছু হোক না হোক আমাদের দলটাই বেশ

বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা দু'জন তো আছিই, তার ওপর 'মহারাজ' 'ভেক্সিনেটার' ফকরুদ্দীন এবং আরেকটি নতুন মুখ দেখলাম। খবর নিয়ে জানলাম উনি একজন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারীর লোক—উপস্থিত একজন বনবিভাগের পাহারাদার। খাণ্ডারের রেঞ্জার সাহেব এই লোকটিকে আমাদের সংগে পাঠাচ্ছেন, যাতে আমরা বনবিভাগের কোনরকম আইনভঙ্গ না করি। আপাততঃ আমাদের শিকার ক্যাম্পের জন্যে এই সবগুলিই আমার পোষ্য হোল—সবার খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির সমস্ত ভারই আমার। মনকে আশ্বাস দিলাম, বিদেশে লোকবল একটা মস্ত বড় বল। আমরা ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায়, মৃদু আলোতে রওনা হলাম। বালাজীর মন্দিরের কাছাকাছি আসতে আমি বালাজীকে প্রণাম করে প্রার্থনা করলাম, "ঠাকুর বালাজী—আমাকে একটা বড় বাঘ পাইয়ে দাও বাবা, আমি যেন একগুলিতে বাঘ মারতে পারি।" কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা খাণ্ডার গ্রামকে পেছনে ফেলে চলতে লাগলাম। সকালের আলো যখন বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল, তখন দেখলাম, এরই মধ্যে ধুলোতে আমাদের সাদা চাদর আর চেনা যাচ্ছে না। জামা-কাপড়ের ওপরেও প্রচুর ধুলো জমেছে। ডাক্তার সাহেবকে দেখাতে তিনি তাঁর জামাকাপড় একটু ঝাড়লেন। আমি বললাম কোন লাভ নেই—এই তো মোটে যাত্রা সুরু। শুনেছি সারাদিন লাগবে আমাদের পৌঁছতে—তার মানে আমরা যখন আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছব তখন আমরা প্রত্যেকে এক একটি ধুলোর স্তূপ হয়ে যাব, নিজেরাই হয়তো নিজেদের চিনতে পারবো না। এই সবের জন্যেই আমি আপনাকে আমার সংগে আসতে মানা করেছিলাম, এখনও সামনে কত কষ্ট আছে কে জানে। তবে এটা ঠিকই যে, আপনি দয়া করে আমার সংগে না এলে আমি এ অঞ্চলে একবিন্দুও এগুতে পারতাম না। এই যে খাণ্ডারের প্রত্যেকটি লোক আপনাকে দেখেই এগিয়ে এল এবং নানাভাবে সাহায্য ও খাতির করল, সে কেবলমাত্র

আপনারই জন্যে—দেখছি খাণ্ডারের লোকেরা আপনাকে দেবতার মতন খাতির ও শ্রদ্ধা করে। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, একমাত্র বাঙ্গালী আপনার ওপর এদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখে আমি খুবই খুশী হয়েছি। নিশ্চয়ই এরা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে আপনার কাছে পর্যাপ্ত উপকার পেয়েছে, তাই এতদিন পরেও খাতির করতে কসুর করেনি। এসব শুনে ডাক্তার সাহেব বললেন,—"আমি আমার সাধ্যমত এদের যত্ন দিয়ে চিকিৎসা করেছি, বহু কঠিন রোগ ভাল করে দিয়েছি, আর বেশির ভাগই বিনা পয়সায়। এই সব নানান বিষয় আলাপ আলোচনা করতে করতে আমাদের গাড়ী বাগোরার দিকে এগিয়ে চলল। আমাদের দুজনের মাথায় দুটো ফিকে সবুজ রঙের কাপড়ের টুপি ছিল এবং চোখে রঙীন চশমা। ডাক্তার সাহেবের নির্দেশে নাক ও মুখের ওপর রুমাল বাঁধতে হয়েছে ধূলো থেকে বাঁচবার জন্য। চতুর্দিকে জ্বলা আর ধূসর রঙের মাঠ। কোথাও একটা ঘাস বা সবুজপাতা দেখতে পেলাম না। দূরে দেখলাম বড় বড় পাহাড় ও গাছ, কিন্তু সবই একই রকম বিবর্ণ, গাছের ডাল-পালাগুলোকে কে যেন পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। দূরে আরও কয়েকটা পাহাড়ের ওপর পুরোন আমলের দুর্গের মতন দেখতে পেলাম। ডাক্তার সাহেবকে ওই সব দুর্গের নাম ও ইতিহাস জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ওগুলো মোগল ও হিন্দুরাজাদের আমলের দুর্গ। এ ছাড়া বিস্তারিতভাবে তিনি আর কিছুই জানেন না। তিনি বললেন, খাণ্ডারে থাকাকালীন তিনি গ্রাম থেকে এক পা-ও বাইরে কোথাও যাননি। অনেক সময় প্রচুর টাকার লোভ দেখিয়ে তাঁকে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তিনি যাননি ডাকাতের ভয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখনও কি সেই চম্বলের ভয়ঙ্কর ও দুর্ধর্ষ ডাকাতি চলছে? তিনি বললেন—"নিশ্চয়ই, সেই একভাবেই ডাকাতি চলছে। আমাদের সরকার অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু কোন বিশেষ সুবিধা এখনও করে উঠতে পারেনি। তবে

কিছু বড় বড় ডাকাত নিজেরা স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে শুনেছি, যার ফলে আগের তুলনায় উৎপাত হয়তো কমেছে।" এইভাবে গল্প করতে করতে আমরা চলেছি তুটি গাড়ী নিয়ে—প্রথম গাড়ীতে আমাদের মালপত্র এবং তার সঙ্গে হেঁটেই চলেছে আমাদের মহারাজ, 'ভেক্সিনেটার', ফকরুদ্দীন ও বনবিভাগের পাহারাদার। আমাদের গাড়ীতে আমরা তুজনে বসে, ওদের গাড়ীর পিছু পিছু চলেছি ধূলো বাঁচিয়ে। মধ্যে মধ্যে আমাদের গাড়ী বেহড়ের গলি-পথ ধরে উঁচু নিচু ভাবে চলেছে। শুকনো ধূলো এক এক জায়গাতে গরুগুলোর পেটে এসে ঠেকছে। গরুর গাড়ীর "ধূরো"গুলো এক এক সময় ধূলোয় ডুবে যাচ্ছে এবং গরুগুলোর পক্ষে গাড়ী টানা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বেলা বারটা নাগাদ আমরা একটা নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। নদীটা পেরিয়ে জলের ধারে গরুর গাড়ী তুটোকে রেখে গরুগুলোকে খুলে জল খেতে দেওয়া হোল। আমরা সকলে নিজেদের গায়ের ধূলো ঝেড়ে নদীর জলে হাতমুখ ধুলাম। ইতিমধ্যে গাড়োয়ানরা হাত মুখ ধুয়ে, নিজেদের সংগে আনা কিছু খাবার বার করে খেতে লাগল। তাই দেখে ডাক্তার সাহেব বললেন, আমাদের সংগে হালুইকরের দেওয়া পুরি, তরকারী ও মিঠাই আছে— তার কিছু খাবেন নাকি? আমি ওনাকে বললাম, আমার খাবার মোটেই ইচ্ছা নেই, আপনি খান এবং বাকীটা আমাদের চ্যালা চামুণ্ডাদের দিন। ডাক্তার সাহেব একটা ঠোঙ্গা নিজের জন্যে রেখে বাকীটা ওদের দিয়ে দিলেন। উনি আমাকে একটা লাড্ডু খেয়ে জল খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অগত্যা তাঁর অনুরোধ রাখার জন্যে একটা লাড্ডু খেয়ে নদীর জল খেলাম। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ মিঃ এইভাবে খাওয়া ও বিশ্রাম করার পর, আমরা আবার বাগোরার পথে রওনা দিলাম। পথে কখনও এক আধটা রাজস্থানী ছোট বস্তী দেখতে পেলাম এবং দেখলাম ওই বস্তীগুলোর কাছাকাছি কিছু

কিছু সবুজভাব। জানলাম ওগুলো সব ছোলার ক্ষেত। তখন রোদের তাপ খুব বেশী—আমাদের সকলের গলা ও মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। বস্তীগুলোতে জায়গায় জায়গায় খুব বড় বড় ইঁদারা দেখলাম—ইঁদারাগুলোর পাশ দিয়েই আমাদের যাবার রাস্তা। অবাক লাগল—জল দেখবার সংগে সংগেই আমাদের দলবল, মায় গরুগুলো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমি আর ডাক্তার সাহেবও জলের আশাতে গাড়ী থেকে নেমে ইঁদারার কাছে যেতে থাকলাম। সব স্থানেই দেখেছি ইঁদারা জুড়ে থাকতো স্বাস্থ্যবতী সুঠাম চেহারার রাজস্থানী মেয়েরা। তারা ১৫০।২০০ হাত নিচে থেকে জল তুলে তাদের ঘড়া ভর্তি করতে ব্যস্ত। আমাদের টুপি, চশমা, রুমাল ও সর্বাঙ্গে ধুলো দেখে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে রাজস্থানী ভাষায় কথা বলে হাসাহাসি সুরু করে দিল, আমি তাদের ইশারা করে একটু জল দিতে বললাম এবং তারা খুব হাসতে হাসতে ইঁদারার উঁচু পাড় থেকে জলভরা বালতিটাকে, ঘাঘরা দুলিয়ে পাড়ের কাছে এনে, সাবধানে আমাদের জল ঢেলে দিল। দু' একজন আবার ইচ্ছে করে, আমাদের গা ভিজিয়ে খানিক ফেলে প্রাণখোলা হাসি হাসল ; এ যেন সিনেমায় নায়ককে নিয়ে খেলা। যদি গান জানতুম, তাহলে, কী যে হত বলা যায় না। আমার আবার ওই ঠাণ্ডা জল দেখে লোভ লাগল চান করার জন্যে, কিন্তু পথে আর সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, তাই দু' একটা মেয়ে যখন খাবার জল দিতে গিয়ে গায়ে কিছুটা জল ফেলে দিচ্ছিল, তাতেই বেশ আরামবোধ করছিলাম। ঘাম ও লাল মাটির ধুলোর সংগে জল মিশে আমাদের জামাকাপড়ের যে দুরবস্থা হোল তা আর বর্ণনার যোগ্য নয়। আমাদের সকলের চেহারার দুরবস্থা দেখে মেয়েগুলি হেসেই কুটিপাটি, ওদের কলহাস্যে মনে হচ্ছিল যেন প্রমোদমত্ত জলকেলি হচ্ছে—শ্রীরাধা তার গাগরী বা ঘাগরীর লাঞ্ছনায় শ্যামরায়ের নষ্টামির প্রতি কপট কটাক্ষে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পরিবেশ কল্পনায় পুরানো

সুরের রেশ মনে উঁকি দিল—"না ছেড়ো, গালি তুঙ্গী ম্যায়নে ভরণে দে গাগরী।" কিন্তু উঁকি দিলেই বা কি হবে—বিধি বাম। সঙ্গে প্রকৃতিও বাম ; তখন খর রৌদ্রতাপে সর্বশরীর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, জিভ্ শুকিয়ে কাঠ, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে—এই অবস্থায় ত রসচিন্তা চলে না আর কোমল ভাবও উদয় হবার অবকাশ কোথায় ? যা হোক এইভাবে কিছুটা জল খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে আমরা আবার এগিয়ে চললাম। মধ্যে মধ্যে মহারাজ আশপাশের ক্ষেত থেকে কিছু ছোলা সমেত ছোলাগাছ তুলে এনে আমাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তাই চিবিয়ে তার রসে মুখটা একটু ভিজিয়ে রাখছিলাম। মাঝে মাঝে সুবিধামত যেখানেই জল পাচ্ছিলাম, সেখানেই একটু জল খেয়ে নিচ্ছিলাম, কিন্তু তার মেয়াদ বড় জোর মিনিট পনের ; তারপর আবার যে কে সেই—গলা শুকিয়ে কাঠ। পথের তুধারে প্রচুর তিতির ও কিছু কিছু ময়ুরও দেখলাম। যদিও তিতিগুলোর পাশ দিয়েই আমরা যাচ্ছিলাম, তাতে তারা কিন্তু একটুও ভয় পেলো বলে মনে হোল না ; আমাদের এদিককার তিতির কিন্তু দূর থেকে লোক দেখলেই উধাও হয়ে যায়। যাহোক, বিকেল চারটে নাগাদ আমাদের গাড়ীতুটো একটা টিলার ওপর উঠতে থাকল। টিলাটার ওপরে চড়ে ডানহাতি একটি ঝুপড়ি দেখতে পেলাম। আমি লক্ষ্য করলাম ঝুপড়িটার নীচে একটা ছোলার ক্ষেত এবং সেই ক্ষেতে তুটো লোক কিছু কাজ করছে। মালপত্রের সঙ্গে মহারাজ, ফকরুদ্দীন ইত্যাদিকে নিয়ে এক পদাতিক বাহিনী এবং ধুলোর প্রলেপ মাখা অবস্থায় আমাদের দেখে ওই লোকতুটো কাজ ছেড়ে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল এবং ঐ পদাতিক বাহিনীর মধ্যে তাদের দেশের লোক দেখতে পেয়ে, তারা কৌতূহলভরে এগিয়ে এল এবং আমাদের লোকদের সঙ্গে কি যেন কথা বলল। কিছুক্ষণ পরেই দেখি আমাদের গাড়ী থামিয়ে 'মহারাজ' ও 'ভেক্সিনেটার' ক্ষেতের একজন লোককে নিয়ে

আমাদের গাড়ীর দিকে এগিয়ে এসে ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে বলল যে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে তাদের একটা বলদ এই ক্ষেত থেকে বাঘে ধরে নিয়ে ওই বেহড়ে খাচ্ছে। আমাদের গাড়ী থেকে মাত্র শ'পাঁচেক গজ দূরে বেহড় দেখা যাচ্ছে। বেহড় হচ্ছে মাটির এবড়ো খেবড়ো পাহাড়। এর এক একটার উচ্চতা পাঁচ ছয়শ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা যায়। ক্ষেতের লোকটা আমাদের খুব অনুরোধ করে বলল—"সাব আপ ইয়ে শের মার দেনে সে, হাম গরীবোঁ কো জানোয়ার বাঁচ জায়গা। ইয়ে শের বড়া শয়তান হ্যায়। থোড়া রোজ আগাড়ী ইয়ে বয়েল কো জোড়ী ভী মার ডালা হ্যায়। আব মেরা পাশ ক্ষেতী করনেকা বাস্তে বয়েল নেহী।" আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি ঠিক জান, বাঘ কোথায় তোমার বলদটাকে নিয়ে খাচ্ছে? তুমি আমাকে সে জায়গা দেখাতে পারবে?' সে উত্তরে বলল—'জী হাঁ, মেরা সাথ আইয়ে, হাম আভী আপকো দূরসে বাতা দেগা।' সকলে আমাকে বলতে লাগল, আপনি তাড়াতাড়ি বন্দুক বার করুন এবং দেখে আস্থন। ডাক্তার সাহেবও বললেন—'লক্ষণ খুবই ভাল, আপনি তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে যান।' আমি আর দেরী না করে গাড়ী থেকে নেমে সামনের গাড়িতে গেলাম বন্দুকের বাক্স থেকে বন্দুক বার করার জন্য। দেখি বাক্সর ওপরে প্রায় ৩।৪ ইঞ্চি প্রমাণ ধূলো। হাতে করে কোনরকমে সেই ধূলো সরিয়ে তাড়াতাড়ি আমার প্রিয় '৪০৫ উইঞ্চেস্টার রাইফেল ও এক প্যাকেট গুলি (৫টা) বার করে বেরুবার জন্যে তৈরী হতেই ডাক্তার সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—'এবার আমি কি করবো?' আমি সংগে সংগে ক্ষেতের লোকটাকে ও আমার অন্যান্য সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলাম—'বাগোরা এখান থেকে কতদূর?' তার উত্তরে তারা বলল,—'খুব বেশী দূর নয়, মাত্র ২।৩ মাইল হবে।' আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম—'আপনি গাড়ি ছুটি নিয়ে বাগোরা চলে যান এবং ওখানকার ঠাকুর সাহেবকে ধরে আমাদের থাকার

ব্যবস্থা করে ফেলুন। আমি বাঘের দেখা পাব কি পাব না আর ফিরতে কতই বা দেরী হবে আমি নিজেই জানি না। আপনি গিয়ে থাকা, খাওয়া ও চানের ব্যবস্থা করে নিজে একটু আরাম করার চেষ্টা করুন। ডাক্তার সাহেব বললেন—'আপনার কি হবে?' আপনারও তো চান খাওয়া ও বিশ্রামের খুবই দরকার।' আমি বললুম—আমার কথা উপস্থিত বাদ দিন, শিকারে এই রকমই হয়ে থাকে। আপনারা আর দেরী করবেন না। এগিয়ে পড়ুন। আর মহারাজকে বললাম—তুমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে চলে যাও এবং গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করগে। ফকরুদ্দীন আর 'ভেক্সিনেটার' আমার সঙ্গে থাকুক। ওদের গাড়ী দুটোকে রওনা করে দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি বেহড়ের পথ ধরলাম এবং খানিকটা সমতল রাস্তায় যাবার পরেই ক্ষেতের লোকটা আমাদের বেহড়ের চড়াই-র পথ ধরে ওপরের দিকে ওঠাতে লাগল। আমি প্রথমেই সকলকে বলে রাখলুম—'মুখে একটি কথা নয়, যদ্দূর সম্ভব আওয়াজ না করে, খুব সাবধানে আমাদের বাঘের কাছে এগুতে হবে। আমার অবশ্যি তখন মনে হয়েছিল যে, সে সময়ে আমরা বাঘকে মারীর ওপরে দেখতে পাব না। সাধারণতঃ খুব রোদে বাঘ মারীর ওপর থাকে না। এর ব্যতিক্রম একমাত্র সম্ভব যদি না বাঘটার খুব খিদে পেয়ে থাকে, অর্থাৎ এক নাগাড়ে ৮।১০ দিন অভুক্ত অবস্থায় থেকে থাকে। এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে, হাঁপাতে হাঁপাতে, খুব সাবধানে, আমরা বেহড়ের ওপর উঠতে লাগলাম—প্রায় তিন চারশ ফুট ওপরে ওঠার পর ক্ষেতের লোকটা বেহড়ের একটা কিনারার দিকে খুব সাবধানে আমাদের নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি, প্রায় তিন চারশ ফুট নিচে কতকগুলো শুকনো ঝোপঝাড় আর তারপর খালি বালি আর পাথর। মনে হোল বর্ষার সময় ওখান দিয়ে নদীর মত জল চলে,—কিন্তু তখন শুকনো খটখটে আর ওই নদীর বেড়টা চওড়াতে প্রায় দুই-তিনশ ফুট হবে।

বেড়টার অন্য কিনারাতে আবার বেহড় খাড়া উঠে গেছে এবং সেখানকার খাড়া পাড়টা চার পাঁচশ ফুট উঁচু হবে। ক্ষেতের লোকটা উঁচু থেকে আমাকে ইশারা করে নিচের শুকনো ঝোপ ঝাড়গুলো দেখিয়ে বলল—"ওই ঝোপের মধ্যেই বাঘটা আমার বলদটাকে নিয়ে গেছে। তবে ঠিক কোন্ ঝোপটাতে তা আমি সঠিক বলতে পারবো না।" আমি তখন তাকে বললাম— বাঘ যখন তোমার বলদটাকে নিচে নিয়ে গেছে, তখন তুমি আমাকে পাহাড়ের ওপর ওঠালে কিসের জন্য? আমার কথা শুনে সে বললে—'শের বড়ী খত্‌রনাক জানোয়ার হ্যায়। হামলোগ আগর নিচেসে যাতা, তো, উয়ো হামলোগন কা উপর হামলা করতা।' আমি দেখলাম ওর সংগে তর্ক করা বৃথা সময় নষ্ট করা মাত্র। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি আমাকে নিচে নিয়ে চল এবং বাঘ ঠিক কোন জায়গায় তোমার বলদটাকে নিয়ে গেছে সেটা আমায় দেখাও; ওটা দেখা আমার একান্ত জরুরী। প্রথমে সে আমাকে নিচে নিয়ে যেতে রাজী হোল না। অনেক করে বলার পর অতিকষ্টে তাকে রাজী করালাম এবং অতি সাবধানে বেহড়ের উপর থেকে নিচে নামতে লাগলাম। নিচে নেমে ঝোপ ঝাড় গুলোর মধ্যে খোঁজ করতে করতে বলদটাকে পেয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে বলদটাকে পরীক্ষা করে বুঝলাম এটা বাঘের মারা এবং আশপাশের শুকনো মাটি ও ধূলোর উপর বাঘের পায়ের ছাপও দেখতে পেলাম। ছাপটা পরীক্ষা করে বুঝলাম, বাঘটা একটা মাঝারি মাপের মদ্দা বাঘ। যাই হোক সব দেখে শুনে আমি ঠিক করলাম, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওখানেই একটা মাচান করে বসলে, বাঘটাকে পাওয়া যেতে পারে। বাঘটা বলদটাকে মেরে টেনে এনে কেবল ঝোপে লুকিয়ে রেখে গেছে—মাংস কিছুই খায়নি। বলদটার ঘাড়ে বাঘটার চারটে দাঁত খুব গভীর ভাবে গর্ত করে দিয়েছে। সব জায়গা পরীক্ষা করে বুঝলাম, সন্ধ্যের

দিকে বাঘটার মাংস খেতে আসার সম্ভাবনা আছে। বলদটার কাছাকাছি একটা গাছ দেখে আমি ফকরুদ্দিনকে বোঝালাম এই যে গাছটা দেখছ, এর ওপর ওই যে দুটো ডাল, তার ওপর খুব তাড়াতাড়ি একটা খাটিয়া বাঁধার ব্যবস্থা কর। ক্ষেতের লোক-টাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাদের ঝোপড়িতে খাটিয়া আছে? সে তার উত্তরে বলল—'আছে সাহেব।' আমি তৎক্ষণাৎ ফকরুদ্দীন ও ক্ষেতের লোকটাকে খাটিয়া এনে ওই জায়গায় মাচা বাঁধার ব্যবস্থা করতে বলে, 'ভেক্সিনেটার'-কে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাগোরায় ঠাকুর সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। রাত্রে মাচানে বসতে হ'লে রাইফেলের টর্চ চাই, কারণ মার্চ মাসের প্রথম কয়েকদিন অমাবস্যার অন্ধকার রাত। আর আমি সেই অন্ধকার রাত দেখেই এসেছি; কারণ, আমার নিজের ধারণা যে, অন্ধকার রাত্রে জন্তু জানোয়াররা অনেক নিশ্চিন্ত মনে ঘোরাফেরা করে। জ্যোৎস্নার আলোতে অনেক সময় জন্তু-জানোয়াররা নিজেদের ছায়া দেখেই ভয় পায়। তাই আমি যখন শিকারে বেরোই, তখন অমাবস্যার সময় দেখেই বেরোই। বলাবাহুল্য সে সময় টর্চ্চবাতি একান্তই জরুরী। 'ভেক্সিনেটার' ও আমি প্রায় দৌড়ে ২।৩ মাইল চলার পর দূর থেকে একটা মাটির টিলার ওপর কয়েকটা ঘর দেখতে পেলাম। আমি ভেক্সিনেটার-কে জিজ্ঞাসা করলাম—ওইটাই কি বাগোরা?, উত্তরে সে বলল—'মনে হয়; এর আগে আমিও ত' এখানে কখনও আসিনি।' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি 'ভেক্সিনেটার' টীকা দেবার জন্যে এখানে আস না?' সে বলল—'যদিও এটা আমার এলাকা, কিন্তু আমি জীবনে কখনও এখানে আসিনি—এই প্রথম। এসব জায়গায় কেউ বড় একটা আসে না।' আমরা গল্প করতে করতে টিলার ওপর উঠতে লাগলাম। ওপরে উঠে সামনে একটা পাথরের দেওয়াল দেওয়া ঘর দেখতে পেলাম এবং তার সামনেই একটা প্রকাণ্ড বড় দরজা।

দরজাটা অনেক 'নাট্' ও 'বল্টু' দিয়ে নক্সার কাজ করা—দেখে মনে হল যেন আগেকার দিনের অনেক স্মৃতি বহন করছে, কিন্তু ওটা যেন খোলা অবস্থাতেই আছে বহুকাল। আপাততঃ অনেক কসরৎ করলেও ওটা বন্ধ করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি দুপাশে দুটো উঁচু চাতালের মতন, যার একটার ওপর ডাক্তার সাহেব একটা খাটিয়ার ওপর বসে আরাম করে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। হঠাৎ আমায় দেখে একটু অবাকই হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, বাঘ দেখতে পেলেন নাকি?' আমি বললাম—না, এখনও বাঘ দেখতে পাওয়া যায়নি। তবে বাঘের মারা বলদটাকে পেয়েছি। বাঘ সেটাকে খুব যত্ন করে ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। আমি ফকরুদ্দীনকে মারীর কাছাকাছি একটা গাছে মাচা বাঁধার কথা বলে টর্চের সন্ধানে এসেছি। আজ রাত্রে আমাকে মাচানে বসতে হবে, এ সুযোগ ছাড়া আমার উচিত হবে না। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন—'আপনার খাওয়া-দাওয়া?' আমি বললাম—আজ হবে না। তিনি বললেন—'আজ সারা দিনেতো কিছু জোটেনি—তার ওপর আবার সারারাত?' আমি বললাম—এ ধরণের অভ্যেস আমার আছে। পরে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—আমার বন্দুকের বাক্স কোথায়? তিনি তখন অন্য চাতালটা দেখিয়ে বললেন—'ওদিকে আপনার সব জিনিসপত্র এবং একটা খাটিয়া আপনার জন্যে রাখা আছে।' আমি আর সময় নষ্ট না করে আমার দিকের চাতালটার ওপর উঠে গেলাম এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্দুকের বাক্স খুলে আমার রাইফেলের-টর্চ ও ব্যাটারী বার করে লাগাতে সুরু করলাম। মহারাজ ইতিমধ্যে আমার জন্য চা ও খানকয়েক বিস্কুট দিয়ে গেল। এমন সময় খুব ভারী রাজস্থানী নাগরার আওয়াজে মুখ তুলে দেখি, মাথায় এক বিরাট পাগড়ী দেওয়া খুব মজবুত চেহারার এক রাজস্থানী লোক, আমাদের দুই চাতালের মাঝখানে এসে

দাঁড়াল। তাঁকে দেখেই ডাক্তার সাহেব বললেন—'আপনার সাথে এঁর আলাপ করে দিই ; ইনিই আমাদের বাগোরার ঠাকুর সাহেব, যাঁর অতিথি আমরা।' আমি চাতাল থেকে এক লাফে নেমে তাঁর সাথে হাত মেলালাম এবং তাঁকে বলতে লাগলাম, আপনার মেহেরবাণী না হ'লে, আমরা দুই বন্ধু কোথায় যে থাকতাম, আর কি করে যে আমাদের শিকারের ব্যবস্থা হোত জানি না। ঠাকুর সাহেব একটু হেসে বললেন—'কোই বাত নেহি—আপলোগন্ মেরা মেহ্মান। আপলোগন্কা কোই বাতকা তকলিফ হোনে নেহি দেউঙ্গা।' আমি ঠাকুর সাহেবকে বললাম—সব আপকি মেহেরবানী। আমার কিন্তু তখন গল্প করার মোটেই সময় নেই। তাই ঠাকুর সাহেবের হাতটা ধরে বললাম—ঠাকুর সাহেব হামে মাফ কিজীয়ে। হামে আভি বহুদ জলদী যানা হ্যায়। হিঁয়া সে দো তিন মাইল দূর মে শের এক বয়েল কো মারা, হাম উস্ জায়গা কা নগীচে পেড়মে এক খাটিয়া বাঁধনে কো লিয়ে বোল কে আয়া, আজ রাত কো হাম উস্ পর বৈঠেঙ্গে। আপকা হিঁয়া আনেকা টাইম ওহি মারীকা খবর মিলা। বাকী সব বন্দোবস্ত পাক্কা হ্যায়, হাম খালি বাত্তি লেনেকা বাস্তে ইধার আয়া, কারণ আভী রাত আঁধেরা মিলেগা—বাত্তি কা বহুত জরুরত হ্যায়।' তার উত্তরে ঠাকুর সাহেব আমাকে বললেন—'আপ আভি মাচানমে বৈইঠনেকো বাস্তে যা রহা হ্যায়?' আমি বললাম—জী—হাঁ। ঠাকুর সাহেব তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—'হাম ভী আপ্কা সাথ চলেগা। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই সেরেছে, আমার শিকারের আজ দফা রফা হবে। আমি মাচানে লোক নিয়ে বসতে মোটেই রাজী নই—বিশেষ করে অজানা লোক। শিকার করতে গিয়ে আমার অনেক আশা ভরসা সংগের লোকের জন্যই নষ্ট হয়ে গেছে—তাই মুস্কিলে পড়লাম ঠাকুর সাহেবকে নিয়ে। আপাততঃ এঁর অতিথি আমরা। কোনমতেই এঁকে চটান আমাদের উচিত হবে

না। খুব ভদ্রভাবে যদি এড়ান যায় তার চেষ্টা দেখলাম। তাই সবিনয়ে বললাম—ঠাকুর সাব, এ আপকো বহুৎ মেহেরবানী, লেকিন আভী বক্ত নেহী। আপকো খানা খাকর তৈয়ার হোনে মে বহুত দের হোগা। দিন ডুব রহা হ্যায়। তার উত্তরে তিনি বললেন—'বিলকুল নেহী, হাম তৈয়ার হ্যায়। মেরা খানা হো গিয়া। খালি এক মিনিট—মেরা কম্বল লেকে আভি আতা' বলেই তিনি পা বাড়ালেন। আমার আর কিছু বলবার অবকাশ রইল না। ইতিমধ্যে আমার টর্চ বাতিটা ঠিক করে লাগিয়ে দেখে নিয়ে মহারাজের দেওয়া চা ও বিস্কুট খেয়ে নিলাম। ঠাকুর সাহেব কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা বড় লাঠি ও একটা কম্বল নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমিও আর দেরী না করে বাধ্য হয়ে ঠাকুর সাহেবকে নিয়ে রওনা হলাম। ডাক্তার সাহেবকে বলে গেলাম খাওয়া দাওয়া করে আরাম করতে, কারণ আমরা ফিরবো পরের দিন সকালে। ঠাকুর সাহেব, আমি ও 'ভেক্সিনেটার' খুব লম্বা লম্বা পা ফেলে মারীর দিকে যেতে লাগলাম। যেতে যেতে ঠাকুরসাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম--ঠাকুরসাব, আপ কেতনা শের মারে হেঁ? তার উত্তরে ঠাকুরসাহেব বললেন—'হোগা কয়েক ঠো।' আমি একবার নিজের অজান্তেই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম আর ভাবলাম, আমি বছরের পর বছর ঘুরছি—বাঘের দেখাই পাইনি, আর এদের ভাব দেখলে মনে হয়, বাঘ মারা আর কি এমন বড় কথা। আমরা এইভাবে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে মারীর কাছে এসে পড়লাম; দেখি, আমাদের ফকরুদ্দীন কোনরকমে একটা খাটিয়া আমার দেখান গাছটাতে বেঁধেছে। আমি আর সময় নষ্ট না করে ফকরুদ্দীনকে বললাম—আমি আর ঠাকুরসাহেব গাছে চড়লেই, তোমরা খুব স্বাভাবিকভাবে কথা, হাসি ও গান করতে করতে এখান থেকে চলে যাবে। পিছন ফিরে আর তাকাবে না। তুমি'ত সবই জান

শিকারের, তহশীলদার সাহেব তোমার খুব তারিফ করেছে। সে খুব বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে বলল—'মুঝে সব কুছ মালুম হ্যায়।' আমি ঠাকুর সাহেবকে নিচু গলাতে বললাম—আপ পেড় মে চহড়িয়ে। ঠাকুর সাহেব গাছে চড়ে খাটিয়ায় বসতে আমি আমার রাইফেলটা তাঁকে ধরতে দিয়ে নিজেও গাছে চড়ে বসলাম এবং ফকরুদ্দীনকে ইশারা করে বললাম তোমরা এখন যেতে পার। ওরা চলে গেলে আমি খুব তাড়াতাড়ি রাইফেল ও টর্চ গুছিয়ে বসে ওখান থেকে মারীটা ঠিকমত দেখা যাচ্ছে কিনা দেখে নিলাম। আমার তরফে তখন সব ঠিক, কেবল বাঘের দেখা পাওয়ার অপেক্ষা। ঠাকুর সাহেব দেখলাম তাঁর কম্বলটাকে খাটিয়ার এক মাথার কাঠের দিকে ভাঁজ করে রাখছেন এবং তার পরমুহূর্তেই দেখলাম, তাঁর কনুইটা কম্বলের ওপর রেখে আধশোয়া অবস্থায় শুলেন। তাঁর দৃষ্টি সোজা ডানদিকের বেহড়ের দেওয়াল এবং চূড়োতে পড়ল। ফকরুদ্দীন, ভেক্সিনেটার ও ক্ষেতের লোকটার কথাবার্তা আমি তখন শুনতে পাচ্ছি—তারা মাচান থেকে বড় জোর তিন চারশ গজ গেছে, এমন সময় ঠাকুর সাহেব হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—'সাহেবজী, সাহেবজী, শের আগিয়া— মারিয়ে—মারিয়ে।' আমি খাটিয়াটায় আড়াআড়ি ভাবে বসেছিলাম—আমার ঠিক পেছনেই ঠাকুরসাহেব লম্বালম্বিভাবে আধশোয়া ছিলেন। আমি ঠাকুর সাহেবকে চেঁচাতে শুনেই চাপা গলায় বলতে লাগলাম —ঠাকুরসাব চিল্লাইয়ে মাত। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ঠাকুরসাহেব সমানে চেঁচাচ্ছেন—'মারিয়ে—মারিয়ে, দেখিয়ে উও শের খাড়া হ্যায়।' আমি তখন খুব সাবধানে ডানদিকের বেহড়ের দেওয়ালের ওপর তাকালাম, দেখি বাঘটা সোজা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হোল—বাঘটা আমাদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসছে আর ভাবছে, তুই বেওকুফ্ কেমন গাছের ওপর চড়ে বন্দুক নিয়ে বসে আছে আমায় মারবে বলে। একটু পরেই বাঘটা

বেহড়ের চুড়ো থেকে সরে গেল। আমি ওদিকে চোখ রেখেই ঠাকুর সাহেবকে নিচু গলাতে বললাম—ঠাকুরসাব, আপ বহুত শের মারে হোঙ্গে, আপকো তো সব মালুম হ্যায়। শের বহুত চালাক জানোয়ার। বোলনা ইয়া হিলানা অগর জারাসা উনকি নজর মে আ যায়, তো উয়ো আউর কভী মারী কা পাস নেহী আয়গা। আপতো সভী জানতে হ্যায়। আপকি ফের শেরকো দর্শন মিলে তো, আপ শ্রিফ হামারা বদন জারাসা দাবাকর ইশারা দিজিয়ে গা। আপকো সবই মালুম হ্যায়। আপ কেতনে শের মারা, হাম তো আভীতক এক ভী মারনে নেহী সেকা। বাঘটা চলে যাবার পর ঠাকুর সাহেবের উত্তেজনা কিছুটা কমল এবং তিনি চুপ করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন আর আমি মনে মনে কপাল চাপড়াতে লাগলাম—আমার সব ব্যবস্থা ভণ্ডুল হয়ে গেল; বাঘ আর এই মারীতে আসবেনা বুঝলাম, কিন্তু যদি আসে, সেই আশায় গাছের ওপর চড়ে সারারাত বসে কাটালাম, আর বালাজীকে স্মরণ করে বলতে লাগলাম :—বালাজী! একটা বড় বাঘ আমায় পাইয়ে দাও, খাণ্ডারে ফিরে গিয়ে তোমায় ভাল করে পূজো দেব। বেশ কিছুক্ষণ থেকেই শরীরে একটা দারুণ অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমার গা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে ও শিকার ফসকে যাবার পর এই অস্বস্তিগুলি যেন বেড়ে গেল। মার্চ মাসের রোদে সারাদিনে আমার শরীরটাকে একেবারে ভেজে দিয়েছে এবং তার ওপর ধুলো ও ঘাম জমার দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। এইভাবে রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত কাটল; তারপর চারপাশের বেহড় থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল অল্প অল্প। রাত দুটো-তিনটে নাগাদ বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করতে লাগলাম। মধ্যে মধ্যে ক্লান্তি ও অবসাদে ঘুমে চোখ বুজে আসতে লাগল কিন্তু কোন রকমে জাগিয়ে রাখতে হোল নিজেকে। এইভাবে বাঘের আসার আশায় রাত কাবার হয়ে গেল। একটু রোদ ওঠার ভাব দেখে আমি ঠাকুর সাহেবকে ডেকে অনিচ্ছায়

তার আরামের শেষরাতের ঘুমটি ভাঙ্গিয়ে দিয়ে দু'জনে গাছ থেকে সাবধানে নেমে ঠাকুর সাহেবের বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। ২রা মার্চের দিন ও রাত এইভাবে কাটল, ৩রা ভোরে পরিশ্রান্ত দেহটাকে টানতে টানতে ঠাকুর সাহেবের গ্রামের টিলার ওপর উঠতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পাথরের দেওয়াল দেওয়া গড়ের মধ্যে দরজা পেরিয়ে চাতালের ওপর লক্ষ্য করে দেখি, ডাক্তার সাহেব জনতা স্টোভ জ্বালিয়ে চা বানিয়ে খাচ্ছেন। আমাকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'কি, বাঘের দেখা পেলেন?' আমি আমার ক্লান্ত দেহটাকে অন্য চাতালের ওপর কোন রকমে উঠিয়ে গতরাত্রের সমস্ত ঘটনা তাঁকে বললাম এবং এও বললাম যে, এই দুঃখে আমি মাচানে কোন অজানা লোক নিয়ে যেতে নারাজ। কিন্তু কি করা যাবে। ঠাকুরসাহেবের অতিথি আমরা। তাঁকে তো আমরা চটাতে পারি না—যা হোক সবই আমার কপাল। এবার আমায় কয়েক কাপ চা দিন। চা খেয়ে আমি আগে চান করে আসি। আগের দিন চান না করার জন্যে দারুণ অস্বস্তি লাগছে। আর চান করে এসেই আপনার মহারাজ আমায় যা খেতে দেবে তাই খেয়েই আমি ঘুমিয়ে পড়বো। দুপুরে আমার ঘুম আপনা থেকে না ভাঙ্গলে আমায় খাবার জন্যে ডাকবেন না। আমাদের আটা নিশ্চয়ই আছে, তাই দিয়ে কয়েকখানা পরোটা আর চা হলেই আমার চলে যাবে। এই শুনে ডাক্তার সাহেব একটু মাথা দুলিয়ে বললেন—'ভেক্সিনেটার আটা আর ডাল কিনতে ভুলে গেছে।' আমি শুনে বললাম—তাহলে তো দেখছি বড় মুস্কিল—ভাত কি এত তাড়াতাড়ি হবে? ডাক্তার সাহেব বললেন—'দেখি কি করা যায়। আমি চা খেয়ে টিলা থেকে নিচে নেমে পড়লাম। নিচে একটা বড় কুয়া ছিল; সেখান থেকে বাগোরার সব লোকেই জল নেয়। ঠাকুর সাহেবের গড়ের দরজার সামনে দাঁড়াতে চোখে পড়ে চম্বল নদী, কিন্তু পানীয় জলের ব্যবস্থা কুয়া থেকেই। আমি

কুয়ার ঠাণ্ডা জলে খুব আরাম করে স্নান করলাম। গায়ের ধূলো সাবান দিয়ে তুলে ফেলতে বেশ একটু কষ্ট হলেও পরে বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে মনে হতে লাগল। স্নান করে গড়ে ফিরে আসতে ডাক্তার সাহেব বললেন—'একটুখানি আটা ঠাকুর সাহেবের কাছ থেকে ধার করলাম, তাই দিয়ে আপনার জন্যে কয়েকখানা পরোটা ও একটা আলু পিঁয়াজের ভাজি মতন করেছি।' আমি শুনে বললাম—খুব ভাল, এবার আমায় খেতে দিন। আর এর সঙ্গে চাই কয়েক কাপ চা। মহারাজ ভাজি, পরোটা ও কয়েক কাপ চা দেবার পর আমি তাকে বললাম ফকরুদ্দীনকে ডাকতে—বিকেলে সে কি ব্যবস্থা করবে সেটা তখনই বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। খাবার খেতে খেতে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে একটু গল্প করলাম এবং তাঁকে বললাম—আমার সঙ্গে শিকারে এসে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে তো? তিনি একটু হেসে বললেন—'মোটেই না, আমার খুব ভাল লাগছে।' আমি বললাম—ভেবে দেখুন, যে সময় মিসেস বিশ্বাসের অতি যত্নের তৈরী ভাল ভাল মুখরোচক খাবার খাওয়ার কথা, সে সময় মহারাজের এই রান্না গলা দিয়ে নামান কি অস্বস্তির ব্যাপার। আমার মনে হয় মহারাজ জীবনে এই প্রথম রান্না করছে। ইতিমধ্যে মহারাজের সঙ্গে ফকরুদ্দীন এল। আমি তাকে বললাম—আজ রাত্রের জন্যে একটা মাচা বাঁধতে হবে। তুমি খাওয়া দাওয়া সেরে চম্বল নদীর ধারে, যেখানে বেহড়গুলো এসে মিশেছে, সেখানে গিয়ে 'খোঁজ' কর। (বাঘের পায়ের দাগ খুঁজে বের করাকে 'খোঁজ' করা বলে। এই শব্দটা সারা ভারতে শিকারী মহলে প্রচলিত।) তারপর ভাল জায়গা দেখে একটা মাচান বাঁধ, আর ঠাকুর সাহেবের কাছ থেকে একটা মাঝারি মাপের মোষ জোগাড় করে বেধ, তার যা দাম লাগে আমি দেব। কিন্তু এমন জায়গাতে মাচান বাঁধা চাই যেটি বাঘের রাস্তা। মাচান ও মোষ বাঁধার সব ব্যবস্থা ঠিক ঠিক করা চাই।

তোমার তো এসব ব্যাপারে খুব তাজরুফা আছে। তাছাড়া তোমার তারিফ তো আমি সকলের কাছেই শুনে এলাম। তিন কি চারটার মধ্যেই আমি ঘুম থেকে উঠবো এবং সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই আমি মাচানে বসতে চাই। সে সব শুনে খুব বড় করে একটা সেলাম করে—'জী হাঁ, আপ বে-ফিকির রহিয়ে, আপ আরাম কিজিয়ে, হাম সব কুছ পাক্কা বন্দোবস্ত করকে রাখে গা'—বলে চলে গেল। আমি তখন ডাক্তার সাহেবকে বললাম—এবার সংসারের সব ভার আপনার, আমি কিন্তু এবার ঘুমাব। যদি দুপুরে আমার ঘুম আপনা থেকেই ভাঙ্গে, তাহলে দুপুরের খাওয়া খাব। আর তা না হলে বিকেলে উঠে চা, পরোটা কি কয়েকটা রুটি খেয়ে মাচানে যাব, আর ফিরব তার পরদিন সকালে। ডাক্তার সাহেব সব শুনে বললেন —'ঠিক আছে, তাই হবে।'

মাত্র মিনিট দুয়েক বিছানায় শুয়েই বুঝলাম, বিনা মশারীতে শোয়া অসম্ভব, ভীষণ মাছি। তাই উঠে মশারী টাঙ্গালাম। ডাক্তার বলে উঠলেন ঠিক—এই কথাটাই আপনাকে বলবো ভাবছিলাম—বিনা মশারীতে এখানে শুতে পারবেন না। মশারী টাঙ্গিয়ে শুতে না শুতেই আমার চোখে অবসাদ ভরে এল, ঘুমিয়ে পড়লাম। ঠিক বিকেল ৪টার সময় আমার ঘুম ভাঙ্গল। দেখি ডাক্তার সাহেব জনতা স্টোভে চা বসিয়েছেন। দেখে খুব খুশী হয়ে তাঁকে বললাম —আপনি দেখছি খুব পাকা গিন্নী। যে ক'দিন কোটাতে ছিলাম, মিসেস বিশ্বাসের আদরযত্ন খেয়ে এলাম, আর এখানে আপনার গিন্নীপণার আওতায় আমার দিনগুলো দেখছি ভালই কাটবে। ডাক্তার সাহেব একটু হেসে বললেন—'আপনার এখনকার খাবার জন্য কয়েকখানা পরোটাও করে রেখেছি।' আমি শুনে খুব খুশী হলাম, বললাম—দাঁড়ান, একটু হাতমুখ ধুয়ে আসি, এখুনি তৈরী হতে হবে;—পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই আমি মাচানে বসতে চাই। মহাবাজকে বললাম ফকরুদ্দীনকে ডেকে আনার জন্যে,

তারপর আমার চা ও খাবার দিতে। আমি হাতমুখ ধুয়ে চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি, এমন সময় মহারাজ ফকরুদ্দীনকে নিয়ে এল। ফকরুদ্দীন একটা মস্ত সেলাম করে আমার সামনে দাঁড়াল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কেয়া সব কুছ তৈয়ার? সে তখন বলল —'জী হাঁ। সব পাক্কা বন্দোবস্ত হ্যায়। এইসা দো রাস্তা কা মোড় পর মাচান বাঁধা—যো ইধার সে শের আয়গা তো টকরা জায়গা; উধার সে শের আয়গা তো টকরা জায়গা।' আমি শুনে খুব খুশী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঠাকুর সাহেবের কাছ থেকে মোষের ব্যবস্থা করছো? সে বলল—হাঁ, ঠাকুর সাহেব বলেছেন, যে মোষটা আমার পছন্দ সেটাই আমি নিতে পারি। আমি তার মধ্যে একটা পছন্দ করে রেখেছি।' এমন সময় ভারী নাগরার আওয়াজে বুঝলাম ঠাকুর সাহেব আসছেন। তিনি আসতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে খুব খাতির করলাম এবং বললাম গতরাত্রে তাঁর খুব তকলিফ হয়েছে। ঠাকুর সাহেব শুনে বললেন—'কোই বাত নেহী। কুছ তকলিফ নেহী।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'আপ তৈয়ার দেখ রহা—ক্যা মাচান মেঁ বৈঠনে যা রহা?' আমি বললাম—জী হাঁ। শুনে ঠাকুর সাহেব বললেন—'হাম ভী আপকো সাথ জায় গা। হাম এক মিনিট মেঁ মেরা কম্বল লেকে আতা।' আমায় আর কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই ঠাকুর সাহেব কম্বল আনতে চলে গেলেন। আমি নিচু গলায় ডাক্তার সাহেবকে বললাম—দেখুন দেখি, এ'ত বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াল।' ডাক্তার সাহেব তখন নিচু গলায় আমাকে সাবধান করে বললেন— 'আমাদের কোনমতেই ঠাকুর সাহেবকে চটানো চলবে না। আমাদের সবসময় খুব ভালো ব্যবহার করতে হ'বে—তার অনেক কারণ আছে। আপনাকে পরে বলবো। আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার তেমন সুযোগ হচ্ছে না। আপনি সারারাত শিকারের পেছনে বাইরে থাকেন আর দিনের বেলা এসেই একটু খেয়ে ঘুম লাগান

—আপনার সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ কোথায়?' এই কথা বলতে বলতেই ঠাকুর সাহেব এসে হাজির। আমি আমার '৪০৫ রাইফেলটা নিয়ে চাতাল থেকে লাফিয়ে নামলাম এবং ঠাকুর সাহেবকে বললাম—আপনি আবার আমার সঙ্গে এই কষ্ট করবেন? আপনার অনেক মেহরবাণী, কিন্তু আমার খুব লজ্জা করছে রোজ-রোজ আপনাকে এই তফলিফ দেওয়াতে। আজ কিন্তু ঠাকুর সাহেবের হাতে '৫০০ এক্সপ্রেস্ দোনলা রাইফেল ও কম্বল। আমি আর কথা না বাড়িয়ে রওনা হ'লাম। ফকরুদ্দীন, ঠাকুর সাহেব আর আমি এই তিনজনে গড় থেকে নেমে আসার পর, ফকরুদ্দীন বলল—'এক-মিনিট। হাম কাঁড়া লেকর আতা হ্যায়'। আমি ঠাকুর সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম, তাঁর এই সব সাহায্যের জন্য এবং বললাম ভগবান আমাদের আপনার দর্শন মিলিয়ে দিয়েছেন। আপনার মত উদার লোকের দর্শন পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা। এমন সময় ফকরুদ্দীন দেখি একটা মাঝারি মাপের মোষ নিয়ে আসছে। মোষটার কপালে বেশ কিছুটা সাদা দাগ। ফকরুদ্দীন আমাদের সঙ্গে যেতে যেতে বলল, 'এই সাদা দাগওয়ালা মোষটাকে আমি ইচ্ছে করে আপনার মাচানের জন্যে বেছেছি, কারণ এরা খুব পয়মন্ত হয় এবং সাদা দাগ অন্ধকারে দেখতে সুবিধে।' খানিকক্ষণের মধ্যেই আমরা চম্বল-নদীর ধারে, যেখানে ছুটো বেহড় এসে নদীর ধারে মিশেছে, সেইখানে এসে পৌঁছলাম। একটুখানি এগুতেই ফকরুদ্দীন ইশারাতে আমায় মাচানটা দেখাল। আমি তাকে মোষের বাচ্চাটাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে রাখতে বললাম এবং আমরা দুজনে মাচানে চড়ার পর যেন সে ওটাকে নিয়ে আসে। কারণ আমরা মোষটাকে দেখাতে চাই না যে, আমরা তার কাছেই একটা গাছের ওপর রয়েছি। বাঘ বা চিতাবাঘের জন্যে মাচান করলে নিয়ম হচ্ছে, টোপকে দেখতে না দেওয়া যে, শিকারী তাকে নিচে বেঁধে মাচানে উঠে বসল। তার প্রধান কারণ টোপ যদি

একবার দেখে ফেলে শিকারী তার খুব কাছেই গাছের ওপর আছে, তাহলে সে নিশ্চিত মনে ঘুমুবে এবং কোন কিছুতে শঙ্কিত হ'লে বার বার মাচানের দিকে তাকিয়ে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবে, যে গাছের ওপরেই তো লোক আছে অতএব তার কোন ভয় নেই। আর সেই সুযোগে বাঘ টোপের দৃষ্টি লক্ষ্য করে দেখবে, শিকারী মাচানে বসে আছে। একবার যদি বাঘের এইরকম কোন সন্দেহ হয়, তাহলে আর সে টোপের ধারে কাছে আসবে না। ফকরুদ্দীন মোষটাকে দূরে বেঁধে যখন আমাদের কাছে, এল তখন তার সঙ্গে সমস্ত জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম, কিন্তু আমার মোটেই পছন্দ হোল না। আমি তাকে নিচু গলাতে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এইখানে মাচান বাঁধলে কেন? এখানে কি তুমি বাঘের কোন 'খোঁজ' দেখেছিলে? তখন সে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, খানা খেয়ে সে যখন দুপুরে ওখানে এসেছে, তখন রোদে আর হাওয়াতে সব 'খোঁজ' মিটে গেছে কিন্তু জায়গাটা খুব ভাল। ইধার সে শের আয়গা তো টকরা জায়গা, উধার সে শের আয়গা তো টকরা জায়গা—বলে আমাকে বেহড়ের দিকে হাত দিয়ে দুই বেহড় দেখিয়ে দিল। মনে মনে তখন আমার খুব খারাপ লাগল, কিন্তু কিছুই করার নেই বুঝে সময় নষ্ট না করে মাচানে চড়ে বসলাম। ফকরুদ্দীনকে ইশারা করলাম মোষটাকে মাচানের সামনে এনে বেঁধে দিতে। ফকরুদ্দীন মোষ বেঁধে দিয়ে চলে গেল। আমরা মাচানে চুপচাপ বসে রইলাম: আমার কিন্তু মনে হতে লাগল আজ সারা রাত জেগে বসে থাকাই সার হ'বে—বাঘ ওখানে আসবে না। রাত্রে বালাজীকে আমি অনেকবার স্মরণ করে প্রার্থনা জানালাম একটা বড় বাঘ পাইয়ে দেবার জন্যে—জানি না সে প্রার্থনা বালাজীর কানে পৌঁছাল কি না। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল এবং দেখি ফকরুদ্দীন ওখানে এসে মোষটাকে খুলে জলের ধারে নিয়ে গেল ওকে জল খাওয়াবার

জন্য। আমি ও ঠাকুর সাহেব সারা শরীরে ব্যথা নিয়ে ও দুই পায়ে ঝিনঝিনি নিয়ে মাচান থেকে নেমে এলাম। খানিক পরে দু' পায়ে একটু বল পাবার পর, আমি ফকরুদ্দীনকে ডেকে বললাম,—তুম্ আভি খোঁজ করো—রাতমে শের কোন জায়গামেঁ পানি পিয়া দেখো—উস জায়গা পর আজ ফিন মাচান বাঁধো। চুপচাপসে যাও—আওয়াজ না কর না। হাম দোনো ঘর চলে। সে আমাদের ভরসা দিল, "আপ ফিকির না করিয়ে, আজ হাম বহুত খুব জায়গা পর মাচান বাঁধেগা। আজ রাতমে শেরসে আপকা জরুর মোলাকাত হোগী।" আমি বললাম—দেখা যায়গা, মেরা তক্‌দীর মেঁ ক্যা হ্যায়। এই বলে আমি ঠাকুর সাহেবকে নিয়ে গড়ের দিকে এগুতে লাগলাম। যেতে যেতে ঠাকুর সাহেবকে বললাম—ঝুটমুট আপকো রাতভর তকলিফ দিয়া। ঠাকুর সাহেব বললেন—'কোই বাত নেহী।' আমরা গড়ের দরজার কাছে এসে পৌঁছতে ঠাকুর সাহেব আমাকে বললেন—'অব হাম চলে। নাহায় গা, পূজা করেগা।' আমি বললাম—জী হাঁ, মাপ কিজিয়ে গা, আপকো বহুত তকলিফ দিয়া। আমি গড়ের মধ্যে ঢুকেই দেখলাম ডাক্তার সাহেব চা খাচ্ছেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন—'কি খবর? বাঘের দেখা পেলেন? আমি তার উত্তরে বললাম—না, আমাদের ফকরুদ্দীন সাহেব, যার শিকারের এত জ্ঞানবুদ্ধির তারিফ শুনতে শুনতে এলাম, তিনি গতকাল এমন একটা জায়গাতে মাচান বেঁধে ছিলেন যেখানে বাঘের আসার কোন সম্ভাবনা আমি অন্ততঃ দেখতে পাইনি। সবই আমার কপাল ডাক্তার সাহেব। প্রথম দিন বলদটা যেখানে খুঁজে পেলাম, ওই জায়গাতেই আমি বাঘ মারতে পারতাম, যদি না ঠাকুর সাহেব চেঁচাতেন, খানিকক্ষণের মধ্যেই আমি বাঘ নিয়ে আসতে পারতাম। আমি একটা খুব বড় সুযোগ হারিয়েছি কখনও কি আর সহজে সে সুযোগ আসবে? ডাক্তার সাহেব আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন—'আপনি ঘাবড়াবেন

না, আপনি বাঘ পাবেনই পাবেন। আমি তুএকজনের সঙ্গে শিকারে গিয়েছি কিন্তু আপনার মত এতখানি পরিশ্রমী—চান নেই, খাওয়া নেই,—ঘুম নেই, কোন কিছুতে আপনার খেয়াল নেই—খালি আপনার চিন্তা বাঘ আর বাঘ। এইরকম আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। আপনার এই একনিষ্ঠতাই সাফল্য আনতে বাধ্য। আমি বলছি আপনি বাঘ পাবেনই পাবেন।' তার উত্তরে আমি বললাম—ডাক্তার সাহেব, বহুকাল ধরে আমি শিকার করছি এই একই রকম একনিষ্ঠতার সংগে কিন্তু আজ পর্যন্ত একটাও বড় বাঘ আমি মারতে পারিনি। বলতে কি, ঠিকমত বাঘের দেখাই পেলাম না। এই যে প্রথম দিন প্রায় তিন'শ গজ দূর থেকে পাহাড়ের চূড়োর ওপর কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বাঘটা দেখলাম, এরকম দেখা আমি হয়তো কয়েকবার পেয়েছি কিন্তু এই ক্ষণিকের দেখায় এতদূর থেকে কি কখনো বাঘের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যায়? এই সব নানান কথায় আমাদের তুজনের চা খাওয়া পর্ব শেষ হ'তে, আমি জামা কাপড় ছেড়ে স্নানের জন্যে নিচে গেলাম। স্নান সেরে আগের দিনের মত খানকয়েক পরোটা ও চা খেয়ে আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম,—আমি শুতে যাচ্ছি, আজও আমাকে তুপুরে ডাকবেন না খাবার জন্যে। আমি হয়তো সেই বিকেলে উঠবো। আমি সকালেই ফকরুদ্দীনকে পাঠিয়েছি বাঘের 'খোঁজ' দেখে দেখে নূতন জায়গাতে মাচান বাঁধার জন্য। দেখা যাক সে কি করে। আমি মশারী টাঙ্গিয়ে শুতে শুতে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে তু'একটা কথা বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা: ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বিকেল ৪টে বেজে গেছে। ডাক্তারসাহেব ঠিক চায়ের জল চাপিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে উঠতে দেখে বললেন—কি, ঘুম হয়েছে? আমি বললাম—হাঁ, খুব ঘুমিয়েছি—ঠিক মরার মত। দাঁড়ান, ৪টে বেজে গেছে, হাতমুখ ধুয়ে আমি জামা কাপড় পরে বেরুতে বেরুতে সময় হয়ে যাবে। আপনি দয়া

করে মহারাজকে আমার চা আর যা যা খেতে দেবার আছে তা দিতে বলুন। আমি হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখি মহারাজ আমার জন্যে চা ও কয়েকখানা আটার রুটির সঙ্গে খানিকটা চিনি দিয়েছে। বুঝলাম, আমাদের আলু পিঁয়াজ কম আছে—চার বেলা তরকারী খাওয়া সম্ভব নয়। তাই ডাক্তারসাহেব চিনি দিয়ে রুটি খাবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে জামা কাপড় পরতে পরতে ভাবলাম, আজ আমার '৪০৫ একনলা রাইফেলটার বদলে '৪৫০ দোনলাটা নিয়ে যাই, দেখি রাইফেল বদল করলে বরাত কিছু খোলে কিনা। বন্দুকের বাক্স খুলে '৪৫০ দোনলা রাইফেলটা বার করলাম এবং তার টর্চবাতি ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা দেখে নিলাম। এমন সময় আবার সেই ভারী নাগরার আওয়াজ এল। ডাক্তার সাহেবের দিকে চাইতেই তিনি ইশারায় বললেন যে, ঠাকুর সাহেব আসছেন। বলতে বলতেই ঠাকুর সাহেব এসে পড়লেন। আমরা পরস্পর নমস্তে আদান-প্রদান করার পর ঠাকুর সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপ তৈয়ার হ্যায়, হাম ভী আপনা বন্দুক লেকর আভি আ রহা।' সেদিন ৪ঠা মার্চ। আমি ফকরুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলাম—'আজ ক্যায়সা মাচান বাঁধা হ্যায়?' সে তার উত্তরে বলল, 'আজ বহুত খুব জায়গা কা উপর মাচান বাঁধা—একদম তিন রাস্তা কা মোড়পর। শের ইয়ে রাস্তা সে আয়গা তো টক্‌রা জায়গা, উও রাস্তাসে আয়গা তো টক্‌রা জায়গা।' এইভাবে সে তিনদিক দেখিয়ে দিল। আমি মনে মনে ভাবলাম, ব্যাটা বড্ড বেশি কথা বলে। কথা কম বলে যদি কাজটা একটু ঠিক করে করতো, তাহলে শিকারের কিছুটা সুবিধে হোত। যাহোক, এরপর আমি, ঠাকুরসাহেব ও ফকরুদ্দীন গড় থেকে নিচে নামলাম। নিচে গিয়ে ফকরুদ্দীন মোষটা নিয়ে এল। আমরা তার পিছু পিছু যেতে লাগলাম। কিন্তু এবার দেখি সে আমাদের অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে। খানিক পরে দেখি সে মোষটাকে এক জায়গায় বাঁধছে।

বুঝলাম, আমরা মাচানের কাছাকাছি এসে গেছি। আমি সবদিকে নজর করে বুঝলাম, আজও আমাদের কপালে দুঃখ আছে—এ ব্যাটা ফকরুদ্দীনের খালি বক্তৃতা, কোনই কাজের নয় লোকটা। চম্বল নদীর ধারে যেখানে বেহড় এসে শেষ হয়েছে, সেইখানে নদীর কিনারাতে একটা গাছে সে মাচান বেঁধেছে এবং নদীর ঢালে একটা খোঁটা পুঁতেছে মোষটাকে বাঁধার জন্যে। সব কিছু দেখে আমার মন মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। ফকরুদ্দীন কাছে আসতেই আমি তাকে নীচু গলায় বললাম—'শিকার কা কই চীজ তুমে মালুম নেহী হ্যায়। এইসা ফাঁকা জায়গা পর কাঁড়া বাঁধনে সে কভী শের আ সেকতা? শের দূর সে দেখেগা আউর হাসে গা। উও শোচেগা কোন্‌সে বেওকুফ হামকো মারনে কা বাস্তে আউর ফাঁসানে কা বাস্তে কাঁড়া বাঁধা হ্যায়। শের জরুর হাসতে হাসতে চলা যায় গা।' ঠাকুর সাহেবও ফকরুদ্দীনকে খানিক বকলেন। আমি তখন বললাম—যাক, যা হবার হয়ে গেছে। কাল আমি নিজে খোঁজ করে জায়গা দেখিয়ে দেব কোথায় বাঘের জন্যে মাচান বাঁধা উচিত। আমরা দুজনে মাচায় উঠে বসলাম। ফকরুদ্দীন মাচার সামনে খুঁটিতে মোষটাকে এনে বাঁধবার পর তার পা থেকে নাগরাজুতোটা খুলে মোষটার কপালে সাদা জায়গাটায় খুব জোরে জোরে কয়েক ঘা মারল এবং বলতে লাগল—'আজ তেরা কপাল ফোঁড়ে গা, আজ শের তুমকো জরুর মারে গা।' মোষটার জন্য আমার কষ্ট হ'তে লাগল, যে বেচারা বিনা দোষে মার খেলো। যাহোক ফকরুদ্দীন ইশারায় জানাল সে যাচ্ছে। আমি ও ঠাকুরসাহেব সারারাত মাচায় বসে কাটালাম। আমি জানতাম বাঘ আসবে না কিন্তু যদি আসে, সেই আশাতে সারারাত জেগে কাটালাম। ঠাকুরসাহেব সন্ধ্যা ৭টা ৮টা থেকে সারারাত ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলেন। আমার চোখে ঘুম নেই—যদি বাঘ আসে। এমন অনেক শুনেছি, যেখানে বাঘ আসবার কথা নয় সেই সব জায়গাতেও বাঘ এসেছে এবং

অনেক ভাগ্যবান শিকারী সেইসব অসম্ভব জায়গা থেকে বাঘ মেরে নিয়ে গেছেন। আমি সেই আশাতেই সারারাত জেগে কাটালাম। সকালে রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে ফকরুদ্দীনকে দেখা গেল—আমরাও আস্তে আস্তে মাচান থেকে নামলাম। ফকরুদ্দীন আমাকে জিজ্ঞাসা করল—'ক্যা সাব, শের আয়া নেহী?' আমি তাকে খুব গম্ভীরভাবে বললাম—'নেহী।' আমরা ধীরে ধীরে গড়ের দিকে এগুতে লাগলাম। আমি যেতে যেতে ঠিক করলাম, চা খেয়ে নিয়ে আমি আজ নিজেই বেরুব বাঘের খোঁজ করতে, দেখি কি হয়। গড়ের দরজার কাছাকাছি আসতে ঠাকুরসাহেব আমাকে বললেন—'আব হাম চলে, নাহায় গা, পূজা করেগা আউর জারাসা ঘর কা কাম করেগা। ইয়ে কয় রোজ কুছ কিয়া নেহী।' আমি হাতজোড় করে বললাম—'ঠাকুরসাব আপকো মেহেরবানী কভী ভুল নেহী স্যাকতা।' ঠাকুরসাহেব চলে যাবার 'পর আমি গড়ের দরজা পেরিয়ে অভ্যেস মতন ডানদিকে চোখ ফেরালাম—দেখি ডাক্তার সাহেব ঠিক চা নিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি আজও বাঘের দেখা পেলেন না? আমি খুব করুণ স্বরে বললাম—না ডাক্তার সাহেব! আমার খালি কষ্টই সার, কপালে না থাকলে এরকমই হয়। কপাল ভাল হলে প্রথম দিনেই নির্ঘাৎ বাঘ মারতাম। সবই আমার কপাল। ডাক্তার সাহেব আমাকে বলল—'বন্দুক রেখে এখানে আসুন, দুজনে একসঙ্গে চা খাওয়া যাক।' আমি আমার চাতালটার ওপর উঠে বন্দুক রেখে ও কিছু কিছু জামা কাপড় ছেড়ে তাঁর কাছে এলাম, তিনি একটা কলাই করা মগে করে চা দিলেন। আমি কয়েক চুমুক চা খেয়ে একটু শ্রম লাঘব করছি, এমন সময় ডাক্তার সাহেব আমায় জিজ্ঞেস করলেন 'আজ কত তারিখ?' আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম আজ ৫ই মার্চ। তিনি তখন আমাকে বললেন—'গতকাল বিকেলে আমি পাহারাদারটাকে পাঠিয়েছি, এখান থেকে ৭।৮ মাইল

দূরে প্রথমে যে গ্রাম পড়ে সেখানে সন্ধান করে একটা গরুর গাড়ী আনার জন্য।' আমি শুনে একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম গরুরগাড়ী কি হবে ডাক্তার সাহেব? তিনি একটু হেসে বললেন—'আজ ৫ই মার্চ, আমাকে ৭ই কোটায় ফিরতে হবে, কারণ আমি মাত্র ৭ দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। আমার সরকারী চাকরী—সময়মত কাজে যোগ না দিলেই নয়। আজ যদি গরুরগাড়ী নিয়ে আসতে পারে, তাহলে আমাকে আজই রওনা হতে হবে। তা নাহলে, আমি ৭ই মার্চ কোটা পৌঁছাতে পারবো না।' খবরটা শুনে আমি'ত মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। আমি বললাম—ডাক্তার সাহেব—আপনি যদি আমাকে একা ফেলে এখানে থেকে চলে যান, তাহলে আমাকে নির্ঘাৎ না খেয়ে মরতে হবে। কারণ আপনার চ্যালা চামুণ্ডারা সব আপনার সঙ্গেই পালাবে। আমি একলা এই পাণ্ডববর্জিত দেশে কি-ই বা করতে পারবো? তিনি আরও বললেন—'আরেকটা কথা আপনাকে বলবো ভাবছিলাম, সেটা অবশ্য আমার থেকে আপনি ভাল বুঝবেন। আমার মনে হয় ফকরুদ্দীন ঠিক জায়গা বাছতে পারছে না। যেখানে মাচান বাঁধলে বাঘ আসার সম্ভাবনা, মনে হয় ওর সে ধারণা নেই। আমার মতে চা খাবার পর আপনি নিজে বেহড়টা ভাল করে দেখে কোথায় মাচান বাঁধলে ঠিক হবে, সেইমত বুঝে মাচান বাঁধান, দেখবেন, আপনি ঠিক বাঘ পাবেন।' আমি শুনে ডাক্তার সাহেবকে বললাম—আমি ঠিক এই কথাই গতরাত থেকে ভাবছি এবং চা খেয়েই বেরুব এই ঠিক করেই এসেছিলাম. কিন্তু আপনি আমাকে ফেলে চলে যাবেন এই খবরটা শুনে আমি এমন ঘাবড়ে গেলাম যে, সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ডাক্তার সাহেব আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন. 'চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

আমরা চা খেয়ে রওনা হতে যাচ্ছি, এমন সময় ঠাকুরসাহেব এলেন। তাঁকে আমাদের উপস্থিত ব্যবস্থার কথা বলতে, তিনি আমাকে

বললেন—'হামে মাফ কিজিয়ে—আভিতো খালি খোঁজ করনেকো বাস্তে যা রহা ?' আমি বললাম—'জী হাঁ।' তিনি বললেন—'তব মেরা বদলিমে মেরা লেড়কা কো আপকো সাথ ভেজ রহা।' আমি বললাম—'ঠাকুরসাব—উসকো কোই জরুরত নেহী।' তিনি শুনলেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে ২৫।২৬ বছরের খুব মজবুত চেহারার একটি ছেলেকে আমাদের সামনে এনে হাজির করলেন এবং বললেন 'এহি মেরা লেড়কা। ইয়ে আপলোগনকা সাথ জায়গা।' আমরা সময় নষ্ট না করে ঠাকুর সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা হলাম। তাঁর ছেলেটিকে আমাদের সঙ্গে পাঠাবার হয়ত কোন কারণ ছিল।

এবার আমরা বেরুলাম পাঁচজন—আমি, ডাক্তার সাহেব, ঠাকুর সাহেবের ছেলে, ফকরুদ্দীন, ও 'ভেক্সিনেটার।' প্রথমে আমরা চম্বল নদীর ধারে গেলাম। সেখানে আমরা খুব সাবধানে প্রত্যেকটি 'গেমট্রাক' এবং ভিজে জায়গায়, যেখানে এক আধটুকু জল আছে, সেইসব জায়গাগুলো লক্ষ্য করে এগুতে লাগলাম। নদী থেকে আধ মাইল আন্দাজ বেহড়ের মধ্যে যেতে একটা ছোট্ট জলা জায়গা চোখে পড়ল। সেখানে দেখি এক জায়গায় একটুখানি জল আছে এবং সকালের দিকে একটা অল্পবয়সী মদ্দা বাঘ সেখান থেকে জল খেয়েছে—তার পায়ের দাগ পেলাম এবং জল খেয়ে ফিরে যাবার পথে তার মুখ ও দাড়ি থেকে শুকনো বালির ওপর জলের ফোঁটা পড়েছে তাও দেখলাম। গত রাত্রে এই জায়গাটার সোজা নদীর চড়াতে আমাদের মোষটা যেখানে বাঁধা ছিল সেখানে প্রচুর পরিস্কার জল, কিন্তু বাঘটা সেই জল না খেয়ে এখানকার নোংরা পাতা পচা জল খেয়ে গেছে। এর থেকে বোঝা যায় বাঘ কত সাবধানী ও চালাক জানোয়ার। যাই হোক, জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হোল। ঠিক করলাম মাচান এইখানেই বাঁধা হবে। নিচু গলাতে ফকরুদ্দীনকে বোঝালাম মাচান কোন গাছে বাঁধা হবে, ঠিক কত উঁচুতে হবে,

এবং মোষটা কোনখানে থাকবে ইত্যাদি। তারপর আমি বাঘটার পায়ের দাগ ধরে সাবধানে এগুতে লাগলাম এবং সকলকে বললাম তোমরা কোনরকম আওয়াজ না করে আমার পিছু পিছু এস। কিছুদূর এগুতেই বাচ্চা সমেত একটা বাঘিনীর পায়ের দাগ আমার নজরে পড়ল। মনে হোল তারাও দুজনে ভোরের দিকে জল খেয়ে ওই রাস্তা ধরে বেহড়ের দিকে চলে গেছে। আমি কোন কথা না বলে আমার সঙ্গীদের ওই পায়ের দাগগুলো দেখালাম। আবার আমি ওদের সকলকে সাবধান করে দিলাম কোন আওয়াজ না করে আমার পিছু পিছু আসতে। ডাক্তার সাহেব ঠিক আমার পেছনেই আসছিলেন। তাঁর মুখের চেহারা দেখে মনে হোল এইভাবে বাঘের স্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখে বেহড়ের মধ্যে যাওয়া তাঁর পছন্দ নয়। আমি সব অবস্থা দেখে মনে মনে বেশ খুসী হয়েছিলাম এবং ভাবছিলাম যে, এই সামান্য একমাইলের মধ্যে তিন তিনটে বাঘের পায়ের ছাপ দেখলাম—তাহলে এখানে বাঘের অভাব নেই। খালি আমার কপাল খারাপ, তাই ফকরুদ্দীনের ওপর ভরসা করে বসেছিলাম। আমি নিজে যদি একটু কষ্ট করে বেহড়টা ভাল করে দেখে মাচান বাঁধার ব্যবস্থা করতাম, তাহলে হয়তো এতদিনে আমি বাঘ পেয়েই যেতাম। এই সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে বাঘের পায়ের ছাপগুলো ধরে এগুতে লাগলাম। আরও কিছুদূর ওঠার পর একটা বড় মদ্দা বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে আমি নিঃশব্দে সবাইকে সেগুলি দেখিয়ে চারটে বাঘের পায়ের দাগ ধরে ক্রমশঃ বেহড়ের উপরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এইভাবে অনেক চড়াই উতরাই এবং শুকনো ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে ক্রমশঃ উঠতে উঠতে আমরা প্রায় আড়াই তিন মাইল বেহড়ের মধ্যে উঠে গেছি এবং ওই চারটে বাঘের পায়ের দাগ যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই যাচ্ছি। আন্দাজে মনে হোল যে আমরা প্রায় দেড়শ গজ ওপরে উঠেছি। সেখান থেকে নিচুর দিকে নজর ফেলতে দেখলাম, বেশ ঘন সবুজ গাছপালা এবং

সেখানে চারপাশে বেহড়ের চূড়োগুলো প্রায় দেড়শ দু'শ গজ উঁচু এবং নিচে যে জায়গাটায় সবুজ গাছপালা আছে সেখানে বিশেষ রোদ পায় না। তাই ওই জায়গাটায় একটা নরম, সবুজ ও ঠাণ্ডা ভাব এসেছে। চারটে বাঘের পায়ের দাগ ওই সবুজ ঠাণ্ডা জায়গাটার দিকে নেমে গেছে। আমি তখন ওদেরকে বললাম—আমি একা নিচে গিয়ে ওই সবুজ জায়গাটা একবার দেখে আসতে চাই, তোমরা এখানে চুপ করে বোস। সেদিন আমার কাঁধে ছিল আমার প্রিয়, '৪০৫, বোরের 'উইঞ্চেষ্টার' রাইফেল। আমি সেটাকে নিয়ে খুব সাবধানে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। কিছুটা নামতেই খুব পচা মাংসের দুর্গন্ধ আমার নাকে এল। আমি খুব সাবধানে রাইফেল বাগিয়ে সব দিক লক্ষ্য করে পা পা করে নিচের দিকে এগুতে লাগলাম। যত এগুচ্ছি পচা গন্ধ তত বেশী পাচ্ছি। এইভাবে প্রায় নিচে এসে দেখি, একটা গরুর কতকগুলো হাড়গোড় এখানে সেখানে পড়ে আছে। কেন জানিনা আমার মনে হোল এগুলো সেই প্রথম দিনের গরুটার হাড়গোড়। বাঘগুলো হয়তো গরুটাকে ওখানে টেনে এনেছে এবং খেয়েছে। কিন্তু আমার যদ্দূর মনে পড়ে, দ্বিতীয় দিন ঘুম থেকে ওঠার পর ফকরুদ্দীন আমাকে বলেছিল যে, এই বলদের ওপর গিদ (শকুনি) উতর গিয়া। আমার ফকরুদ্দীনকে বলা ছিল ওই বলদটার ওপর নজর রাখতে এবং বাঘ যদি ওটাকে টেনে নিয়ে যায়, তাহলে যেখানে টেনে নিয়ে যাবে সেখানে মাচান বাঁধতে। কিন্তু যখন শুনলাম শকুন পড়েছে, তখন আমি ওই বলদটার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, কারণ শকুন পড়লে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আর এককণাও মাংস পড়ে থাকে না। আমি জায়গাটা ভাল করে দেখলাম, অনেক বাঘের পায়ের দাগ থেকে মনে হল যে ৪টে বাঘই রোদের সময় ওই জায়গাতে থাকে। এরপর আর সময় নষ্ট না করে আমি ওপরে উঠে এসে ফকরুদ্দীনকে নিচু গলাতে জিজ্ঞাসা করলাম—'পহলে রোজ হামলোকন কো যো বয়েল মারীকা

খবর মিলা থা, আউর যাঁহা হামলোকন মাচান বাঁধা, উও জায়গা ইহাঁ সে কেতনা দূর ?' ফক্‌রুদ্দীন আমাকে বেহড়ের বাঁহাতি কয়েক গজ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখাল—'ইসিকা সামনে মারী পড়া থা।' তখন বুঝলাম, আমার অনুমান ঠিক। বাঘ শকুন তাড়িয়ে বলদটার যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সেটা ওই সবুজ জায়গাটায় নিয়ে এসে খেয়েছে। বেহড়ে ঘেরা ওই ঠাণ্ডা জায়গাটায় বাঘেরা নিশ্চিন্তে মারী খায় ও ঘুমোয়। আমরা আর দেরী না করে গড়ের দিকে রওনা হলাম।

গড়ে ফিরলাম প্রায় বেলা এগারটায়। জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করার জন্যে ইদারার কাছে গিয়ে দেখি, ঠাকুর সাহেবও স্নান করার জন্যে এসেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'শের কো খোঁজ মিলা ? আমি তাঁকে সংক্ষেপে সব বললাম। তারপর বললাম—'ঠাকুর সাব, আজ সুবামে ডাক্তার সাব মেরা দিল উখাড় দিয়া।' তিনি বললেন—'কেঁও—ক্যা বাত হ্যায় ?' আমি বললাম —'ডাক্তারসাব হামকো হিঁয়া ছোড়কর কোটা যানেকা বাস্তে বয়েল গাড়ী মাঙ্গায়া। আউর ডাক্তারসাব চলা যানেসে উনকি সারে আদমি ভী উনহিকা সাথ চলা যায়গা। তব তো ম্যায় খানা বিনা মর জায়গা।' ঠাকুরসাহেব শুনে সংগে সংগে বললেন— 'কোই বাত নেহী—আপ হামারা মেহমান হ্যায়—আপকো হাম খানা খিলায়গা। আপকো কোই বাতকা তকলিফ হোনে নেই দেউঙ্গা।' তখন আমি বললাম—'উয়ো হাম জানতে হ্যাঁয় ঠাকুরসাব—খানা কই বড়া বাত নেহী। সবসে বড়ী বাত মেরা সাথী ছুট জায়গা—দোনো একহি সাথ আয়া। ঠাকুরসাব মেরা তকদীর মে পথর হ্যায়। রাজস্থান মে বহুত শের হ্যায় শুনকর কেতনা দূর সে আয়া। লেকিন দেখতা হ্যায় হিঁয়া সে ভী খালি হাথ মে ওয়াপস যানে পড়েগা।' ঠাকুরসাহেব আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন,—'আপকো এক •শের দে কর ইহাসে

ভেজুঙ্গা। আভী হাম নাহা কর গঙ্গামায়িকী পূজা দেউঙ্গা, আপকো শের জরুর মিলেগা।' আমি'ত প্রায় ঠাকুরসাহেবের পা-ছুটো জড়িয়ে ধরার মত করে হাতজোড় করে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং খুব করুণ সুরে ভালভাবে পূজো দেবার জন্যে মিনতি জানালাম। আমরা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে গড়ে ফিরে এসে মহারাজকে বললাম খাবার দেবার জন্য। খেয়ে একটু ভাল করে ঘুমিয়ে না নিলে রাত্রে জাগতে পারা সম্ভব হবে না। ঐ ক'দিনেব মধ্যে ওই দিনই ছুপুরে প্রথম খেতে বসলাম। ছুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে তো আমার চক্ষুস্থির। আগেই বলেছি, আটা ও ডাল কিনে আনতে 'ভেক্সিনেটার' ভুলেই গেছে। ঠাকুরসাহেবের কাছে আটার জোগাড় হয়েছিল, কিন্তু ওখানে ডাল খাবার চল না থাকাতে ডালের ব্যবস্থা করা যায়নি। আর ও যা জায়গা, ওখানে একটি দেশলাই পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায় না। তাই বরাদ্দ ছিল আলু পিঁয়াজের ঝোল আর ভাত। কিন্তু পাঁচজন পোষ্য মিলে ছু'বেলা খেয়ে তাও শেষ অবস্থায় এনে ফেলেছে। দেখলাম একটা বড় পেতলের হাঁড়িতে কাল রঙের ঝোল ও তার মধ্যে ছু একটি আলু পিঁয়াজ ভাসছে। মহারাজ একটি পিতলের থালাতে একটু ভাত ও ঝোল ঢেলে দিল--মধ্যে মাত্র একটা আলু। তাই দিয়েই কোন রকমে খাওয়া সেরে, আমি বিছানায় শুতে গেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছি—হঠাৎ ঠাকুর সাহেবের গলার আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভাঙ্গল, কানে এল 'সাহেবজী উঠিয়ে, শের আ গিয়া।' আমি ও ডাক্তারসাহেব ছুজনে ছুদিকের চাতাল থেকে মশারী ঠেলে লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়ালাম, দেখি ঠাকুরসাহেব ছুই চাতালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে চেঁচাচ্ছেন—'সাহেবজী জলদি চলিয়ে, শের চম্বল কিনারামে আ গিয়া।' কিছুক্ষণ আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কি? এই এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে ছুপুর রোদে ঠাকুরসাহেব কোথায় বাঘ দেখলেন। আমি উঠেই কিন্তু

জামা জুতো পরতে লাগলাম এবং ঠাকুরসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম —'শের চম্বল কিনারা মে আ গিয়া, ইয়ে ক্যায়সে আপকো পতা চলা ?' তার উত্তরে তিনি বললেন—'এক আদমী চম্বল কিনারামে ভইস চরাতা থা। শের ভইসকা উপর হামলা করনে কে লিয়ে বেহড়কা বিচ সে চম্বল কিনারা মে আয়া। সারে ভইসকো শের কা বাস মিলনে পর এককাঠ্টা খাড়া হোকর শের কা মোকাবিলা করনেকা বাস্তে একসাথ আওয়াজ করনে লাগা—ফোঁস্—ফোঁস্।' এই বলে সামনে একটা লোককে দেখিয়ে বললেন —'ইয়ে আদমী খবর লেকর দৌড়কে আয়া। আব আপ জলদী কীজিয়ে।' ওদিকে দেখি ডাক্তার সাহেবও পোষাক পরছেন এবং আমাকে বললেন—'আমিও আপনার সংগে যেতে চাই—অবশ্যি আপনার যদি আপত্তি না থাকে। আমি বললাম—আমার কোনও আপত্তি নেই—আপনি নিঃসঙ্কোচে আসতে পারেন। তখন তিনি বললেন—'আমাকে একটা বন্দুক আর কিছু গুলি দিতে হ'বে।' আমি বললাম—তার অভাব নেই। আমি আপনাকে আমার খুব প্রিয় ১২ বোরের সটগান'টা দিচ্ছি. এটা জার্মানীর 'জিকোর' তৈরী। এটা আমার বাবার খুব প্রিয় বন্দুক ছিল। তারপর বন্দুকের বাক্সটা খুলে ১২ 'বোরের' দোনলা বন্দুকটা ও কিছু 'এল. জি' গুলি দিলাম। গুলিগুলো দেখে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এতে বাঘ মরবে তো ?' আমি বললুম—'কাছ থেকে মারলে এল. জি-তেই বাঘ মারা যায়। আপনাকে বুলেট বা বল কার্তুজ দিলাম না এই জন্য যে, বুলেটে একটা মাত্রই গুলি থাকে।—বন্দুক চালান অভ্যেস না থাকলে ওই একটা গুলি বাঘের গায়ে নাও লাগতে পারে। কিন্তু 'এল জি'তে ৯টা বড় বড় ছররা থাকে—তাতে একটা না একটা লাগবেই এবং তাতেই কাজ হবে

ডাক্তার সাহেব ও আমি তৈরী হয়ে বেরুলাম। ঠাকুরসাহেব তাঁর ৫০০ এক্সপ্রেস দোনলা রাইফেল নিয়ে সঙ্গে চললেন। আমার

কাঁধে আমার সেই প্রিয় '৪০৫ উইঞ্চেষ্টার রাইফেল। ডাক্তার সাহেব মহারাজকে তাঁর সংগে সংগে থাকার জন্য বললেন, ভেক্সিনেটার ও ফকরুদ্দিনও চলল সংগে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগলাম। যেতে যেতে ঠাকুর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—'শের আগর বেহড় কা অন্দর, চম্বল কিনারা মে হোগা তব তো 'হাঁকা' করনা পড়েগা। হাঁকা কা আদমী কাঁহা ঠাকুরসাব?' ঠাকুরসাহেব বললেন----'সব হো জায়গা, আপ চলিয়ে তো।' আমরা সকলে খুব তাড়াতাড়ি বড় বড় পা ফেলে বেহড়ের দিকে চললাম। কিছুদূর যেতেই একটা ক্ষেত দেখতে পেলাম এবং ক্ষেতের ধারে একটা ছোট ঝোপড়ির সামনে একটা রাজস্থানী মেয়ে একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে কিছু কাজ করছে দেখলাম। দূরে ক্ষেতে একটা লোককেও কাজ করতে দেখলাম। ঠাকুরসাহেব লোকটাকে দেখে চেঁচিয়ে কি যেন বললেন বুঝলাম না—কিন্তু দেখি লোকটা এক দৌড়ে ঝোপড়ির মধ্যে গিয়ে একটা বন্দুক নিয়ে আমাদের কাছে চলে এল। ঝোপড়ির মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা বন্দুক বার করায় অবাক হ'লাম। আমি মনে মনে হিসাব করে দেখতে লাগলাম, আমাদের হাঁকার জন্যে ক'জন লোক হ'বে। ফকরুদ্দীন, ভেক্সিনেটার, যে লোকটা মোষ চরাচ্ছিল এবং খবর এনেছিল আর ক্ষেতের এই বন্দুকধারী এই নিয়ে ৪টি লোক হ'ল। আমি ঠাকুরসাহেবকে বললাম, 'হাঁকা কা বাস্তে হামলোক কো খালি চারঠো আদমী মিলা। ভইসোঁ কো হাঁকাকা কামমে লাগানে পড়েগা।' ঠাকুরসাহেব মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ইতিমধ্যে আমরা বেহড়ে এসে পড়েছি। বেহড়ের মধ্যে সোজা খানিক ঢুকে আমি দাঁড়িয়ে যে লোকটা বাঘের খবর এনেছিল তাকে নিচু গলাতে জিজ্ঞাসা করলাম 'বাতাও শের কিধার হ্যায়?' সে আমাকে হাতের ইশারাতে চম্বল নদীর দিক দেখাল, আমি তখন ফকরুদ্দীনকে বললাম—তুমি ও ভেক্সিনেটার এই লোকটিকে নিয়ে চম্বল নদীর কিনারাতে চলে যাও

এবং যতগুলি মোষ আছে সেগুলিকে একটু একটু ফাঁক ফাঁক করে বেহড়ের ভেতরে তোমরা চারজনে যেমন করে মোষ চরায় সে রকম করে চরাও। গান ও স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে বলতে তোমরা মোষ নিয়ে বেহড়ের ভেতর ঢুকতে থাক—কোনরকম চীৎকার করবে না। ফকরুদ্দীন জী হাঁ বলে ওদেরকে নিয়ে রওনা হলে আমি, ঠাকুরসাহেব, ডাক্তারসাহেব ও মহারাজ বেহড়ের আড়াআড়ি এগুতে থাকলাম। বেহড়ের প্রায় মাঝ বরাবর এসে আমি থেমে চারদিক দেখে নিয়ে ডাক্তার সাহেবকে বললাম—'আপনি ও মহারাজ একটু দূরে একটা বড় গাছ দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন। কোনরকম নড়াচড়া বা আওয়াজ করবেন না। ডাক্তার সাহেব আর মহারাজ তাড়াতাড়ি আমাদের সামনে থেকে চলে গেল গাছ খুঁজে চড়ার জন্য। আমি ও ঠাকুরসাহেব আরও কয়েক পা এগিয়ে একটা সরু গাছের তলাতে এলাম। গাছটা আমার মাথার ওপরে আরও হাত-দুই উঠে কয়েকটা শুকনো ডালপালা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি গাছটার তলাতে এসে চম্বল নদীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম—সামনে দেখলাম প্রচুর শুকনো ঝোপঝাড় ও উঁচু নিচু জমি। চম্বল কিনারার দিকে কয়েকটা বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম, কিন্তু কোন গাছেরই পাতা নেই। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে ৬০।৭০ গজ দূরে বেহেড়ের আড়াআড়ি ৮।১০ ফুট চওড়া একটা নালা গলিপথের মতন চলে গেছে। এইসব নালা বা গলিপথে চম্বলের ডাকাত, বাঘ এবং অন্যান্য জন্তুরা চট্ করে নিজেদের লুকিয়ে চোখে ধাঁধা দিয়ে পালিয়ে যায়। আমি মনে মনে ভাবলাম এই নালাটাকে আমার খুব লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন জানি না, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম সবদিক থেকে সেই জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হোল। আমি খুব নিচু গলায় ঠাকুর সাহেবকে বললাম—'ঠাকুরসাব' হামলোক হিঁয়াই খাড়া হোকর

শের কো মোকাবিলা করেগা।' আমার কথা শুনেই দেখলাম ঠাকুরসাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল এবং সংগে সংগে আমাকে বললেন, —'শের বড়া খতরনাক জানোয়র হ্যায়—জঙ্গলকা রাজা। উনকি মোকাবিলা জমিনসে করনা মুসকিল হ্যায়। এইসা কভী নেহী হোনা চাহিয়ে। চলিয়ে হামলোক পেড় পর চঢ়ে।' আমি খুব ধীর স্থির হয়ে বললাম—'হিঁয়া কোই আচ্ছা বড়া পেড় নেহী। আউর পেড় মে কোই পাত্তি নেহী। পেড় মে চড়নেসে শের কো বহুতদূর সে হামলোগনকা উপর নজর আ জায়গা। ঠাকুর সাহেব মাটিতে দাঁড়াতে মোটেই রাজী নয় দেখে, আবার তাঁকে বললাম—'ঠাকুরসাব, আপ যব মেরা পাশমে হ্যায়, তব এক কেঁও দশ শের ভী সামনে আ জায়গা, তভী হাম নেহী ডরেগা।' আমার আব একটা বড় ভয় এবং ভাবনা ছিল, ঠাকুরসাহেবের ·৫০০ এক্সপ্রেস রাইফেলটাকে। আমার যেরকম পাথর চাপা কপাল, তাতে ঠাকুরসাহেব যদি আলাদা কোথাও বসেন, তাহলে বাঘ হয়তো আমার কপাল গুনে ঠাকুরসাহেবের বন্দুকের সামনে এসে পড়বে এবং তিনি তাঁর ·৫০০ এক্সপ্রেসের একটি গুলিতে বাঘের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবেন। আর আমায় তখন বেকুবের মতন তাঁর বাঘ মারার তারিফ করতে হবে। এটা আমার একটা মস্তবড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই আমি চাইছিলুম কোনপ্রকারে ঠাকুরসাহেবকে আমার পেছনে দাঁড় করাতে। আমি তাঁকে বললাম—ঠাকুরসাব আপ মেরা পিছু খাড়া রহিয়ে। অগর মেরা সে কোই গলতি দেখিয়েগা, তো আপকা বন্দুক চালাইয়েগা। আপ যব মেরা পাশ মে হ্যায়, তব মেরা হিম্মত বহুত বাঢ় গিয়া। হাম আভি কিসি সে ডরতা নেহী। এইসব বলে ঠাকুরসাহেবকে কোনরকমে আমার পেছনে দাঁড় করালাম। এমন সময় চম্বল নদীর দিক থেকে ফকরুদ্দীনের গলার আওয়াজ পেলাম—'সাহেবজী হুঁসিয়ার হো জাইয়ে শের যা রহা।' এই কথা শোনা মাত্রই আমি

আমার প্রিয় ·৪০৫ উইংশ্চেস্টার রাইফেলটাকে হাতে তুলে নিলাম এবং সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে বালাজীকে স্মরণ করে বলতে লাগলাম—৺বালাজী, আমাকে একটা বড় বাঘ পাইয়ে দাও, আমি যেন একটা গুলিতে বাঘটাকে শুইয়ে ফেলতে পারি। আমি সামনের শুকনো ঝোপঝাড়গুলোর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে লাগলাম। সেদিন ৫ই মার্চ, রাজস্থানের রোদ আমার চোখ মুখ ঝলসে দিচ্ছিল। চোখে ছিল রঙীন চশমা—মাথার টুপিটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে চশমাটাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করলাম, যাতে চশমার প্রতিফলন বাঘের চোখে না পড়ে। ফকরুদ্দীন আমাকে সাবধান করে দেবার পরও আমার চোখে কোনরকম জন্তু জানোয়ার চলা ফেরার লক্ষণ ধরা পড়ল না। তখন আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলাম, লোকটা বড্ড বেশী কথা বলে। এমন সময় দূরে বেহড়ের একটা চড়াই থেকে কোন একটা জন্তু ছুটে আসছে মনে হোল, কিন্তু সেটা যে বাঘ তা আমি তখন ভালভাবে বুঝতে পারিনি। শুকনো ঝোপ ঝাড়গুলোর পাশ দিয়ে একটা জন্তু যে আমাদের দিকে আসছে সেটা বুঝলাম। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখলাম একটা হলদে রঙের শরীর তাতে কাল কাল ডোরাকাটা দাগ। বাঘটা বিদ্যুতের মত শুকনো ঝোপঝাড়গুলো পেরিয়ে তাদের আড়ালে আড়ালে বেরিয়ে আসছে। সে মুহূর্তে আমার মনে হোল যে বাঘটা যদি কোনরকমে সামনের ওই বড় নালাটাতে নামতে পারে, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে সে কোনদিকে চলে যাবে তার আর কোন হদিশ আমরা পাব না। জীবনে প্রথম সামনে যদি বা বাঘ দেখতে পেলাম সে আবার ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে। পরমুহূর্তে আমি ঠিক করে ফেললাম, যা থাকে কপালে আমাকে এই ছুটন্ত বাঘকেই গুলি করে থামাতে হবে এবং তা সামনের ওই বড় নালাটায় পৌঁছাবার আগেই। আমি রাইফেলটা তুলে বাঘের দৌড়ের সংগে রাইফেলের 'মাছি' মিলিয়ে সামনের

ঝোপঝাড়গুলোর ফাঁকে বাঘটার বিশেষ জায়গা খুঁজছি, দেখি একটা ফাঁকে নালা থেকে ৮।১০ হাত দূরে বাঘটার মাথা ও কাঁধ বিদ্যুতের মতন বেরিয়ে গেল—আমি তৎক্ষণাৎ বালাজীর নাম নিয়ে কিডনীতে গুলি করলাম। বাঘটা গুলি খেয়ে শূন্যে বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে উঠে কোন রকম আওয়াজ না করে সামনের বড় নালাটায় ধপাস করে পড়ে গেল। আমি বুঝলাম গুলি কিডনিতে গিয়ে লেগেছে —তার ফলে বাঘ আরও কতক্ষণ যে বাঁচতে পারে সে সম্বন্ধে আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। মনটা আমার বড্ড খারাপ হয়ে গেল। ২০ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যদিও বা বাঘকে গুলি করতে পারলাম, কিন্তু এক গুলিতে তাকে শেষ করতে পারলাম না। মনে মনে ভগবানকে বললাম—ভগবান এ কি করলে? বাঘ বেচারা এখনও বেঁচে আছে এবং কত না কষ্ট পাচ্ছে! মাথার মধ্যে যখন নানা ভাবনা চিন্তা চলছে, সে সময় 'ভেক্সিনেটার,' ফকরুদ্দীন ও রাজস্থানী লোকটা আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—'সাহেবজী শের তো আয়া থা, একই বন্দুককা আওয়াজ মিলা—তো ক্যা শের ভাগ গিয়া?' আমি ওদের বললাম—'নেহী শের উও নালা পর পড়া হ্যায়।' এরা সকলেই বলে উঠল—'এক গোলি মে কভী এতনা বড়া শের মারা যাতা?' আমি ওদেরকে বললাম—'ইয়ে রাইফেল কা গোলি হ্যায়—যেতনা ভী বড়া শের হো এক গোলি কাফী হ্যায়। লেকিন ইয়ে শের দৌড়কে যা রহা থা।' নিজের কিড্‌নিটা দেখিয়ে বললাম—'হামকো ইস জায়গা কা নিশানা মিলা। হামারা গোলি শের কা ইস জায়গা মে বৈঠা। শের সায়েদ আভীতক জিন্দা হো সকতা। তুম সবলোক ঠাকুর-সাহাব কা পাশ খাড়া রহো। হিঁয়া সে এক কদম হিলো নেহী। হাম নালা পর যা কর দেখকে আতা হ্যায়'—এই বলে ওদের বারবার সাবধান করে আমি নালার দিকে কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় দূর থেকে ডাক্তার সাহেবের গলা পেলাম। তিনি চেঁচিয়ে

আমাকে বললেন—'দাঁড়ান, আমি আসছি, বাঘ ওখানে নেই। আমি এসে আপনাকে সব বলছি।' কথাটা শুনেই আমার মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল। আমি তাকে চেঁচিয়ে বললাম— আপনি তাড়াতাড়ি আসুন ডাক্তার সাহেব। ওনার আসতে যে কয়েক মিনিট দেরী হোল তার মধ্যে আমার মনে নানান দুশ্চিন্তা হতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, এবার আমাকে গুলি খাওয়া বাঘের পিছু নিতে হবে। অভিজ্ঞ শিকারীদের বই পড়ে আমি যা বুঝেছি, তাতে আহত বাঘের পিছু নেওয়া বড্ড কঠিন কাজ বলে সবাই লিখেছেন। কিন্তু সংগে সংগে আমি মনস্থির করে ফেললাম যে, কাজটা যত কঠিনই হোক না—আমাকে করতে হবে, কারণ এটাই আমার প্রথম বাঘ শিকার। এত বছর চেষ্টা করার পর বাঘ আমি পেয়েছি, কোনমতেই একে হাতছাড়া হতে দেব না। এতে হয় বাঘ আমাকে মারুক নয় আমিই বাঘকে মারবো—এর মধ্যে বিকল্প আর কিছু ভাবার নেই। ৺বালাজীকে স্মরণ করে বললাম—বাবা বালাজী শেষ পর্যন্ত বাঘ একটা দিলে কিন্তু তাও কি আমি মারতে পারবো না? এটা কি করলে বাবা? বন্ধুবান্ধবদের কাছে এমুখ আর আমি কি করে দেখাব? ইতিমধ্যে দেখি ডাক্তার সাহেব হাতে একপাটি জুতো এবং পায়ে একপাটি পরে ছুটে আমার দিকে আসছেন। পেছনে মহারাজ আমার ১২ বোরের বন্দুকটা হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। ডাক্তার সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াতেই আমি অধীর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—বলুন ডাক্তার সাহেব! আপনি কী দেখেছেন? তিনি একটু দম নিয়ে আমাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—"ওই দূরে একটা গাছে আমি ও মহারাজ বসেছিলাম। গাছে চড়ার অভ্যাস না থাকায় আমি জুতো খুলে অতিকষ্টে গাছে চড়ি, সেই সময় বন্দুক থেকে গুলি দুটো বার করে আমি খালি বন্দুক মহারাজের হাতে দিই। গাছে চড়ার পর আমার মনে পড়ল, অনেকে নাকি বাঘ দেখলে অজ্ঞান হয়ে যায়—আমিও যদি তাই হই—এই ভয়ে আমি

দু'টা ডালের মধ্যে এমন করে দুপাশে পা দিয়ে ঘোড়া চড়ার মতন বসলাম সামনের ডাল দুটোকে জড়িয়ে যাতে বাঘ দেখে যদি অজ্ঞানও হয়ে যাই তাহলেও নিচে বাঘের মুখে না পড়ে গাছেতেই যেন আটকা থাকি কোনরকমে"। চরম উত্তেজনার মুখে এইসব কথাবার্তা আমার তখন মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তা ত হোল—এখন আমাকে তাড়াতাড়ি বলুন বাঘটা কোথায়? তিনি একটু দম নিয়ে বললেন—'আমরা গাছ থেকে প্রথমে বাঘকে দেখিনি। আপনি গুলি করার পর বাঘ যখন শূন্যে লাফ দিল তারপর দেখলাম বাঘটা গুলি খেয়ে শূন্যেই ঘুরতে ঘুরতে নালার মধ্যে পড়ল। কিছুক্ষণ তার কোন নড়াচড়া দেখতে পেলুম না। তারপর দেখলুম বাঘটা একটু নড়ে চড়ে ওঠার চেষ্টা করছে। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর বাঘটা উঠে দাঁড়াল কোনরকমে, তারপর টলতে টলতে পড় পড় অবস্থায় নালা দিয়ে খানিক এগিয়ে ডান হাতি উপরের শুকনো কাঁটার ঝোপের দিকে তার শরীরটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে গেল।' আমি সব শুনে বললাম—তার মানে আমাকে এখনই আহত বাঘের অনুসরণ করতে হবে। ডাক্তার সাহেব শুনে প্রায় ফ্যাকাসে হয়ে বললেন—'সে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার—প্রাণ নিয়ে খেলা!' আমাকে তাঁর ফিরাবার অনুরোধ বিফল হওয়ায় জানালেন—'তাহলে আমি আর মহারাজ এখান থেকে এগুই কি বলেন?' আমি বললাম তাই করুন। আমার বলার সংগে সংগে ডাক্তার সাহেব ও মহারাজ ছুটে পালাল। তখন আমি আবার ঠাকুর সাহেবকে ও বাকী লোকেদের বললাম—'শের আভীতক জিন্দা হ্যায়—আপলোক সব এঁহি পর খাড়া রহিয়ে। হাম যবতক ওয়াপশ নেহী আয়ে, আপলোক ইহাঁসে হিলিয়ে নেহী। জখমী শের সে আপনা কোই আদমী জখম হুয়া কি মর গিয়া ইয়ে হাম নেহী মাংতা। যো কুছ ভী হো হামারা উপর হোনে দিজিয়ে।' সকলেই ঘাড় নাড়ল। ঠাকুর সাহেবের জিম্মায় সকলকে রেখে আমি রাইফেল নিয়ে নালার দিকে এগুলাম।

মনে মনে ঠিক করলাম, নালা থেকে বাঘটার রক্তের দাগ দেখে সবদিকে চোখ রেখে আমি সাবধানে এগুব। এই ভেবে আমি একলা নালাটিতে নামলাম এবং যেখানে বাঘটা গুলি খেয়ে পড়েছিল সেখানে গিয়ে আশেপাশের জমিটা পরীক্ষা করে বুঝলাম এটা সেই অল্পবয়সী মদ্দা বাঘ, যেটা প্রথমদিন বলদটাকে মেরেছিল এবং বেহড়ের চূড়ো থেকে ক্ষণেকের জন্যে আমাদের দেখা দিয়ে বোকা বানিয়ে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল। নালার মধ্যে রক্তের দাগ ও পায়ের ছাপ ধরে আমি খুব সাবধানে এগুতে লাগলাম। কয়েকপা যেতেই দেখলাম বাঘটা একটা ঢালু জমি ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করার সময় কয়েকবার পড়ে গেছে বা বসেছে। ধুলো বালিতে তার দাগ দেখতে পেলাম। খুব সাবধানে সেই ঢালু জমিটা ধরে কয়েক পা ওপরে উঠেই দেখলাম সামনে একটা খুব বড় শুকনো কাঁটার ঝোপ এবং সেই কাঁটা ঝোপের মধ্যে মাটি থেকে ফুট দুই উঁচু একটা সুড়ঙ্গ পথের মতন নজরে পড়ল। দেখলুম বাঘের পায়ের দাগ ও রক্তের দাগ সেই সুড়ঙ্গ পথ ধরে কাঁটা ঝোপের ভেতরে চলে গেছে। এই কাঁটা ঝাড়ের জঙ্গলটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে আছে। সুড়ঙ্গ পথের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছি এরপর কি করা যায়। সুড়ঙ্গের মধ্যে আহত বাঘকে অনুসরণ করতে যাওয়া মানেই যমের মুখে যাওয়া। এইসব যখন ভাবছি, তখন সুড়ঙ্গ পথে বাঘের পায়ের দাগের আশেপাশে জংলী শুয়োরের পায়ের দাগও আমার নজরে পড়ল। তখন আস্তে আস্তে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে গেল। রোদ্দুর থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে জংলী শুয়োরগুলো এই কাঁটা ঝাড়ের জঙ্গলটা ব্যবহার করে দিনের বেলায়। রোজ রোজ এর মধ্যে গিয়ে গিয়ে তারা একটা পাকা সুড়ঙ্গপথ করে ফেলেছে। যদিও বাঘ সাধারণতঃ খুব সাবধানী ও সুখী জানোয়ার কিন্তু আজ বিপদে পড়ে বেচারা বাঘ প্রাণের দায়ে এই কাঁটাঝাড়ের ভিতর গিয়ে ঢুকেছে। এমনিতে বাঘ কাঁটাকে খুব ভয় করে এবং

জঙ্গলে ঘোরাফেরার সময় তাদের পায়ের থাবাগুলো কাঁটা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। বর্ষার সময় যে সব জায়গাতে চোরকাঁটা হয় বাঘ সেই সব জায়গায় যেতে চায় না। কিন্তু জংলী শুয়োরের বেলায় এই সবের কোন বালাই নেই। তারা কাঁটাঝাড় খুব ভালবাসে এবং অনেক সময় দেখা যায়, তারা শুকনো গাছের গুঁড়িতে বা কাঁটাঝাড়ে তাদের শরীরগুলো জোরে জোরে ঘসছে। মুহূর্তমধ্যেই ঠিক করে ফেললাম, এই সুড়ঙ্গপথে ঢুকেই আমি বাঘের পিছু নেব, এতে যা হয় হোক। আমি সাবধানে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে টিকটিকির মত যদ্দূর সম্ভব নিঃশব্দে এগুতে লাগলাম। প্রতি ইঞ্চিতে আমার জামা, প্যাণ্ট ও টুপি কাঁটায় আটকাতে লাগল। নিঃশব্দে কাঁটাগুলো ছাড়িয়ে সামনে নজর রেখে সেই বিপজ্জনক সুড়ঙ্গ পথে প্রাণ হাতে নিয়ে আমি এগুতে লাগলাম। এইভাবে সুড়ঙ্গের মধ্যে এঁকে বেঁকে প্রায় একশ গজ যাবার পর হেঁচকি ওঠার আওয়াজ পেলাম। তখন বুঝলাম আমার খুব কাছেই বাঘ আছে এবং তা বাঘেরই হেঁচকি; যখন হেঁচকি তুলছে তখন আর খুব বেশীক্ষণ বাঁচবে না। ওখানে কয়েক সেকেণ্ড থেমে আমি আবার সাবধানে গুটিগুটি এগুতে লাগলাম। সামনে শুকনো কাঁটার ঝাড়গুলো এত ঘন যে, আশেপাশে কি আছে কিছুই নজর করা সম্ভব নয়। এইভাবে আরেকটু এগুবার পর একটা মোড় ঘুরতেই বাঘটার মুখ ও মাথাটা আমার নজরে পড়ল। বাঘের শরীরের আর কোনও অংশ আমি দেখতে পেলুম না। দেখলাম বাঘটা চোখ বন্ধ করে হাঁ করে হেঁচকি তুলছে এবং সেই হেঁচকি তোলার তালে তালে তার মাথাটা উঠছে আর নামছে। তখন আমার আর বাঘটার দূরত্ব ৮।১০ হাতের বেশী হবে না। বাঘটাকে দেখার সংগে সংগে আমি একটা শেষ গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছিলাম কিন্তু কোথায় গুলি করবো? এত কাছ থেকে যদি মুখ ও মাথাটাতে গুলি ছুঁড়ি তাহলে আমার '৪০৫ রাইফেলের ৩০০ গ্রেণের গুলিতে বাঘটার মাথার খুলির আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না—মাথাটা একেবারেই

গুঁড়িয়ে যাবে। এইসব নানান চিন্তা করছি—রাইফেলটা নিশানায় ধরাই আছে একটু বিপদ বুঝলেই আমি ঘোড়া টিপে দেব কিন্তু পরমুহূর্তে বাঘটার অবস্থা দেখে যা মনে হোল, তাতে বুঝলাম এমনিতেই সে ২।৪ মিনিটের মধ্যে মরে যাবে। তাই ঠিক করলাম আর গুলি করবো না—তেমন দরকার না পড়লে। আমার সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে আমি বাঘটার দিকে চেয়ে আছি এবং তার গতিবিধি লক্ষ্য করছি, এমন সময় পেছন থেকে কাঁটাঝাড়ের সুড়ঙ্গ পথে সড় সড়, সড় সড় আওয়াজ আমার কানে এল। আমি মাথা ঘুরিয়ে পেছনে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। কারণ গুলি খাওয়া বাঘ সামনে, তাহলে পেছনে আবার ওটা কি আসছে? আরেকটা বাঘ নাকি? না বুনো শুয়োর আসছে দিনের বেলায় ঠাণ্ডা জায়গায় শুতে? আমি কিছুই ঠাওর করতে পারছি না। শব্দ বুঝে হঠাৎ মনে হোল ঠাকুর-সাহেব নয় তো? আমাদের ঠাকুরসাহেব চম্বলের একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত এ খবর আমি পরে ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারি। এর পরিচয় আমি পরে দেব। দেখি, হঠাৎ একটা মস্ত পাগড়ীওয়ালা মাথা আমার ঘাড়ের কাছে এসে পড়ল এবং কানের কাছে মুখ এনে খুব নিচু গলায় তিনি আমাকে বললেন —'গোলি মাত করিয়ে—শের মর রহা'। আমি আমার মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিলাম এবং মনে মনে ভাবলাম ঠাকুর সাহেবের আসার কারণ কি? মনে করলাম তিনি নিশ্চয়ই তাঁর নিজের লোকেদের কাছে এবং কিছুটা আমার কাছেও ছোট হয়ে যাচ্ছিলেন। ঠাকুরসাহেব আমাকে বলেছিলেন যে তিনি অনেকগুলো বাঘ মেরেছেন, কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘের মোকাবিলা করতে তিনি নারাজ হলেন এবং যখন আহত বাঘকে খুঁজে বার করে মারার দরকার হোল, তখনও তিনি সাহস করতে পারলেন না—এতে তার মাথা বোধহয় একটু নিচু হয়ে যাচ্ছিল আমার কাছে, এবং তার নিজের লোকেদের কাছেও। তাই

তিনি অনেক ভেবেচিন্তে অনেক পরে আমার খোঁজে বার হন। এদিকে ঠাকুর সাহেব চলে আসার পর তাঁর লোকেরা নিশ্চয়ই ভাবছিল ঠাকুর সাহেব আমাদের এতবড় ডাকাতের সর্দার, যখন সে একাই চলে গেল গুলি খাওয়া বাঘের সন্ধানে—আর তারা—তাঁর চেলা হয়ে ওখানে বেকুবের মতন কি করে দাঁড়িয়ে থাকে? এদের মধ্যে একজনের হাতে বন্দুক ছিল, সে রাখালকে নিয়ে কাঁটাঝাড়ের অপরদিক থেকে খুব সাবধানে এগিয়ে এ'ল। এ খবর আমি ও ঠাকুর সাহেব কেউই জানি না। আমি'ত বাঘের ওপর শ্যেনদৃষ্টি রেখে বন্দুক ধরে রয়েছি, একটু নড়চড়া দেখলেই গুলি করবো কিন্তু ভাবছি আর বেশিক্ষণ নয়, এবার বাঘের মাথাটা ঢলে পড়বে। এমন সময় ঠাকুর সাহেবের চেলারা কাঁটাঝাড়ের অপর দিক থেকে বাঘটাকে দেখেই চীৎকার করতে শুরু করল—'সাহেবজী মারিয়ে মারিয়ে—ওই শের পড়া হ্যায়। আভি ভী শ্বাস লে রহা হ্যায়।' হঠাৎ এই চীৎকারে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম এবং ভাবলাম এখন কি করা যায়? যদি বাঘটা মরার আগে একটা লাফ দিয়ে একজনকে থাবা মারে, তাহলে আমার দফা শেষ। কোর্ট পুলিশ ইত্যাদি নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমি পড়ে যাব। তাই মুহূর্তের মধ্যেই ঠিক করে ফেললাম, বাঘটা হেঁচকি নেবার সময় মুখ খুললেই আমি ওর মুখের মধ্যে একটা গুলি মারব। এছাড়া আমার আর অন্য উপায় নেই। পর মুহূর্তেই বাঘটা নিঃশ্বাস নেবার জন্য মুখ খুলতেই আমি আমার '৪০৫-এর একটা গুলি তার মুখের মধ্যে মারলাম, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি ভীষণ চেঁচিয়ে লোকগুলোকে বকে উঠলাম তাদের ওখানে এসে চীৎকার করার জন্য, তারা তখন দাঁত বার করে হাসতে হাসতে আমাকে বলল—'হামলোগকা ঠাকুরসাব যব শের কা পিছু চলা আয়া, তব হামলোক ক্যায়সা খাড়া হোকর তামাসা দেখ স্তেকতা। ইয়ে কভী হো নেহী স্তেকতা।' আমি দেখলাম ওদের সংগে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি ওদের বললাম, ওদের কাছে টাঙ্গী,

কুড়ুল যা আছে, তাড়াতাড়ি তাই নিয়ে এসে আমাদের চারপাশের কাঁটাঝাড় কেটে দিতে এবং একটা রাস্তার মত করতে, যাতে বাঘটাকে স্বচ্ছন্দে বার করে আনা যায়। ওদের সংগে টাঙ্গী ছিল তাই দিয়েই ওরা কাঁটাঝাড়গুলো কাটতে লাগল। কাটা হলে আমি ও ঠাকুর সাহেব উঠে বাঘটার কাছে গেলাম, আমার প্রথম গুলি যেখানে নিশানা নিয়েছিলাম সেখানে লেগেছে কিনা দেখবার জন্যে। বাঘটার কাছে গিয়ে দেখি আমার লক্ষ্যস্থলেই গুলি লেগেছে। আমি মনে মনে খুবই খুশী হলাম এবং দ্বিতীয় গুলি বাঘের মুখ ও মাথার কি অবস্থা করেছে পরীক্ষা করার জন্যে বাঘটার মাথার কাছে এলাম। দেখলাম বালাজী আমার প্রার্থনা রেখেছেন। এত কাছ থেকে মারা সত্ত্বেও আমার দ্বিতীয় গুলি বাঘের মুখের মধ্যে দিয়ে ঢুকে শরীরের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। শুধু বাঁদিকের নিচের চোয়ালটার হাড় ভেঙ্গে গেছে বলে মনে হলো, কিন্তু বাইরের চামড়ার কোন ক্ষতি হয়নি দেখলাম। আমি যখন বাঘটাকে পরীক্ষা করছিলাম, ঠাকুর সাহেব তখন আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরীক্ষা শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়েই আমি ঠাকুর সাহেবের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরলাম এবং তাঁকে বললাম—'সব আপকি দয়া সে ঠাকুর সাব।' তিনি একটু হেসে পাল্টায় বললেন—'সব গঙ্গা মায়ী কি দয়াসে।' তারপর বললেন—'চলিয়ে, হামলোগ বাহার যায়ে। এহি লোক সব বন্দোবস্ত করেগা।' আমি ঠাকুর সাহেবকে বললাম—'আপ এ লোগন কো বোলিয়ে পহেলে ঝাড়ি কাটকে রাস্তা বানায় গা, উসকী বাদ হাম খুদ খাড়া হোকর শেরকা উঠানে কো বন্দোবস্ত করে গা।' এই বলে আমি ও ঠাকুর সাহেব কাঁটা ঝাড়ের বাইরে এসে দেখি, সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। আমরা দুজনে একটা ছায়ামতন জায়গা দেখে বসে পড়লাম। ঠাকুর সাহেবের হুকুমে আরও কয়েকজন রাজস্থানী লোক এসে পৌছল। তারাও কাঁটাঝাড় সাফ করতে লেগে গেল। খানিক পরে ফকরুদ্দীন এসে বলল—'সাহেবজী ঝাড়ি কাটকে রাস্তা বনালিঁয়া'। এই কথা শুনে আমরা

উঠে গেলাম দেখতে এবং ফকরুদ্দীনকে বললাম—'আব হামকো দো ঠো মজবুত বাঁশ নেহিতো লকৃড়ী কা রোলা চাহিয়ে—আউর জঙ্গলকা রশি—বাঁধনেকো বাস্তে।' ওরা কিছুক্ষণের মধ্যে ৮।৯ হাত লম্বা তুটো মজবুতগাছেরডাল কেটে আনল এবং সংগে কিছু জঙ্গলের লতার রশি। আমি বাঘটার সামনের পাতুটো ও পেছনের পাতুটো আলাদা আলাদা করে বাঁধলাম এবং তুটোর ভেতরে একটা করে রোলা ঢুকিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে ঠাকুর সাহেবের হুকুমে আমাদের আরও ৮।১০ জন লোক হয়ে গেছে, লক্ষ্য করলাম সকলেরই কাঁধে একটা করে বন্দুক! সামনের দিকে কিছু লোক বেশী রেখে ভাগাভাগি করে তাদের একবার বাঘটাকে তুলতে বললাম—কিন্তু দেখলাম মাথার দিকটা ঝুলে মাটিতে ঠেকে যাচ্ছে। তখন আরও খানিকটা রশি দিয়ে বাঘের মাথাটা ঘাড়ের কাছ থেকে বেঁধে সামনের পাতুটোর সংগে টানা দিয়ে বাঁধলাম এবং সেইভাবে লেজটাকেও টানা দিয়ে পেছনের পাতুটোর সংগে বাঁধা হল। তারপর আমরা রওনা হলাম ঠাকুর সাহেবের গড়ের দিকে।

বেহড় থেকে গড় পর্যন্ত একটা বাঘকে আনতে ৮।১০ জন লোককেও বেশ বেগ পেতে হোল। কয়েক পা করে গিয়ে তারা বাঘটাকে মাটিতে নামাচ্ছিল। আমার খালি ভয় হচ্ছিল চামড়াটার কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু আর বাড়তি লোক পাওয়া সম্ভব হয়নি বলে ওইভাবেই চলে আসতে হোল। এইভাবে সন্ধ্যার কিছু আগে আমরা গড়ের দরজা থেকে কিছু নিচে বাঘটাকে নামিয়ে রেখে আমি তাড়াতাড়ি গড়ের মধ্যে ছুটে গিয়ে আমার ক্যামেরাটা নিয়ে এলাম এবং কয়েকখানা ছবি তুললাম। ছবি তোলা আমার মোটেই আসে না। আমার ধার করা এরোফ্লেক্স ক্যামেরায় ভালই ছবি ওঠার কথা কিন্তু পরে বুঝলাম আমার হাতের দোষে ছবিগুলো মোটেই ভাল ওঠেনি। বাঘটাকে নিয়ে গড়ে ওঠার পর, আমার সামনে আর এক বিরাট সমস্যা দেখা দিল। সেটা হোল ছাল ছাড়ান। কিছুক্ষণের

মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। ভাল আলোর ব্যবস্থা না থাকলে রাত্রে ছাল ছাড়ান অসম্ভব। অন্ততঃ গোটা দুই ভাল পেট্রোম্যাক্স বাতি থাকলে সাহস করা যেত। গড়ে আলোর যে কি চমৎকার ব্যবস্থা তা সেদিনই আমার প্রথম দেখার সৌভাগ্য হোল, কারণ এ পর্যন্ত প্রতি রাত্রেই ত আমি মাচানে কাটিয়েছি। দেখলাম ডাক্তার সাহেব ঠাকুর সাহেবের কাছ থেকে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জোগাড় করেছেন। কিন্তু হ্যারিকেনটির চেহারা দেখে মনে হোল, বহুকাল পর তিনি জ্বলে গড়ের মধ্যে তাঁর রূপের ছটা ছড়িয়েছেন। হ্যারিকেনটির কাঁচটা ওপরদিকে অনেকখানি ভাঙ্গা এবং অনেক জায়গা দিয়ে তেল চোয়াচ্ছে। ডাক্তার সাহেব আবার অনেক কসরৎ করে ধার করা আটা থেকে সে সব জায়গায় পুলটিশ মেরেছেন। হারিকেনটা আলোর থেকে ধোঁয়াই বেশী ছাড়ছে; তাই ওটাকে ভরসা করে ছাল ছাড়ানো অসম্ভব বলে মনে হোল। গড়ের দবজা থেকে কয়েক ধাপ নামলেই একটা মাঝারি মাপের নিমগাছ চোখে পড়ে, যার তলায় পাথর দিয়ে একটা চোবুত্রা মতন করা ছিল। আমি ঠাকুব সাহেবকে বললাম—'আজ শেরকা খাল উতার নেহী স্যাকতা—আভী তো আঁধেরা হো গিয়া। শেরকো হাম ইয়ে নিমপেড় কো নিচে রাত কে লিয়ে রাখ স্যেকতা?' ঠাকুর সাহেব সম্মতি জানাতে আমি লোকজন নিয়ে বাঘটাকে খুব সাবধানে তুলে নিমগাছের তলায় পাথরের চোবুত্রায় রাখলাম। তারপর একটা খাটিয়া আনিয়ে সেখানে বসলাম পাহারায়—যাতে রাত্রে কুকুর, শেয়াল বা হায়না এসে বাঘের চামড়া কেটে নষ্ট না করে। বাঘ বা কোন জন্তু মারার সংগে সংগে চামড়া ছাড়াতে পারলে ভাল, দেরী করলে চামড়া শক্ত হয়ে যায়, মরা জন্তুটা থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ বার হয় এবং বেশী দেরী করলে চামড়ায় পচও ধরতে পারে। তাই সব শিকারীর এইদিকে খুব নজর দেওয়া উচিত—নিজের কুঁড়েমি বা গাফিলতির জন্যে একটা দামী 'ট্রফী' নষ্ট করা মোটেই

উচিত নয়। আমি বলব, যে শিকারী এই দিকটায় নজর দিতে না পারেন, তার একটা জন্তুকে গুলি করে মারার কোন অধিকার নেই। প্রত্যেক শিকারীর সংগে ভ্যান ইনজেন এ্যাণ্ড ভ্যান ইনজেনের 'প্রিসারভেসান অফ শিকার ট্রফিস' বইখানা থাকা উচিত। চামড়া ছাড়ানোর পর প্রথম পর্বে চামড়ার যত্ন নেওয়া খুবই প্রয়োজন। আমি অনেক শিকারীকে দেখেছি, তাদের সুন্দর সুন্দর ট্রফি, ঠিক সময়মত ঠিকভাবে চামড়া না ছাড়ানর জন্য এবং চামড়ার যথাযথ প্রাথমিক যত্ন না নেওয়ার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। রাত্রে আমি ও ডাক্তারসাহেব একের পর এক, মহারাজের রান্না রাজভোগ খেয়ে এসে নিমগাছ তলায় বসলাম। অন্ধকার নিশুতি রাতে বসে বসে আমাদের মধ্যে অনেক গল্প হোল। ডাক্তার সাহেব সেই প্রথম আমায় নিচু গলায় বললেন—'জানেন আমরা কার অতিথি ?' আমি বললাম—কেন, ঠাকুর সাহেবের। পাল্টায় তিনি বললেন—'কিন্তু এই ঠাকুর সাহেব কে জানেন ?—ইনি চম্বলের একজন খুব বিখ্যাত ডাকাত।' আমি ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি করে জানলেন ?' তিনি বলতে থাকলেন—আপনার মনে আছে, প্রথমদিন আপনি যখন বাঘের বলদ মারার খবর পেয়ে বেহড়ে চলে গেলেন, আর আমাকে বলে গেলেন গরুরগাড়ী দুটো নিয়ে বাগোরায় গিয়ে ঠাকুর সাহেবের খোঁজ করে থাকার ব্যবস্থা করতে, তখন আমি এগিয়ে গিয়ে বাগোরা গ্রামের এক টিলার নিচে এসে মালপত্র রেখে আমিও মহারাজ টিলার ওপরে যেতে গিয়ে একটা বাঁক ঘুরে দেখি কাঁধে বন্দুক নিয়ে ৩০।৩৫ জন লোক, একজন মস্ত পাগড়ীওয়ালা লোকের কাছ থেকে খুব উৎসাহের সংগে মন দিয়ে কি যেন শুনছে। মনে হল আসন্ন কোন দুষ্কার্য্য তদারকির ব্যাপার। পাগড়ীওয়ালা লোকটা আমাকে ও মহারাজকে ওখানে হঠাৎ দেখে খুব যেন অবাক হোল।' সে খুব গম্ভীরভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—'কি চাই ? কাকে চাই ?' আমি তখন তাকে হাত জোড় করে নমস্কার করে নিজের পরিচয়

দিলাম—বললাম আমি ৪।৫ বছর আগে খাণ্ডার হাসপাতালের ডাক্তার ছিলাম—উপস্থিত বদলী হয়ে কোটা হাসপাতালে রয়েছি। এখানে আসার উদ্দেশ্য, আমি আমার এক বন্ধুকে এনেছি বাঘ শিকারের জন্য। আমি বাগোরার ঠাকুরসাহেবকে খুঁজছি। তিনি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাতে আমি মনে মনে বুঝলাম তিনি আমাদের ওই সময় ওখানে যাওয়াটা মোটেই পছন্দ করছেন না। তিনি তখন একটা ইশারা করতেই দেখলাম ওই ৩০।৩৫ জন লোক নিমেষের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! তখন আমি হালুইকরের দেওয়া চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম এবং বললাম, চিঠিখানা আমাকে খাণ্ডারের হালুইকর দিয়েছে এখানকার ঠাকুর সাহেবকে দেবার জন্যে। তিনি তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পড়লেন এবং গম্ভীরভাবে বললেন যে, তিনিই বাগোরার ঠাকুর সাহেব। শুনে আমি তাড়াতাড়ি তাঁর হাত দুখানা জড়িয়ে ধরলাম। তাতে তিনি একটু নরম হলেন বলে মনে হোল। আমাদের মালপত্র কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করাতে আমি বললাম, নিচে গরুর গাড়ীতে আছে। তিনি আমার সংগে নিচে নেমে এলেন এবং তাঁর কয়েকজন লোককে দিয়ে আমাদের সব মালপত্র ওপরে উঠিয়ে ওই গড়ের মধ্যে রাখালেন। তারপর মহারাজ ও 'ভেক্সিনেটারের' কাছ থেকে আমি ঠাকুর সাহেবের অন্যান্য খবরও পেলাম। ওখানকার লোকেরা অবাক—'ঠাকুর সাহেবের ভয়ে ওখানকার কোন পুলিশ পর্যন্ত আসতে সাহস করে না—আমরা কোন সাহসে এলাম'! আমি সব শুনে বললাম—ঠাকুর সাহেব যখন আমাদের তাঁর মেহমান করে নিয়েছেন, তখন আমাদের আর কোন ভয় নেই। আমি শুনেছি, এইসব চম্বলের ডাকাতরা যদি একবার কাউকে বন্ধু বলে স্বীকার করে, তাহলে তাঁরা বন্ধুর কোন অপকার তো করেই না, উপরন্তু দরকার পড়লে বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতেও পিছপাও হয় না। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার পর

আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম—আপনি গড়ের মধ্যে গিয়ে আপনার বিছানায় শুয়ে পড়ুন, দুজনে কষ্ট করে কোন লাভ নেই। তিনি প্রথমে আমাকে একলা ফেলে যেতে রাজী হচ্ছিলেন না। আমি তখন তাঁকে বললাম—আপনার এক জরুরী কাজ আছে সকালে উঠে করার জন্য। 'কি কাজ' জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম—ডাক্তারী বা সার্জারী। কাল সকালে খুব তাড়াতাড়ি উঠে, চা খেয়েই আপনি আমার বাঘের চামড়া কেটে বার করবেন। আপনাকে আমি একটা বই ও চামড়া ছাড়াবার জন্যে যাবতীয় ছুরি দেব। বইটিতে বাঘের চামড়া কি ভাবে ছাড়ান উচিত সব ছবিসহ লেখা আছে—প্রত্যেকটি জায়গা যথা—মুখ, কান, চোখ, পায়ের থাবা, নখ, ইত্যাদি কেমন করে ছাড়াতে হয় সব দেওয়া আছে এবং ছাড়াবার পর চামড়ার যে প্রাথমিক যত্ন নিতে হয় তাও লেখা আছে। কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন সার্জারীর, সামান্য একটু ভুল ক্রটিতে 'ট্রফি' নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তিনি শুনে বললেন—'আমাকে খুব ভাল কাজ দিয়েছেন—এই ধরনের কাজ আমার খুব ভাল লাগে।' এই বলে ডাক্তার সাহেব শুতে গেলেন আর আমি একা বসে রইলাম বাঘের পাহারায়।

সারারাত একা একা বসে থাকতে থাকতে আমার মাথায় নানা রকম ভাবনা এল। প্রথম এ'ল কাঁটা ঝাড়ের মধ্যে আহত বাঘটাকে অনুসরণ করার ব্যাপার নিয়ে। সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করে বুঝলাম আমি কি ভীষণ বেকুবের মত কাজ করেছি। অনেক বই পড়া বিদ্যের কোনটাই সময়মত কাজে লাগাতে পারলাম না। বালাজী আমাকে এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমার উচিত ছিল অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা পরে আহত বাঘটাকে অনুসরণ করা। বাঘ যখন গুলি খেয়ে জখম হয় এবং সামনে যদি শিকারী বা লোকজন দেখতে না পায়, তখন তার প্রথম কাজ হল নিজেকে একটা নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে ফেলা এবং সেখানে চুপ করে বসে থাকা। শিকারী বা অন্য

কেউ তখন সেখানে এসে পড়লে বাঘ নিমেষের মধ্যে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিশোধ নিয়ে ক্ষান্ত হয়। এই সব ক্ষেত্রে যদি ২।৩ ঘণ্টা পরে শিকারী বাঘের সন্ধানে বার হয়, তাহলে এই সময়ের মধ্যে তার ক্ষত থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষয় হয়ে তাকে নির্জীব ও দুর্বল করে ফেলে ; তখন সে প্রতিশোধ নেবার বদলে গর্জন করে শিকারীকে শুধু সাবধান করতে থাকে। তাতে শিকারীর খুবই সুবিধা হয় এবং অনেক দূর থেকেই সে বুঝতে পারে বাঘটা কোনখানে আছে—ফলে শিকারী সাবধানে দূর থেকে বাঘকে গুলি করার সুযোগ পায়। ক্ষত অল্প হলে সে খানিকক্ষণের মধ্যেই শিকারীর চোখের আড়ালে বহুদূর চলে যায়। তখন আর শিকারীর ওই বাঘকে পাবার কোন আশা থাকে না। তাই সব অভিজ্ঞ শিকারীই লিখেছেন যে, বাঘ গুলি খেয়ে জখম হ'লে অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা নিঃশব্দে অপেক্ষা করা উচিত এবং তারপর মোষ বা শিকারী কুকুর নিয়ে শিকারীর নিজের যাওয়া উচিত বাঘের সন্ধানে। কখনও কোন লোক সংগে নেওয়া উচিত নয়। অনেক সময় দেখা গেছে, লোকের ভুলের জন্যে শিকারী নিজের প্রাণ হারিয়েছেন বা তাঁর অনুচরেরা প্রাণ হারিয়েছে। আর চিন্তা হতে লাগল ঠাকুর সাহেবকে নিয়ে। যদিও প্রথম দিন তাঁর চীৎকারের ফলে আমি বাঘ মারতে পারিনি কিন্তু তা ছাড়া এ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি, তা নেহাতই আশাতীত। এখন শেষ পর্বে ভালয় ভালয় কাজ মিটিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলেই জানব, ভগবান আমাদের এযাত্রায় রক্ষা করলেন। এই সব নানান ভাবনা ভাবতে ভাবতে রাত কেটে গেল। ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে আমি গড়ের মধ্যে গিয়ে জনতা স্টোভে চা চাপালাম এবং ডাক্তার সাহেবকে ডেকে তুললাম। চা খেয়ে খুব ভোরে ভোরেই আমরা চামড়া ছাড়াবার কাজে লেগে গেলাম। ভোরের আলোতে আমি আরও কয়েকখানা ছবি তুলে নিলাম।

ডাক্তার সাহেবকে ভ্যানইনজেন এ্যাণ্ড ভ্যানইনজেনের বইটা

দিয়ে ছাল ছাড়ানর-ছুরিগুলোও দিলাম। ডাক্তার সাহেব সব বুঝে নিয়ে খুব মন দিয়ে ছাল ছাড়ানর কাজে লেগে গেলেন। বেলা ১১টার মধ্যে ছাল ছাড়াবার কাজ সব শেষ হয়ে গেল। তারপর একটা মাটির হাঁড়িতে আমরা বাঘের মাথাটা অল্প কাঠের জ্বালে সেদ্ধ করে খুলি এবং চোয়াল থেকে মাংসগুলো ছাড়িয়ে, আমাদের রান্নার জন্যে যা নুন ছিল, তাই দিয়ে চামড়ার ভেতর দিকে খুব ঘসে ঘসে লাগালাম। নিয়ম হচ্ছে একভাগ নুন ও তিনভাগ ফটকিরি খুব ভাল করে গুঁড়িয়ে চামড়ার ভেতর দিকে লাগাতে হয়। থাবাগুলো, মুখ, চোখ ও কান এই কয়েক জায়গাতে খুব ভাল করে মাখাতে হয়। আমরা যখন বাঘের চামড়া ছাড়াতে ব্যস্ত, তখন সেই পাহারাদারটা, যাকে ডাক্তার সাহেব গত ৪ঠা মার্চ পাঠিয়েছিলেন গরুর গাড়ী আনার জন্যে, সে গাড়ী নিয়ে এল। মনে মনে ভাবলাম ভালই হয়েছে। আমার সংগে তখন ফটকিরি ছিল না, আর ওখানে তা পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কাজেই বাঘের চামড়া নিয়ে আমরা যত তাড়াতাড়ি খাণ্ডারে পৌঁছাতে পারি ততই মঙ্গল। তাড়াতাড়ি ফটকিরি না লাগালে চামড়ায় পচ ধরে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এই চিন্তায় আমায় পাগল করে ফেললো। আগে আগে আমি যখন শিকারে বেরুতাম, তখন আমার সংগে প্রায় ৫।৬ সের গুড়ো নুন, ও ফটকিরি থাকতো। সেই দেখে অনেকে আমায় বলতো যে ওইসব তোড়-জোড়ের জন্যে আমি নাকি বাঘ পাই না। তারপর থেকে নুন ফটকিরি নেওয়া বন্ধ করলাম। আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম—গরুর গাড়ী যখন এসেই গেছে, তখন আর দেরী না করে বিকেল ৪টের মধ্যেই আমরা এখান থেকে খাণ্ডারের পথে রওনা হ'ব। আমার এই কথা শুনে ডাক্তার সাহেব প্রায় আঁতকে উঠলেন এবং বললেন—সে কি! রাত্রে এই দুর্গম রাস্তা দিয়ে কখনো কেউ যায়? আপনার রাজস্থান সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। হয় ডাকাতে মারবে নয় বাঘে খাবে। শুনে আমি হেসে বললাম—'দুটোর একটারও ভয়

নেই। কারণ গতরাত্রে আপনি আমায় যা শুনিয়েছেন, তাতে আমার ধারণা হয়েছে যে ঠাকুরসাহেব যখন আমাদের তাঁর মেহ্‌মান করে নিয়েছেন, তখন এখান থেকে খাণ্ডার পর্যন্ত ঠাকুর সাহেবের এলাকায় ডাকাতের আর কোন ভয় নেই —আমরা গাড়ীতে ঘুমুতে ঘুমুতে যেতে পারি। আর দেখলেন তো ২০ বছর পর বাঘ যখন সত্যিসত্যিই নাগালে এল, তখন তাকে এক গুলিতেই ধরাশায়ী করেছি, ৺বালাজী ও আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে। পথে আরেকটা জুটে গেলে তার মোকাবিলাতেও আমি প্রস্তুত। এসব কথা ডাক্তার সাহেবের মোটেই মনঃপুত হোল না। আমি আর কথা না বাড়িয়ে নিজের জিনিষপত্র গোছাতে লাগলাম এবং মহারাজকে বললাম রান্নার বাসনপত্র গোছাবার জন্য। আমার ভাবগতিক দেখে ডাক্তার সাহেব অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর জিনিসপত্র গোছাতে লাগলেন। আমরা চান ও খাওয়া সেরে অল্প বিশ্রাম করে সাড়ে তিনটে নাগাদ জিনিসপত্র গাড়ীতে তুলতে লাগলাম। বাগোরার প্রতিটি লোকের সংগে হাত মিলিয়ে যারা যারা বাঘটাকে বয়ে এনেছিল এবং চামড়া ছাড়ানর সময় সাহায্য করেছিল, তাদের বকশিস দিয়ে খুশী করে এবং ঠাকুর সাহেবের হাতে ৺গঙ্গামায়ীর পূজা বাবদ ৫০.০০ টাকা দিয়ে এবং তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ৪টের সময় খাণ্ডারের পথে রওনা হলাম।

রাতের অন্ধকারে গরুর গাড়ী চেপে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গল্প করতে করতে ভোর ৪টের সময় আমরা নির্বিঘ্নে খাণ্ডারের ডাক বাংলোর কাছে এসে পৌঁছালাম। খাণ্ডারে এসেই আমাদের প্রথম কাজ হোল 'ভেক্সিনেটার' কে দিয়ে ফট্‌কিরি জোগাড় করা। আমি তাকে বললাম যে, দোকান খুললেই যত ফট্‌কিরি কিনতে পাও সব কিনে নিয়ে এস তাড়াতাড়ি। এই বলে মালপত্র নামিয়ে রেখে আমি চামড়াটা নিয়ে বাংলোর ছাদে চলে গেলাম। চামড়াটা খুলে লোমের দিকটা নীচে রেখে ভেতরটা ওপরে করে তার থেকে

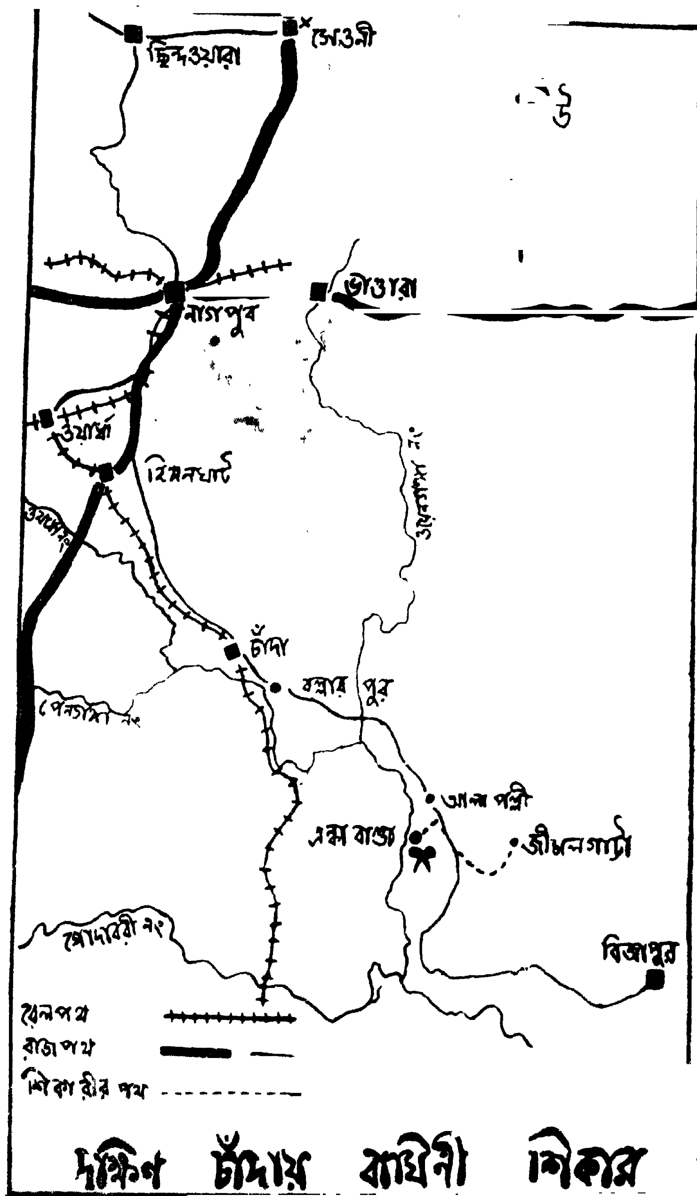
যে রস চোয়াচ্ছিল হাত দিয়ে সেগুলো চেঁচে বার করে দিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে 'ভেক্সিনেটার' এল। সারা খাণ্ডারের বাজার ঘুরে সে মাত্র সেরখানেক ফটকিরি জোগাড় করতে পেরেছে। আমি তখন সেই ফট্‌কিরি ও তার অনুপাতে নুন মিশিয়ে তখনকার মতন চামড়াতে লাগালাম। বুঝলাম কোটাতে না পৌঁছান পর্যন্ত ঠিকমত নুন ফট্‌কিরি দেওয়া আর সম্ভব হবে না। এই সময় ডাক্তার সাহেব ছাদে এসে বললেন যে তিনি খবর পেয়েছেন গতকালের বিকেলের বাসটা ওখান থেকেই গেছে এবং সেটা আজ সকাল ন'টায় ছাড়বে। সেই বাসেই সোয়াই মাধোপুর ফিরলে একটার মধ্যে ওখান থেকে 'ফ্রন্টিয়ার মেল' ধরে বিকেল চারটের সময় আমরা কোটায় পৌঁছাতে পারবো। ডাক্তার সাহেবেরও পৌঁছানর খুবই তাড়া ছিল, কারণ সেদিন ৭ই মার্চ, তাঁর কাজে যোগ দেবার কথা। আমরা খাণ্ডারের প্রতিটি লোককে ধন্যবাদ জানিয়ে 'রেঞ্জ' অফিসে বাঘ মারা বাবদ ৭৫'০০ টাকা 'রয়েলটি' দিয়ে রসিদ নিয়ে, ফকরুদ্দীন, মহারাজ, 'ভেক্সিনেটার' ও পাহারাদারকে উপযুক্ত বকশিস দিয়ে খুশী করে, শিকার ক্যাম্পের বাকী যাবতীয় জিনিসপত্র ওদের মধ্যে ভাগ করে দিলাম। সবাই বেশ খুশী হয়েছে বলে মনে হোল। এরপর আমরা ঠিকমত সোয়াই মাধোপুর ও কোটায় পৌঁছলাম।

বাড়ীতে এসে মালপত্র নামিয়েই ডাক্তার সাহেব সেই টাঙ্গা করেই রওনা হলেন হাসপাতালে হাজিরা দিতে আর আমিও তাঁর সংগে রওনা হলাম কোটার বড়বাজার থেকে নুন, ফট্‌কিরি ও 'গ্যালভানাইস' করা একটা বড় পাত্র কিনে আনতে। ওগুলো কিনে এনে 'ভ্যানইনজেনের' বইয়ে যে ভাবে নুন ফটকিরি জলে মিশিয়ে চামড়া ভেজাবার কথা আছে, সেইভাবে চামড়াটাকে ভিজিয়ে দিলাম। এই সব করতে করতে প্রায় রাত এগারোটা বেজে গেল। তারপর আরও যে ৪।৫ দিন আমি ডাক্তার সাহেবের অতিথি হয়ে কোটাতে ছিলাম সে সময়ে চামড়াটাকে ঠাণ্ডাতে ও হাওয়ায় শুকিয়ে

নিয়ে, একটা কাঠের বাক্স কিনে চামড়া ও মাথাটাকে ভাল করে পুরে, কোটা স্টেশন থেকে ভ্যানইনজেন এ্যাণ্ড ভ্যানইনজেন, মহীশূর—এদের কাছে রেজিস্টার্ড পার্শেলে পাঠিয়ে দিলাম। বাঘটার মাপ ছিল ন' ফুট। সঙ্গে টেপ না থাকায় সাধারণ দড়িতে মাপ তুলে এনে কোটায় এসে মেপেছিলাম। আগে আমার সঙ্গে ৫০ ফুটের একটা স্টিল টেপ সব সময় থাকতো। এ ছাড়া একটা ক্যানভাসের থলিতে খুব ভাল করে গুঁড়োন ভাল নুন এবং ৫।৬ সের ফট্‌কিরিও ভাল করে গুঁড়োন অবস্থায় আলাদা আলাদা ভাবে থাকতো। ১" ও ২" ইঞ্চি মাপের পেরেক, ছোট হাতুড়ী, কার্বলিক সল্যুসন, সল্যুসন লাগাবার জন্যে বুরুশ ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস সবসময়ই শিকারের অভিযানে আমার সংগে সংগে ঘুরতো। কিন্তু যখন সত্যিই আমার কপাল খুলল ; তখন আর ওসব কিছু সংগে নেই! আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমার মনে খট্‌কা লাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, অত পাকা বন্দোবস্ত করে ঘুরি বলেই আমার কপালে শিকার জোটে না। সেই থেকে শিকারে যেতে শুরু করলাম ওই সব বাদ দিয়ে। কোটায় যে ক'দিন ছিলাম, সে ক'দিনের স্মৃতি আমার কাছে অমূল্য হয়ে থাকবে। প্রফেসর ও মিসেস ব্যানার্জীদের বাড়ীতে সান্ধ্য মজলিস, মিসেস ব্যানার্জির হাতের অপূর্ব চা ও তার সংগে 'টা' আমি জীবনে কোনদিন ভুলবো না। আর ভুলবো না ডাক্তার সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর কথা, তাঁদের সহৃদয়তা ও আতিথেয়তার কথা। আমার বন্ধু ডাক্তার বিশ্বাস এবং কোটার ডাক্তার বিশ্বাস, এই দুই পরিবারের কাছেই, বাগোরাতে আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত বাঘ শিকারের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।

———

দক্ষিণ চাঁদায় বাঘিনী শিকার



দক্ষিণ চাঁদায় বাঘিনী শিকার

দক্ষিণ চাঁদায় বাঘিনী শিকার

এক্কাবাণ্ডা—দক্ষিণ চাঁদা

মনমত একটা বড় আনন্দের খবর পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠা ত অত্যন্ত স্বাভাবিক। উত্তেজনায় নিজের খেই প্রায় হারিয়ে ফেলে কারুকে সেই সুসংবাদটি দিতে গিয়ে যদি হৃদ্‌পিণ্ডটা ভয়ে ভয়ে ধুপ্ ধড়াস্ করে উঠতে থাকে তবে তার মত বিড়ম্বনা ও ট্রাজিডি বোধ হয় আর হয় না। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে কেমন করে এমনি একটা শঙ্কাময় বিকেল সেদিন আমার ভাগ্যে এসে জুটেছিল—সে কথাই বলছি।

সি. এইচ. কুট্‌স বলে আমার এক শিকারী বন্ধু বেশ কিছুকাল ধরে আমার সঙ্গে ভারতের নানান জায়গাতে শিকারে যাচ্ছিলেন। বেশীর ভাগ সময় আমিই শিকারের সব ব্যবস্থা করতাম, যেমন—নানা জায়গার 'ডি. এফ. ও.'র সাথে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করা, শিকারের পারমিট জোগাড় করা, ভাল সুটিং ব্লকের খবরাখবর নেওয়া, সেখানে কি ভাবে যাওয়া যায় এবং থাকার কি ব্যবস্থা করা যায় ইত্যাদি অনেক ফিরিস্তির তদারকি ও সমস্যার সমাধান করা। কখনও কখনও কুট্‌সও কোন ভাল 'সুটিং ব্লকের' খবর পেয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে আমাকে জানাতেন এবং তারপর বাকী ব্যবস্থা আমিই করতাম। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকমত হয়ে গেলে পারমিটের নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে আমরা 'সুটিং ব্লকে' পৌঁছে যেতাম। বেশ কিছু বছর ধরে এইভাবেই চলে আসছিল আমাদের শিকার অভিযান। হঠাৎ আমার বন্ধুবরের মাথায় পোকা নড়ল। তিনি ঠিক করলেন চাকরীর অবসরের পর এদেশ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসবাস করবেন। আগে কিন্তু সব সময় বলতেন নীলগিরির পাহাড়ের কাছে একটা

ছোট বাড়ী তৈরী করে অবসর জীবন কাটাবেন; ভারতের সব অপূর্ব বনজঙ্গলের মায়া কাটিয়ে তাঁর পক্ষে আর কোথাও থাকা সম্ভব নয়। হঠাৎ তাঁর মতান্তরের কারণটা সম্ভবতঃ তাঁর মেমসাহেবের কাছ থেকে এসেছে। একদিন তিনি বায়না ধরলেন যে, তাঁর অষ্ট্রেলিয়া চলে যাবার আগে তাঁর জন্য এমন একটা শিকারের ব্যবস্থা করে তাঁকে নিয়ে যেতে হবে যেখানে তিনি নিখরচায় রাজার আদরে থেকে শিকার করে আসতে পারেন। অনুরোধের তাগাদায় আমি পড়লাম খুবই মুস্কিলে। আমি যতবার বোঝাতে গেলাম যে—আমি গরীব শিকারী। তোমার জন্যে রাজার হালে শিকারের ব্যবস্থা আমি কি করে করবো? কুট্‌সের সেই একই অনুরোধ চলতে থাকল—'তোমার সাথে বহুলোকের জানাশোনা আছে—তুমি ইচ্ছে করলেই এ ব্যবস্থা করতে পারবে। আমি শুধু আমার বন্দুক নিয়ে এখান থেকে গাড়ী ভাড়া দিয়ে সুটিং ব্লক পর্যন্ত যাব এবং তারপরের যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। যথা—রাজার হালে থাকা ও খাওয়া, শিকারের যাবতীয় খরচ, টোপ কেনা, 'হাঁকার' লোকদের খরচ তা সে যত 'হাঁকার' লোকই লাগুক না কেন, ড্রাইভার সমেত ভাল জীপ গাড়ী এবং যত পেট্রোল লাগে—ইত্যাদি সব খরচ তারাই দেবে। 'সুটিং ফি'ও তারাই দেবে—আমি শুধু সেখানে গিয়ে ভি. আই. পি-র মত থেকে খেয়ে শিকার করে আসবো—যাতে এ ধরণের শিকার অভিযানের কথা আমি আজীবন মনে রাখতে পারি।' আমি শুনে বললাম—ন'মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। আমি তোমার জন্য এ ধরণের শিকারের ব্যবস্থা কোনদিনই করতে পারবো না। আমি অতি সাধারণ গরীব লোক—এই ধরণের কোন রাজা গজাদের সঙ্গে আমার আলাপ নেই, যিনি দয়া করে আমাদের এই রাজার হালে শিকার করিয়ে দেবেন। তোমার বায়নার যা ফর্দ তা তো অনেক খরচের ব্যাপার—একাজ

আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমার বন্ধুটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। এইভাবে বছর খানেক কেটে গেল। দেখা হলেই তিনি আমাকে বলেন—'কই, কবে তুমি আমাকে রাজার হালে শিকার করাচ্ছ? আমি যে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অবসর নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া চলে যাব। খুবই আশা করছি, তার আগেই তুমি একটা কিছু ব্যবস্থা করবে।'

ইতিমধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতিম এক বিশেষ ঘনিষ্ট বন্ধু মিঃ প্রদ্যোত মুন্সির জামাই ও ছোট মেয়ে মিঃ কে. এল. বোস ও মিসেস বোস সরকারী কাজে মধ্যপ্রদেশের চিঁন্তুয়ারাতে বদলী হয়ে গেল। চিঁন্তুয়ারা নাগপুর থেকে ৭৫ মাইল। জায়গাটি নাকি খুবই মনোরম। ওরা ওখানে গিয়ে আমাকে চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগল—"কাকু তুমি যদি এদিকে শিকারে আসতে চাও তাহলে আমাদের জানাও। আমরা তোমার সব ব্যবস্থা করে দেব। শিকারের পক্ষে জায়গাটা খুবই ভাল।" ওরা প্রায়ই লিখে জানাত,—"এই তো কিছুদিন আগে একজন আমেরিকান শিকার করতে এসে তুটো বড় বাঘ মেরে নিয়ে গেছে—একজন জার্মান ওখানে শিকার করতে এসে একটা না তুটো বাঘ মেরে নিয়ে গেছে" —ইত্যাদি। ১৯৬৪ সালের পূজার সময় ওরা তু'জনে আসানসোলে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এল এবং সেই সময় ওদের সঙ্গে আমার পাকাপাকি কথা হয়ে গেল যে, ১৯৬৫ সালের ১৫ই মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল এই এক মাসের মেয়াদে ওরা আমাদের জন্য তুটো পাশাপাশি স্যুটিং ব্লক রিজার্ভ করবে। মিঃ বোস বলল—'কাকু, তুমি কিছু ভেবো না। যদিও আমরা শিকারের কিছু বুঝি না কিন্তু আমাদের হাতে যে সব লোক আছে, তারা স্বচ্ছন্দে এইসব ব্যবস্থা করে দেবে। আমরা ফিরে গিয়েই সেই সব লোক লাগিয়ে দেব। তারা সবচেয়ে ভাল যে স্যুটিং ব্লক আছে, সেখানকারই পারমিটের ব্যবস্থা করবে।" আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ওদের বললাম যে মধ্যপ্রদেশের নিয়ম হচ্ছে 'স্যুটিং পারমিট' নেবার আগে 'বিগ্ গেম

লাইসেন্স' করাতে হয়, যার জন্য বন্দুকের লাইসেন্স দেখাবার দরকার হয়। তোমরা ফিরে গিয়ে লিখলে, আমি বন্দুকের লাইসেন্সগুলো রেজিস্টার্ড পোষ্টে পাঠিয়ে দেব। মিঃ বোস ব্যাপারটা ভাল করে না বুঝেই বলল—"ওসব যা কিছু করবার আমাদের ওখানকার লোকেরা করবে—তুমি কিছু ভেবো না। ও জায়গাটা ছোট এবং আমাদের হয়ে যারা ব্যবস্থা করবে, তারা ওখানে খুবই প্রভাব প্রতিপত্তিশালী; তাদের সঙ্গে 'ডিভিশনাল কমিশনার,' 'চীফ কনসারভেটার অব ফরেষ্ট', 'ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার' এঁদের সবার সঙ্গেই খুব খাতির আছে; এ সব ছোটখাট নিয়ম কানুন ওরা ইচ্ছে করলেই পাল্টে দিতে পারে। আর যদি একান্তই বন্দুকের লাইসেন্স দরকার হয়, তাহলে তোমাকে সময় থাকতে জানাব। তুমি শুধু বন্দুক ও গুলি নিয়ে আমাদের ওখানে চলে এসো আর বাকী সব ব্যবস্থা ওরাই করবে। তোমাদের শুধু জানিয়ে দেওয়া যে আগামী ১৫ই মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল ওখানে শিকার করতে আসছো—ব্যস।" এই সব শোনার পর আমার বন্ধু কুট্সের কথা আমার মনে পড়ল। আমি বললাম—এই রকম রাজসিক ব্যবস্থা যদি হয়, তাহলে আমি আমার বন্ধু কুট্সকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। শুনে ওরা খুশী হয়েই বলল—'তুমি স্বচ্ছন্দে কুট্সকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো।' দিনকয়েক পরে ওরা চিঁড়ুয়ারায় ফিরে গেল এবং যাবার সময় বারবার বলে গেল—"তোমরা দু'জনে নিশ্চয়ই আমাদের ওখানে শিকারে আসছ"; মিসেস বোস বলল—"আমি ওঁকে তাগাদা দিয়ে তোমাদের শিকারের সব ব্যবস্থা ঠিকমত করিয়ে রাখব। তোমাদের আসা চাই-ই"। আমি বললাম নিশ্চয়ই আসবো—এই ধরণের রাজার হালে নিখরচায় শিকার আমার ত ধারণার অতীত। এই সুযোগ কি ছাড়া যায়? আমার বন্ধু তো এ খবর শুনলে আনন্দে নাচতেই থাকবে। সে আবার যা পেটুক লোক; এ ধরণের ব্যবস্থা হলে, সে এমন খাবে যে অসুখে পড়ে যেতে পারে।

তার ওপরে সাহেব মেমসাহেবের টাকা পয়সার ব্যাপারে বেশ একটু কার্পণ্য আছে। নিখরচায় রাজার হালে শিকারের ব্যবস্থা হয়েছে শুনলে বন্ধুটি এখন থেকেই হয়তো পা বাড়িয়ে বসে থাকবে। এই কথা শুনে তারা খুব খানিক হাসলো।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আমি কুট্সের বাড়ী গিয়ে সুখবরটা দিলাম। তাঁরা সব খবর শুনে দুজনেই আনন্দে নাচানাচি আরম্ভ করে দিল। মেমসাহেব আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন--'সত্যি বলছ এই ধরণের একটা ব্যবস্থা তুমি করতে পেরেছ?' প্রথমে বোধহয় ওঁরা দুজনে আমার কথা তেমন বিশ্বাস করতে পারেননি। কয়েকবার আমায় প্রশ্ন করে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিটা গড়ে ওঠার সময় যেন মনে হতে লাগল—মেমসাহেবও যেন ঠিক করে ফেলেছে— রাজার হালে তাঁর স্বামী শিকারে যেতে পারলে সেও রাণীর হালেই সেখানে গিয়ে কটা দিন ভোগ করে আসতে পারবে। কথাবার্তার গতিতে আমার গা যেন ছম্ ছম্ করে উঠল, বুকের মধ্যে ধুপ্ ধড়াসের অন্ত নেই। খুব একটা সাহস জুগিয়ে বলে ফেললাম—চিঁদুয়ারাতে ওরা দু'জনের থাকার ব্যবস্থা করতে পারবে লিখেছে।

যাই হোক তারপর থেকে আমাদের দুই বন্ধুর দেখা হলেই মধ্যপ্রদেশে শিকারে যাবার ব্যাপারে আলোচনা হোত। ইতিমধ্যে মিঃ ও মিসেস বোসের কাছ থেকে দু'একখানা চিঠি পেলাম, উত্তরে আমিও তাদের প্রতি চিঠিতে 'বিগগেম লাইসেন্স' ও 'সুটিং পারমিটের' কথা লিখে জানালাম এবং প্রতিবারেই ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, কোথাও শিকার করতে যাওয়া ব্যাপারে এই দু'টি জিনিস খুবই জরুরী। ওরা উত্তরে লিখতে লাগল—'কাকু! তুমি কিচ্ছু ভেব না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিকমত।' আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। আমি জানি যারা নিজেরা শিকার করেনি তাদের ধারণা থাকার কথা নয় 'সুটিং পারমিট' ও 'বিগগেম লাইসেন্স' পাওয়া এবং ভাল 'ব্লকের' পারমিট পাওয়া কত শক্ত ব্যাপার। আর

এই দুটি জিনিস না থাকলে জঙ্গলে বন্দুক নিয়ে যাওয়াই বেআইনি। জঙ্গলে বিনা পারমিটে বন্দুক নিয়ে গেলে একজন সামান্য 'ফরেষ্ট গার্ডও' ধরে চালান দিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে।

ক্রমশঃ আমাদের চিঁদুয়ারা যাবার দিন এগিয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু আমরা মিঃ বোসের কাছ থেকে 'সুটিং পারমিট' ও 'বিগগেম লাইসেন্স' সম্বন্ধে পাকাপাকিভাবে কিছু জানতে পারলাম না। এদিকে ওরা খালি লিখছে—'তোমরা চলে এস, সব ব্যবস্থা করা আছে।'

অতঃপর আমরা দুই বন্ধু দেড়মাসের ছুটি নিলাম এবং কলকাতা-বোম্বে মেলে দুজনের জন্য দুখানা ফার্স্ট ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করা হল। কুট্স ও আমার দু'জনেরই মনে খুশির প্লাবন বয়ে যাচ্ছে; জঙ্গলে প্রচুর বাঘ জুটবে, টেবিলে অঢেল খাবার আর রাজরাজড়ার আদরও জুটবে—নিখরচায়! একটা বেশ মোটা খরচের যজ্ঞ থেকে রেহাই পেয়ে—একটা ভাল শিকারের ব্যবস্থা হবে—এত সব ত আমাদের কল্পনাতীত। তাছাড়া কুট্স ও তার বৌয়ের কাছে খানিকটা কেউকেটা মানুষ বলেও গণ্য হতে লাগলাম, আমার প্রেসটীজ ফুলে ফেঁপে একাকার। যা হোক ১৯৬৫ সালের ১২ই মার্চ আমরা বেলা ৩টের সময় নাগপুরে এসে পৌঁছলাম। রওনা হবার আগে মিঃ বোসকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছিলাম আমরা কবে রওনা হচ্ছি এবং কোনসময় নাগপুরে পৌঁছাচ্ছি। মিঃ বোস টেলিগ্রামে জানিয়ে দেয় যে, আমরা যেন নাগপুরে পৌঁছেই চাঁদার ট্রেন ধরে চাঁদায় চলে যাই। চাঁদা স্টেশনে তার লোক এসে আমাদের বাল্লারপুর 'গেষ্ট হাউসে' নিয়ে যাবে এবং সেখানে একরাত্রি থাকার পর ওরা আমাদের 'সুটিং ব্লকে' নিয়ে যাবে। তাই নাগপুরে পৌঁছে নির্দেশমত আমরা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে টিকিট কিনে যে প্ল্যাটফর্মে দক্ষিণ চাঁদার ট্রেন ছাড়ে, সেইখানে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। ট্রেন আসতে তখনও ৪০।৭৫ মিঃ বাকী।

হঠাৎ দেখি মিঃ বোস এসে উপস্থিত। তার কাছে শুনলাম সে সরকারী কাজে 'টুরে' গিয়েছিল এবং আমাদের স্টেশনে ধরবার জন্যে তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে নাগপুরে এসেছে। মিঃ বোস বলল—তোমরা চাঁদা স্টেশনে নামলেই আমার বন্ধুদের মধ্যে মিঃ ঝা কি মিঃ দাবে একজন তোমাদের স্টেশনে অভ্যর্থনা করবেন। এঁরা দুজনেই জানিয়েছেন যে, তোমাদের শিকারের সব ব্যবস্থা পাকা করা আছে। কুট্‌সকে বলল—আপনারা মিঃ ঝা ও মিঃ দাবের অতিথি, তাঁরাই আপনাদের যা কিছু দরকার সব ব্যবস্থা করবেন।" আমি তখন মিঃ বোসকে বললাম—তা তো হোল কিন্তু আমাদের বিগ্‌গেম লাইসেন্স ও সুটিং পারমিট কি হয়েছে? উত্তরে জানলাম, ওঁরা খবর পাঠিয়েছেন যে শিকারের সব ব্যবস্থাই পাকা করে রেখেছেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম—কোন্ কোন্ সুটিং ব্লক রিজার্ভ করা হয়েছে তার নাম কি তাঁরা জানিয়েছেন? মিঃ বোস বলল—'আমি তার কিছুই জানি না। ওঁরা আমাকে কিছুই জানাননি।' এই কথা শুনে আমার মনে কি রকম একটু সন্দেহ হোল। আমি বললাম—'ওঁরা হয়তো ভেবেছেন—তোমার কাকুকে খুব ভালরকম খানাপিনার ব্যবস্থা করে দেবে আর কিছু বিলিতি মদের বোতল সামনে ধরে দেবে, তারপর কি সে ব্যাটা আর জঙ্গলে যেতে চাইবে? কিন্তু তাঁরা তো আর তোমার কাকুকে চেনে না—কাকুর খানাপিনা না হলেও চলবে কিন্তু শিকার হওয়া চাই-ই। আমার এইসব কথা শুনে, মিঃ বোসের মুখ দেখে মনে হোল তারও যেন খানিক সন্দেহ হয়েছে। সে আমাকে বলল—'কাকু! আমি মিঃ ঝা-কে ভার দিয়েছি তোমাদের থাকা খাওয়া ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করার, আর মিঃ দাবেকে ভার দেওয়া আছে তোমাদের শিকারের পারমিট, বিগগেম লাইসেন্স এবং যা কিছু আইনের ব্যাপার আছে সে সব দেখাশুনা করার। মিঃ দাবে ওখানকার খুব প্রতিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী লোক—ওখানে লোঁকে ওকে 'কিং মেকার' বলে—এ হেন মন্ত্রী

নেই যার সাথে ওনার আলাপ নেই; ফলে ওঁর অসাধ্য কোন কাজ নেই। উনি যখন জানিয়েছেন যে, শিকারের সব ব্যবস্থা করেছি তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু করেছেন। যাই হোক ওখানে পৌঁছেই মিঃ দাবেকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে উনি পারমিট ও বিগগেম লাইসেন্সের ব্যবস্থা করছেন কি না? যদি না করে থাকেন, তাহলে তাগাদা দিয়ে তুমি করিয়ে নেবে এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদার ডি. এফ. ও. অপিসে গিয়ে দুটি ভাল সুটিং ব্লক বেছে তোমাদের দুজনের নামে রিজার্ভ করিয়ে নেবে। টাকাকড়ি যা লাগে ওঁরাই সব ব্যবস্থা করবেন—তোমরা কিছু খরচ কোরো না। আমি দু'চার দিনের মধ্যেই ওখানে যাব এবং তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসবো; মিঃ দাবেকেও বলবে আমি ২।৪ দিনের মধ্যে ওখানে যাচ্ছি।' এইসব কথাবার্তা বলতে বলতে দেখলাম আমাদের ট্রেন আসছে। মালপত্র নিয়ে গাড়ীতে ওঠার পর, মিঃ বোস আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভরসা দিল—সব ঠিক হয়ে যাবে। দু'চার দিনের মধ্যেই সে ওখানে গিয়ে দেখে আসবে যে আমাদের শিকারের এবং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সব ঠিকমত করা হয়েছে কি না।

গাড়ী ছাড়ল। মিঃ বোসকে বিদায় জানিয়ে, নাগপুর থেকে দক্ষিণ চাঁদা পর্যন্ত রেল-লাইনের দুধারে পাহাড় ও জঙ্গল মিলিয়ে অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে চললাম। মনে মনে অবশ্য ভাবলাম মিঃ দাবে ও মিঃ ঝা আমাদের শিকারের কি ব্যবস্থা করছেন কে জানে—ঠিকমত সুটিং ব্লকের পারমিট করিয়েছে কিনা জানবার জন্য মনটা উতলা হল। খুব ভাল শিকারের জায়গা বলে দক্ষিণ চাঁদার নাম শুনেছি, তবে আমরা শিকার পাব কিনা, আমাদের কপালেই বা কি আছে কে জানে? আমি আবার আমার আর এক শিকারী বন্ধু ভবানী গাঙ্গুলীকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি। তিনি কোন কারণে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেননি তবে তিনি ১লা এপ্রিল রওনা হ'য়ে ৩রা/৪ঠা এপ্রিল নাগাদ আমাদের শিকার ক্যাম্পে

এসে পৌঁছবেন বলে বলেছেন। এইসব নানান ভাবনা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় গাড়ী দক্ষিণ চাঁদা স্টেশনে এসে থামল। মালপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দেখি, ব্যবস্থা মত ট্রেলার সমেত একটা জীপগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মিঃ ঝা বা মিঃ দাবেকে দেখতে পেলাম না। অগত্যা আমরা মালপত্র নামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের মালপত্র অনেক ছিল—তুজনের তুটো মাঝারি মাপের স্টীল ট্রাঙ্ক, সেগুন কাঠের লম্বা ধরণের বন্দুকের একটা ভারী বাক্স তাতে ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয় তিনটি অস্ত্র ১নং ·৪০৫ উইঞ্চেষ্টার ৫ গুলির রাইফেল, ২নং ·৪৫০ পার্ডির দোনলা রাইফেল এবং ৩নং ১২ বোরের জিকোর সট্‌গান, এ ছাড়া তার মধ্যে গুলি, পরিষ্কার করার রড, বন্দুকের টর্চ, টর্চের ব্যাটারি, বন্দুকের তেল, প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স ইত্যাদি। আর ছিল হাল্কা পাইপ ও এক্সপ্যাণ্ডেড মেটাল দিয়ে তৈরী আমার ফোল্ডিং মাচান একটা বড় থলের মধ্যে ভরা, তাছাড়া একটা ডানলোপিলোর বসবার গদি ও একটা ফোল্ডিং ক্রশবার, যার ওপরে রাইফেল রাখা যায়—সব মিলিয়ে একটা বড়সড় প্যাকেজ। ঐ 'ফোল্ডিং মাচানটা' আমার সঙ্গে ভারতের নানান জঙ্গলে ঘুরেছে। এটা নিয়ে যাতায়াত করারও খুব সুবিধে। যে কোনও একটা লোক বা অল্পবয়সী ছেলে এটাকে অক্লেশে বহুদূর বয়ে নিয়ে যেতে পারে। বন্ধুর বন্দুকের বাক্সে একটা ১২ বোরের 'সট্‌গান' আর তুটো কানভাসের খাপের একটার মধ্যে ৩০-০৬, ৫ গুলির রাইফেল এবং আরেকটায় ·২২ বোরের রাইফেল, এ ছাড়া একটা ফিলিপ্‌সের ট্রানসিস্‌টার। সব মিলিয়ে আমাদের এগারটা মাল। রাজা-উজিরের মতই ভ্রমণের মালপত্র। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই আমার বন্ধু কুট্‌সের মেজাজ গরম হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন —'কই তোমার বোসের ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজকীয় অভ্যর্থনার তো কোন লক্ষণই দেখছি না। কোথায় তোমার বাল্লারপুল গেষ্টহাউস?

কোথায় ঝা? কোথায় দাবে? এই ভাবেই কি সারারাত আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে হ'বে?' শুনে আমি বললাম—মিঃ ঝা বা মিঃ দাবে যদি আসতে দেরী করে বা একান্তই না আসে, সেটা কি আমার অপরাধ! তিনি আমার কথা শুনে একটু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—'আমি খুব ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত।' আমি আর তার কোন উত্তর না দিয়ে ভাবছি কি করা যায়—বাল্লারপুর গেষ্টহাউসে কি টেলিফোন আছে—সেখানে কি একবার ফোন করবো? এই সব ভেবে আমি স্টেশনে টেলিফোন আছে কিনা জানার জন্য পা বাড়াচ্ছি এমন সময় একটা জীপগাড়ী স্টেশনের দিকে আসতে দেখলাম, জীপটা সোজা আমাদের মালপত্রর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। জীপ থেকে তাড়াতাড়ি এক ভদ্রলোক নেমে এলেন এবং আমাদের পরিচয় শুনে খুব বিনয় করে তাঁর দেরী হওয়ার জন্যে ক্ষমা চাইলেন। স্টেশনে আগে থেকে যে জীপগাড়ীটা ট্রেলার সমেত দাঁড়িয়েছিল কুলিদের তাতে আমাদের মালপত্র চাপাতে বললেন এবং আমরা দুই বন্ধুও সেইটাতে উঠ্‌লাম। ভদ্রলোকের নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনিই মিঃ ঝা বাল্লারপুর কোলিয়ারীর ম্যানেজার। মিঃ ঝা-কে অনুসরণ করে কিছুক্ষণ চলার পর আমরা চাঁদা শহরের একটা সিনেমা হলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সিনেমা ভেঙ্গে গিয়েছিল—দেখলাম তিনচারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি স্থূলকায় ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। মিঃ ঝা আমাদের সাথে তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা সপরিবারে তাঁর জীপে উঠলে আমরা সকলে বাল্লারপুরের দিকে রওনা হলাম। চাঁদা স্টেশন থেকে বাল্লারপুর প্রায় মাইল বিশেক হবে। আমরা প্রায় রাত এগারটায় বাল্লারপুর গেষ্টহাউসে এসে পৌঁছলাম। গেষ্ট হাউসটি আকারে বিরাট—দেখলে মনে হয় আগেকার দিনের কোন রাজপ্রাসাদ। ওখানে ঢোকার সময় জীপের আলোয় নজরে পড়ল প্রাসাদের বিরাট এলাকা জুড়ে নানারকম ফুল ও ফলের

বাগান। আমরা গাড়ীবারান্দার সামনে এসে দাঁড়াতেই দারোয়ান, চাকর, বেয়ারা সব ছুটে এল। তারাই মালপত্র ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল। দেখলাম একটা বিরাট ঘরে আগেকার দিনের কারুকার্য করা দু'টো বড় বড় খাটের ওপর সুন্দর ধপ্‌ধপে বিছানা করা। তার দু'ধারে দু'টো টেবিল, কিছু চেয়ার এবং দুটো ড্রেসিং টেবিল। সমস্ত আসবাবপত্র মেহগনি বা বার্মাটিকের এবং সুন্দর পুরোণ আমলের কাজ করা। শোবার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া সাজবার এবং স্নান করার ঘর। স্নান করার ঘরে নতুন সাবান তোয়ালে সব রাখা আছে, মনে হল সত্যই রাজকীয় ব্যাপার। মিঃ ঝা আমাদের সব ঘরদোর দেখিয়ে বললেন, তিনি এখুনি তাঁর বাড়িতে তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের নামিয়ে আসছেন, আমরা যেন ততক্ষণে হাতমুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নিই। আমরা তাঁকে বললুম, আপনার আসার দরকার নেই, আমরা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করে নিতে পারবো। তিনি চলে গেলে আমরা দুজনে ভাল করে স্নান করে পাজামা পাঞ্জাবী পরে বেরিয়ে এসে দেখি মিঃ ঝা এসে গেছেন। তিনি আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন খাবার ঘরে। সেখানে দেখলাম রাজসিক খাবারের ব্যবস্থা! পোলাও, মুরগীর মাংস এবং তার সঙ্গে আরও নানা পদ এবং টেবিলের মাঝখানে দুটো ফলের প্লেটের একটাতে পাতা-সমেত গাছপাকা কমলালেবু এবং আরেকটাতে বড়বড় সিঙ্গাপুরী কলা ও আপেল। আমি আগে কখনও এইরকম গাছপাকা পাতা-সমেত কমলালেবু দেখিনি। এই পাতা-সমেত কমলালেবুগুলো খাবার টেবিলের আভিজাত্য যেন অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে। আমি আমার বন্ধু কুট্‌সের কথা ভেবে মনে মনে খুশী হ'লাম। তিনি বার বার আমায় বলেছিলেন, অবসর নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া যাবার আগে তাঁর জন্য এমন একটা শিকারের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে তিনি রাজার হালে থেকে খেয়ে শিকার করবেন। ভগবান দেখছি ওর কপালগুণে ঠিকই জুটিয়ে দিয়েছেন। আর আমার ভাগ্যই কি কম!

খাওয়া শুরু হ'ল। আমার বন্ধুর যাকে বলে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া হল। পোলাও, মুরগীর মাংস এবং আরও যা যা আনুসঙ্গিক ছিল এবং তার সঙ্গে ফল খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। মিঃ ঝা অবশ্য প্রথমে খাওয়ার টেবিলে এসেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'ড্রিঙ্কস্'-এর কথা। আমি ও রসে বঞ্চিত। আমার বন্ধু প্রথমে খানিক না না করে পরে দুটি হুইস্কি খেলেন। হুইস্কির জোরেই হোক বা খুব খিদে পাওয়ার জন্যেই হোক, কুট্স সে রাত্রে যা খেলেন ততটা খেতে আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। মিঃ ঝা অতিথিদের নামে বেশ কয়েকটি বড় বড় 'পেগ' খেলেন। আমি কিন্তু খাবার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার মিঃ ঝাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের স্যুটিং পারমিট ও বিগগেম লাইসেন্সের কথা তিনি কিছু জানেন কিনা? উত্তরে তিনি বললেন— শিকার ব্যাপারে সব ব্যবস্থার ভার মিঃ দাবের—তিনি কিছুই জানেন না; তবে মিঃ দাবের ওপর যখন ভার দেওয়া আছে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন সব ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয়ই করে রেখেছেন। মিঃ দাবের আজ এখানে আসার কথা ছিল—কোন কাজে আট্কে পড়ে তিনি আসতে পারেননি— কাল সকালেই সব জানা যাবে। আপনাদের আসার সংবাদ কাল সকালেই আমি ওঁকে ফোন করে বলবো এবং দেখা করতে বলবো, আমিও আসবো"—এই সব বলে তিনি যখন গেষ্ট হাউস ছেড়ে গেলেন তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে। আমরা শুতে চলে গেলাম।

দু'এক কথা বলতে বলতে আমরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা, সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল দেখি বেশ রোদ উঠে গেছে। ঘড়িতে দেখলুম সাড়ে সাতটা। হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসতেই, বেয়ারা 'বেড টি' এনে আমাদের ঘরে রেখে গেল। তাই দেখে আমি কুট্সকে বললাম—রাজার হালে শিকারের ব্যবস্থা দেখছি কপালগুণে ঠিক মতই হয়েছে। এখন আসল শিকারের ব্যবস্থাটা রাজার হালে

হলেই বাঁচি। এখনও পর্যন্ত তো জানতেই পারলাম না যে আমাদের স্যুটিং পারমিট ও বিগ্ গেম লাইসেন্স হয়েছে কিনা এবং ভাল স্যুটিং বক জোগাড় হয়েছে কিনা। 'বেড টি' খাবার সময় খবরের কাগজ দিয়ে গেল। সবই ছিমছাম বন্দোবস্ত। আমরা প্রাতঃক্রিয়া সেরে সামনের ফুল ও ফলের বাগান দেখে বেড়াতে লাগলাম। এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিল টেবিলে প্রাতঃরাশ তৈরী। খাবারের টেবিলে গিয়ে দেখলাম প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা। কর্ণফ্লেকস্, দুধ, ওমলেট, রুটি, মাখন এবং তার সঙ্গে প্রচুর কলা, আপেল ও কমলালেবু। বেয়ারা জানতে চাইল চা না কফি। আমরা কফি চাইলাম এবং তারপর দুই বন্ধু খেতে খেতে গল্প করতে লাগলাম। টেবিলে যা যা ছিল, বন্ধু সব কিছুরই যথার্থ সদ্ব্যবহার করলেন।

তখন সাড়ে আটটা হবে, মিঃ ঝা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি মনে মনে মিঃ ঝা ও মিঃ দাবের কথাই ভাবছিলাম। মিঃ ঝা জানতে চাইলেন আমাদের কোনরকম অসুবিধা হয়েছিল কি না? উত্তরে আমি বললাম—আমাদের থাকা খাওয়ার কোনই অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু আসল যে জন্য এখানে আসা তার কি ব্যবস্থা হোল সেটা সঠিক না জানা পর্যন্ত আমরা খুব অশান্তিতে আছি। আপনি সে সম্বন্ধে মিঃ দাবের কাছ থেকে কি কিছু জেনেছেন? তিনি বললেন 'না, তবে এখনই আমি ফোন করে জানছি', বলে তিনি গেষ্ট হাউসের টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। মিঃ দাবেকে ফোনে পাওয়া গেল না। তিনি কোথাও বেরিয়েছেন; তাঁর বাড়ীতে খবর দিয়ে রাখা হোল, তিনি ফিরেই যেন গেষ্ট হাউসে ফোন করেন বা আসেন। ফোনে মিঃ দাবেকে না পাওয়ায় আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু উপায় নেই। তিনি না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। মিঃ ঝা আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে অপিসের কাজে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন দুপুরে আবার আসবেন। আমরা

দুজনে খানিক গল্প করলাম, কাগজ পড়লাম তারপর ১২টা নাগাদ স্নান করে খেতে বসলাম। দুপুরেও খাবার টেবিলে প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা। আমার বন্ধু তো খুব খুশী। বিলিতি কায়দায় ছুরি, কাঁটা ও "সারভিয়েট" (Serviatte) দিয়ে টেবিল সাজান। টেবিলে নানা রকমের ভাল ভাল দেশী খাবার—মুরগী, রঙবেরঙের পোলাও, পুডিং, স্যালাড ও ক্রীম এবং গাছপাকা কমলালেবু, কলা ও আপেল। আমার বন্ধু খুব মন দিয়ে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, কিছু মনে করো না, এখানকার জল-হাওয়া ভাল, তাই আমার খিদে একটু বেড়েছে। আমি কিন্তু আমার বন্ধুটিকে খুব ভালভাবেই জানি, পরের পেলে তিনি কুঁচকি-কণ্ঠা পর্যন্ত ভরে খেয়ে যাবেন। কিন্তু হজম করতে পারেন না—তাই মধ্যে মধ্যে তাঁকে আমায় একটু সাবধান করে দিতে হয়। আমি বললাম—হজম করতে পারেন তো খেয়ে যান কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে এভাবে খেয়ে অসুখে যেন না পড়েন। আমার কথা শুনে তিনি খুব খানিকটা হেসে নিয়ে খেতে খেতে বললেন—যা ভাল খাবার না খেয়ে কি পারা যায়? আমি বললাম—খেতে তো মানা করছি না কিন্তু পেট বুঝে খান, বেশী খেয়ে অসুখে পড়ে আপনি আমার অনেক জায়গায় শিকার নষ্ট করে দিয়েছেন। চিকিৎসার জন্য শিকার ফেলে আমরা একবার চলেও আসতে বাধ্য হয়েছি, সেটা যেন মনে থাকে। উনি তখন বললেন, —'তার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত, তবে এখানে সে রকম হবে না তা দেখে নিও। দেখছ না, এখানে কি রকম সুন্দর ব্যবস্থা? ভাল ঘি তেলের রান্না, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বন্দোবস্ত। এখানে আমি যতই খাই না কেন, আমার কিছুই হবে না। যে সব জায়গায় আমার অসুখ করেছিল সে সব জায়গার রান্না খাওয়ার ব্যবস্থার কথা একবার ভেবে দেখ দিকি?' আমি তার উত্তরে বললাম—জঙ্গলে শিকার ক্যাম্পে ওর থেকে ভাল ব্যবস্থা করা সব সময় সম্ভব হয়

না। তাই অনেকরকম কষ্ট সহ্য করতে না পারলে শিকারে না আসাই ভাল। এমন সময় মিঃ ঝার জীপ এসে গাড়ী বারান্দায় থামল। আমরা তখন খাবার টেবিলেই। খাবার ঘরের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম একটা পনের বেজে গেছে। মিঃ ঝা জানতে চাইলেন আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা? আমি হাসতে হাসতে বললাম—'ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। খালি খাচ্ছি আর গল্প করছি, শিকারের কোন ব্যবস্থাই নেই এখানে। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধে। এর কোন বিহিত কি আপনারা দুজনে করতে পেরেছেন? মিঃ ঝা বললেন, তিনি মিঃ দাবেকে ফোন করেছিলেন, কিন্তু তিনি একটা বিশেষ জরুরী কাজে আটকে পড়ে যাওয়ায় আসতে পারেননি। তিনি বিকেলে অবশ্যই আসবেন এবং বলবেন আপনাদের কি ব্যবস্থা করেছেন। আমি মিঃ ঝাকে বললাম —আপনার তো দেখছি স্নান খাওয়া হয়নি।—আপনি যান, মিসেস ঝা আপনার জন্যে খাবার নিয়ে বসে আছেন। বিকেলে আবার দেখা হবে বলে মিঃ ঝা হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

আমরা দুজনে খেয়ে নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লাম কাগজ নিয়ে—তারপর কাগজ পড়তে পড়তে একটা লম্বা ঘুম দিলাম। বিকেল পাঁচটায় উঠে দেখি, বাইরে তখনও রোদের তাপ প্রচুর। চা খেয়ে আমরা রোদ পড়লে বাগানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় মিঃ ঝা ও মিঃ দাবে এলেন। বাগানে একটা মস্ত বড় বাঁধান চাতাল ছিল, সেখানে চেয়ার পেতে আমাদের সন্ধ্যার মজলিশ বসল। খানিক পরে আরেকটা জীপগাড়ীতে মিঃ ওঝারা দুই ভাই এলেন। তাঁরা চাঁদার মহাকালী কলিয়ারীর মালিকের আত্মীয়। এঁদেরকে খুব ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের লোক বলে মনে হোল। মিঃ দাবে ওখানকার আরেক কলিয়ারীর এজেন্ট শুনলাম।

মিঃ দাবে খুব মজার লোক—মজার মজার গল্প বলে খুব লোক হাসাতে পারেন। মিঃ ঝা সেই সান্ধ্য-আসরে একটা বিলিতি হুইস্কির

বোতল খুলে ফেললেন। মিঃ ঝায়ের কলিয়ারীর আরও কয়েকজন অফিসার এসে জুটল—সবার সাথে আলাপ পরিচয় হোল। আমি কিন্তু হাসি ও গল্পের মাঝে মাঝে মিঃ দাবের কাছ থেকে আমাদের শিকারের কি ব্যবস্থা হয়েছে তা জেনে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তিনি বললেন যে, দুটি স্যুটিং ব্লকের পারমিট করিয়েছেন তাঁর নিজের নামে। আমরা ইচ্ছে করলে সেই পারমিট নিয়ে সেদিন থেকেই শিকারে যেতে পারি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—পারমিটে কি আমাদের নাম দিয়েছেন? তিনি বললেন—'না তার দরকার হবে না। এখানকার 'চীফ ফরেষ্ট অফিসার', 'ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার' সব আমার বন্ধু লোক। আপনি আমার পারমিট নিয়ে যেখানে খুশী শিকার করে আসতে পারেন। আপনার কোন ভয় নেই।' এই কথা শুনে আমি মনে মনে বুঝে নিলাম যে এঁরা ভাবেননি যে আমরা সত্যিকারের শিকার করতে এসেছি। তাই এই সব কথা বলছেন। অপরের পারমিট নিয়ে লুকিয়ে হরিণ শিকার করা চলতে পারে কিন্তু বাঘ শিকার করা যায় না। আমি মিঃ দাবেকে বুঝিয়ে বললাম যে তিনি যেন প্রথমে আমাদের দু'জনের জন্য দুটো 'বিগগেম লাইসেন্স' করার চেষ্টা করেন কারণ বিগগেম লাইসেন্স না হলে আমাদের নামে 'স্যুটিং পারমিট' হবে না—এই মধ্যপ্রদেশের নিয়ম। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো আমরা আগামীকাল সকালে মিঃ দাবের কাছে যাব এবং তিনি আমাদের নিয়ে ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে সব ব্যবস্থা করা হবে। সান্ধ্য মজলিস রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত চলল। তারপর যে যার চলে গেলেন আর আমরা দুজনে রাত্রের খাওয়া সেরে শুতে গেলাম।

পরের দিন সকাল সাড়ে ন'টার সময় একটা জীপে করে আমরা প্রথমে মিঃ দাবের বাড়ী এবং পরে সেখানে থেকে বেলা এগারটা নাগাদ আমরা ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের দপ্তরে গেলাম।

দেখলাম ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার, চীফ ফরেষ্ট অফিসার এঁরা সবাই মিঃ দাবেকে খুব ভাল করে চেনেন। পরস্পর আলাপ পরিচয়ের পরে মিঃ দাবে আমাদের ওখানে আসার কারণ জানালেন। তাঁরা প্রথমেই আমায় জিজ্ঞেস করলেন—"আপনাদের 'বিগগেম' লাইসেন্স করান হয়েছে? না হয়ে থাকলে আগে সেটা করিয়ে আনতে হবে নাগপুর থেকে, কারণ চীফ কনসারভেটার অব ফরেষ্টস্ ছাড়া আর কেউ ওটা দিতে পারেন না এবং তাঁর দপ্তর নাগপুরে। বিগগেম লাইসেন্স করার পর আপনাদের এখানে অস্থায়ী বন্দুকের লাইসেন্স করাতে হবে এবং তারপর আপনারা স্যুটিং পারমিট পেতে পারেন—তার আগে কিছুই হবে না।" আমি ঠিক এই সমস্যাটাই মিঃ বোস্‌কে বহু আগে থেকেই বোঝাতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল একজন চালাক চতুর কেরাণীর হাতে আমাদের দুজনের বন্দুকের লাইসেন্স, দরখাস্ত ও প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি দিয়ে নাগপুরে পাঠান হবে বিগগেম লাইসেন্সের জন্য। প্রতিটি বিগগেম লাইসেন্সের ফি ৫০·০০ টাকা এক বছরের জন্য এবং অস্থায়ী বন্দুকের লাইসেন্স ফি প্রতি বন্দুক বাবদ ২·০০ টাকা করে, স্যুটিং পারমিট ফি পক্ষকালের জন্য প্রতি ব্লক বাবদ ৫০·০০ টাকা করে, বাঘ মারার রয়েলটি ৭৫·০০ টাকা।

ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, মিঃ দাবেকে তাঁর বাড়ীতে নামিয়ে আমরা যখন গেষ্টহাউসে পৌঁছলাম, তখন বেলা আড়াইটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লাম। সন্ধ্যেতে আবার আমাদের মজ্‌লিস্ বসল এবং রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত আমরা দাবে সাহেবের কাছ থেকে মজার মজার গল্প ও নানা কথা শুনে খুব উপভোগ করলাম। প্রতি সন্ধ্যেয় মিঃ ঝা আমাদের নামে একটা করে বিলিতি হুইস্কির বোতল খুলতেন। আমি ত ও রসে বঞ্চিত। বন্ধুবর কুট্‌সও খুব অল্পই খেতেন—বাকীটা মিঃ ঝা, মিঃ দাবে ও তাঁদের বন্ধুবান্ধবরাই খেয়ে

শেষ করতেন।

এইভাবে আমাদের দিন কাটতে লাগল। যে লোকটিকে নাগপুরে পাঠান হয়েছিল সে ফিরে না আসা পর্যন্ত গেষ্টহাউসে খাওয়া শোওয়া, গল্পকরা আর সন্ধ্যেতে মজলিস বসান ছাড়া আর কিছুই করার নেই। চারপাচ দিন হোল লোক পাঠান হয়েছে কিন্তু তার কাছ থেকে কোন খবর না পাওয়ায় আমরা ক্রমশঃ অধীর হয়ে পড়ছি, বিশেষতঃ আমার বন্ধুটির মেজাজ ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে এবং তিনি মধ্যে মধ্যে আমার ওপর একটু রাগারাগি করছেন। চারপাচ দিন পরেও যখন লোকটার দেখা নেই বা কোন খবর নেই তখন আমি মিঃ ঝাকে বললাম আপনাদের নাগপুরের অপিসে টেলিফোন করে খবর নিন আপনার লোক ঠিকমত পৌঁচেছে কিনা এবং সে বিগগেম লাইসেন্সের ব্যবস্থা করেছে কিনা। নাগপুরে টেলিফোন করে খবর পাওয়া গেল যে চীফ কনসারভেটার অফ ফরেষ্টস 'টুরে' গেছেন এবং তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত কাগজপত্র সই হবে না। অবশ্য তিনচার দিনের মধ্যেই তাঁর ফেরার কথা আছে তাই লোকটি সেখানে অপেক্ষা করছে।

'বিগগেম লাইসেন্স' নিয়ে লোকটি ফিরে এল ২৮শে মার্চ। আমাদের দুই বন্ধুর অবস্থা সহজেই অনুমেয়—গত ১২ই মার্চ্চ থেকে আমরা বল্লারপুর গেষ্টহাউসে এসে রয়েছি এবং ১৬ দিন পর আমরা লাইসেন্স পেলাম। পরদিন অর্থাৎ ২৯শে আমরা মিঃ দাবেকে নিয়ে চাঁদায় ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছে স্যুটিং ব্লকের আর্জি পেশ করে সেই সকাল থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত ছোটাছুটি করে আমরা দুটো পাশাপাশি স্যুটিং ব্লকের পারমিট পেলাম—একটার নাম "জীমল্‌গাট্টা" ও অপরটার নাম "এক্কাবাণ্ডা"। জীমল্‌গাট্টা ব্লকে একটা ফরেষ্ট বাংলো আছে সেখানে থাকার জন্য আমরা ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি করিয়ে নিলাম। শিকারের পারমিট ব্যাপারে যা যা দরকার সব কিছু

সেরে, মিঃ দাবেকে বাড়ীতে নামিয়ে আমরা যখন গেষ্টহাউসে পেঁাছলাম তখন বিকেল '৫টা বেজে গেছে। আমরা একটু জিরিয়ে স্নান সেরে তুপুর ও রাত্রের খাওয়া একসঙ্গেই সেরে ফেললাম।

সেদিন সান্ধ্য আসরে আমাদের স্যুটিং ব্লকে যাবার সব ব্যবস্থা পাকা করে নেবার কথা। অবশ্য নাগপুরে বিগগেম লাইসেন্সের জন্য লোক পাঠাবার পর থেকেই আমি মিঃ ঝা ও মিঃ দাবেকে সময় পেলেই আভাস দিয়ে এসেছি আমাদের কি কি লাগবে। যথা— প্রথম, একটা ভাল জীপ ও ভাল ড্রাইভার। মিঃ ওঝারা তুই ভাইই তাঁদের জীপ ও ড্রাইভাব দিতে চেয়েছেন এবং তাঁদের কাছে শুনেছি তাঁদের ড্রাইভার মিঞাদাস জঙ্গলে খুব ভাল গাড়ী চালাতে পারে। ওখানে যত বড় বড় শিকারী আসে সকলেই তাকে চায়। ওদের জীপটাও দেখলাম বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। দ্বিতীয়, একজন রান্নার লোক যে আমাদের শিকার ক্যাম্পে খাওয়ার দিকটা দেখতে পারে। তৃতীয়, আমাদের খাওয়ার জিনিষপত্র অর্থাৎ রসদ এবং চতুর্থ গোটাতুই পেট্রোম্যাক্স কি হ্যারিকেন বাতি। এইগুলি আমাদের বিশেষ জরুরী বলে সময় পেলেই আমি ওঁদের আভাস দিয়ে আসছিলাম। ২৯ তারিখের সান্ধ্য আসরে কুট্‌স মিঃ ঝাকে বিলিতি রান্না করতে পারে এমন একজন রান্নার লোক দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। কথাটা শুনে মিঃ ঝা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন—'ওখানে মাত্র একটি ওই ধরণের রান্নার লোক আছে— লোকটি জাতে মাদ্রাজী। ওখানকার নতুন কাগজের কলে কয়েকজন জার্ম্মান সাহেবের জন্য সে রান্না করতো। লোক পাঠিয়ে দেখি তাকে ঠিক করা যায় কিনা।' আমি মিঃ ঝাকে বললাম— আপনাদের অত কষ্ট করতে হ'বে না। আপনাদের গেষ্টহাউসের রান্নার লোকদের মধ্যে একজনকে দিলেই চলবে। কুট্‌স মিঃ ঝাকে আবার বললেন—'আমার দেশী খাবার খেলে হজম হয় না। ওই কাগজের কলের রান্নার লোককেই বন্দোবস্ত করুন। আরেকটা

জিনিষ আমার চাই। আমাকে একটা 'পোর্টেবল কমোড' বানিয়ে দিতে হবে। আপনাদের যদি না থাকে তাহলে আপনাদের কলিয়ারীর ছুতোরকে দিয়ে কাল সকালের মধ্যে তাড়াতাড়ি করিয়ে দিন।' মিঃ ঝা শুনে বললেন—'আচ্ছা দেখি।' আমার বন্ধুটির এই আবদার শুনে আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। যার ছেলে যত পায় তার ছেলে ততই চায়—কথাটির সত্যতা সেদিন বেশ বিরক্তির সঙ্গেই অনুভব করলাম। আমি এমনিতেই খুব লজ্জায় আছি তাঁদের দরাজ আদর যত্ন এবং আমাদের জন্য যে মোটা মোটা টাকা খরচ করতে হচ্ছে তার জন্য—তার ওপর এই অন্যায় আবদার! কিন্তু ওঁদের সবার সামনে আমি তেমন কিছু বলতে পারলাম না। আমি শুধু গম্ভীরভাবে মিঃ ঝা ও মিঃ দাবেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কাল তাহলে আমরা কখন রওনা হচ্ছি? ওঁরা বললেন—'সকাল এগারটা বারটার মধ্যেই। তার মধ্যে আপনাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলবো, তার আগে হয়ত হয়ে উঠবে না।'

জানলাম, চাঁদা থেকে আমাদের 'সুটিং ব্লক' প্রায় ১২৫ মাইল দূরে—ওখনে কিছুই পাওয়া যায় না। এমন কি চাল, আটা, নুন পর্যন্ত না। শুনে আমি বললাম—ওখানকার লোকেরা কি খায় না। ওঁরা দুজনে হেসে উঠে বললেন—'খায়, তবে কেনা বেচার কোন রেওয়াজ নেই। সব এখান থেকেই নিয়ে যায়—তাই আমাদেরও যাবতায় জিনিষপত্র এখান থেকেই নিয়ে যেতে হবে।' মিঃ দাবে জানাল—'আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব ভাবছি—আপনাদের ওখানে পেঁাছে দিয়েই ফিরে আসবো।' আমি বললাম—তার থেকে আপনি কয়েকদিন পর আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন কারণ ইতিমধ্যে ক্যাম্পের যে সব আবশ্যকীয় ফুরিয়ে যাবে বা কম পড়ে যাবে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারবেন, বিশেষ করে পেট্রোল। এ ছাড়া ২রা বা ৩রা এপ্রিল আমার এক বন্ধু ভবানী

গাঙ্গুলীর এখানে পোঁছনর কথা—তাকেও দয়া করে নিয়ে আসবেন। আমার বন্ধু গাঙ্গুলীর কথা ওঁদের আগেই বলে রেখে ছিলাম। মিঃ দাবে আমার কথা শুনে বললেন—ঠিক আছে, তাই হবে, এখন আমার গিয়ে কোন লাভ নেই। আমি গাঙ্গুলীকে নিয়ে যাব এই ব্যবস্থাই পাকা থাকল।' সে রাত্রে সভা ভাঙ্গলে আমি বিছানায় শুয়ে বন্ধুকে বললাম—'আপনার এই ধরণের অন্যায় আবদারের জন্য ওঁদের কাছে বড্ড লজ্জাবোধ করেছি। শিকারী হয়ে জঙ্গলে শিকার করতে এসে বিলিতি রান্নার লোক ও সেরকম খাবার চাই, 'কমোড চাই' এসব কি অন্যায় আবদার? আমার কথা শুনে কুট্টস তো রেগে আগুন। তিনি তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে বললেন—'আমি এখুনি আমার জিনিসপত্র গুটিয়ে নিচ্ছি। আমি কালই ফিরে যাব। আমি তোমার সঙ্গে শিকারে যাব না।' আমার এই বন্ধুটি আমার থেকে অন্ততঃ ৫।৬ বছরের বড় হবে, তাঁর এই ধরনের কথা-বার্ত্তা শুনে আমার খুব রাগ হোল, আমি গম্ভীরভাবে বললাম—বয়স্ক লোক হয়ে আপনি যদি এই ধরনের ছেলেমানুষি করতে চান ত' করুন, আমি কিছু বলবো না। এরপর আমি আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।

সকালে মিঃ ঝা তাঁদের একজন 'স্টোরস অফিসার'কে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তিনি শিকার ক্যাম্পে যা যা লাগবে তা ঠিকমত কিনে আনবেন। চায়ের টেবিলে বসে আমি তাঁকে একটা মোটামুটি ফর্দ্দ করে দিলাম এবং তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন কেনাকাটার জন্য। এদিকে আমরা আমাদের বাকী জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে স্নান খাওয়া সেরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেলা দশটার মধ্যে মিঃ ওঝাদের জীপ নিয়ে ড্রাইভার মিঞাদাস এসে হাজির। মিঞাদাসের বেশ শক্ত মজবুত লম্বা চেহারা। লোকটি খুব ভদ্র এবং পরে দেখলাম সে খুব যত্ন নিয়ে গাড়ী চালায়। সাড়ে এগারটার মধ্যে 'স্টোরস অফিসার' ভদ্রলোকটি যাবতীয় মালপত্র

কিনে নিয়ে এলেন এবং আমরা সাথেসাথেই তা আমাদের জীপের ট্রেলারে তুলে ফেললাম। বেলা প্রায় ১২টা সময় মিঃ ঝা ও মিঃ দাবে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং আমাদের জিজ্ঞেস করলেন ফর্দ্দমাফিক সব জিনিষপত্র পেয়েছি কিনা? আমি স্টোরস অফিসারকে দেখিয়ে বললাম—ইনিই ফর্দ্দ নিয়ে গিয়েছিলেন, আশা করি সব জিনিষ সেইমত এনেছেন। মিঃ ঝা বললেন—'এঁর নাম নম্বুদ্রিপাদ। এঁকে আপনাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি ওখানে যা যা দরকার সব কিছুর ব্যবস্থা করার জন্য।' আমি শুনে খুব খুশী হলাম। মিঃ ঝা বললেন—'কাগজের কলের সেই রান্নার লোকটি পাওয়া গিয়েছে—তাকেও আপনাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি।' শুনে আমার বন্ধুর মুখে হাসি ফুট্‌ল। জিনিষপত্র দিয়ে ভরা ট্রেলার সমেত জীপটায় নম্বুদ্রিপাদ ও রান্নার লোককে চাপিয়ে আমরা আগেই তাদের রওয়ানা করিয়ে দিলাম। তারপর মিঃ ঝা ও মিঃ দাবের সাথে হাত মিলিয়ে এবং বন্ধু গাঙ্গুলী এলে তাকে নিয়ে যাবার কথা আবার ভাল করে বলে দিয়ে আমরাও যাত্রা সুরু করলাম।

চাঁদা শহর থেকে ১৫।২০ মাইলের মধ্যেই পড়ল দুপাশে গভীর জঙ্গল। চাঁদা শহরটিও বেশ বড়। কোর্ট কাছারি, ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের অফিস, সিনেমা হল তো আছেই—তাছাড়া চাঁদা শহর মধ্যপ্রদেশের সেগুন কাঠ বিক্রীর একটা বড় ব্যবসার জায়গা। শহর থেকে বেরুবার মুখে গভর্ণমেণ্টের একটা বড় কাঠের আড়ত আছে—সেখানে একটা বিরাট সেগুন গাছ কাটা অবস্থায় পড়ে আছে যার ব্যাস অন্ততঃ ৯-১০ ফুট এবং লম্বায় ২৫।৩০ ফুট হবে, এত মোটা সেগুন গাছের গুঁড়ি আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। আমাদের জীপগাড়ী দুপাশের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে। বনের সেই বিশালতায় একটা প্রচণ্ড আশা দুজনের মনে উঁকি মেরে প্রচুর আনন্দ ও ভরসা এনেছিল, মনে হচ্ছিল শিকার সম্ভাবনা এখানে পর্যাপ্ত থাকায় আমাদেয় উভয়ের ভাগ্যই সুপ্রসন্ন। রাজার হালে

থেকে খেয়ে ও চলাফিরা করে রাজরাজড়াদের মতই যত পশু শিকার নিয়ে এবার ফিরতে পারব। চাঁদা থেকে ১০০ মাইল যাবার পর আমরা আলাপল্লী বলে একটা জায়গায় এলাম। সেখানে সি. পি. ডব্লিউ. ডি.-র একটা বহু পুরোন বাংলো এবং একটা ফরেষ্ট বাংলো দেখলাম। আলাপল্লী মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের বনবিভাগের সেগুনকাঠ বিক্রীর একটা কেন্দ্র। সেখানে ছোটবড় অনেক বাড়ীও রয়েছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের এবং রেঞ্জ অফিসও আছে—আমাদের স্যুটিং ব্লক দুটি আলাপল্লী রেঞ্জ অফিসের আওতায় পড়ে। তাই আমরা ওখানে নেমে রেঞ্জারের বাড়ী ও তার অফিসের খোঁজ করলাম। নিয়ম হচ্ছে স্যুটিং ব্লকে ঢোকবার আগে বনবিভাগের অফিসারদের জানিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে হয়। ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার, রেঞ্জার বা ফরেষ্ট গার্ড যাকে যেখানে পাওয়া সম্ভব তাকে জানিয়ে এবং স্যুটিং পারমিট দেখিয়ে এবং তাদের অনুমতি নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার নিয়ম। তাই আমরা রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করার জন্য আলাপল্লীতে তার খোঁজ করলাম। কিন্তু শুনলাম তিনি 'টুরে' গেছেন। তাই আমরা 'রেঞ্জ অপিসে' একটা চিঠিতে খবর রেখে গেলাম এবং জানিয়ে দিলাম সুবিধে হলে আমরা অবার এসে তার সঙ্গে দেখা করে যাব। আমরা যখন আলাপল্লী পৌঁছেছি তখন বিকেল ৫টা বেজে গেছে। আমাদের আরও মাইল পঁচিশ পথ যেতে হবে। তাই আর সময় নষ্ট না করে আমরা রওনা হলাম।

দুপাশের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীপ দুটো চলেছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রাস্তার বাঁহাতি জায়গায় আমরা খুব বড় বড় জংলিশুয়োরের পাল দেখলাম। আমাদের বন্দুক ও গুলি সবই বাক্সে বন্ধ করা আর তাছাড়া সেদিন ৩১শে মার্চ্চ আমাদের পারমিট শুরু হচ্ছে ১লা এপ্রিল থেকে। কিছুদূর যেতেই আমাদের একপাল চিতরা হরিণ নজরে পড়ল

প্রায় ১৫।২০টা হবে। আরও কিছুদূর যেতে ডানহাতি তিনটে মাদী সম্বর হরিণ দেখলাম যার মধ্যে একটা তো যে কোন বিলিতি ঘোড়ার মাপের হবে। অতবড় মাদী সম্বর বোধহয় জীবনে আমি প্রথম দেখলাম। এইসব জন্তুজানোয়ার দেখতে দেখতে বড় রাস্তা ধরে আমরা এমন এক জায়গায় এলাম যেখানে বাঁহাতি একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে এবং মোড়ে একটা কাঠের ফলকে হিন্দিতে কিছু লেখা আছে। তখনও দিনের আলো কিছু কিছু আছে, সেই আলোয় অস্পষ্ট লেখা পড়ে আমার সাথীরা বল্ল এই কাঁচা রাস্তা ধরে বাঁদিকে গেলে আমরা "জীমলগাট্টা" ফরেষ্ট বাংলোতে পৌঁছব। সেটা ওখান থেকে প্রায় ২।৩ মাইল। কিছুদূর যেতেই আমরা কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম—বুঝতে পারলাম আমরা এসে পড়েছি। আরেকটু যেতে কয়েকটি মাটির ঘর দেখতে পেলাম—রাস্তার দুধারে ছোট একটা বস্তী। সেইটে পার হতেই সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট একখানি ফরেষ্ট বাংলো আছে। দুখানা শোবার ঘর, তাদের লাগোয়া বাথরুম ও সামনে পেছনে এক এক ফালি সরু বারান্দা কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। পেছনের বারান্দায় দুপাশে দুটি ছোট ছোট ভাঁড়ার ও রান্নাঘর। শোবার ঘরে কিছু কিছু আসবাবপত্র রয়েছে—নেয়ারের খাটিয়া, ড্রেসিং টেবিল ও খানচারেক করে চেয়ার—সব মিলিয়ে পরিবেশটি আমার খুব পছন্দ হোল। আমরা মালপত্র নামিয়ে সব ঠিকমত গুছিয়ে নিয়ে চৌকিদারকে দিয়ে জল আনিয়ে আমরা ভাল করে স্নান করে বারান্দাতে এসে দেখলাম সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে।

রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। বসে বসে আমরা কাছে এবং দূরে নানারকমের জন্তু জানোয়ারের ডাক শুনতে পেয়ে আশা করলাম শিকার হয়ত ভালই হবে। রাত্রি এগারটা নাগাদ আমাদের খাওয়ার ডাক পড়ল এবং খেয়ে নিয়ে শুয়ে

পড়লাম। দিনের বেলায় ওখানে যেমন প্রচণ্ড গরম রাত্রে তেমনি বেশ ঠাণ্ডা। কুট্‌স শুয়ে শুয়ে বলে যাচ্ছিল—'কাল খুব ভোর ভোর উঠে আমরা বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে বেরুব। জন্তু জানোয়ারের পায়ের দাগ, কোথায় কোথায় জল খেয়েছে সে সব আমরা নিজেরা গিয়ে দেখে আসবো।' আমিও সম্মতি জানিয়ে বললাম—সেটা খুবই দরকার। নতুন জঙ্গল, এখানকার 'গেম ট্র্যাক' ও জলখাবার জায়গাগুলো আমাদের জানা দরকার। এইসব আলোচনা করতে করতে আমরা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা।

ঘুম ভাঙ্গল ১লা এপ্রিল প্রায় ভোর সাড়ে তিনটেয়। দেখি কুট্‌সও উঠেছে এবং হাতমুখ ধুচ্ছে। আমিও উঠে হাতমুখ ধুয়ে শিকারের পোষাক পরে নিলাম—ফিকে সবুজ রঙের বুশ কোট, প্যাণ্ট ও টুপি। কুট্‌সও জামাকাপড় পরতে পরতে একজোড়া ক্যানভাসের মিলিটারী বুট দেখিয়ে বললেন যে তাঁর যে শালা সেনাবাহিনীতে আছেন তিনি ওই জুতো পাঠিয়েছেন। বুট্‌জোড়া এত নরম যে ওটা পরে ৩০।৪০ মাইল অক্লেশে হাঁটা যায়। কোন কষ্টই হয় না হাঁটতে। আমি শুনে বললাম, খুব ভাল কথা। আমারও একজোড়া খুব ভারী বুট জুতো আছে—তলায় খুব মোটা ক্রেপ দিয়ে বানান। ওটা আমি বহুকাল আগে শিকারের জন্যেই করিয়েছিলাম। যাক আমরা সাজগোজ সেরে ভোরের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। কুট্‌সের হাতে ·২২ বোরের রাইফেল। বলল—'আমি ·২২টা নিচ্ছি যদি জংলী মুরগী বা তিতির পাই।' আমি নিয়েছি আমার প্রিয় ·৪০৫ উইঞ্চেষ্টার রাইফেল। "জীমলগাট্টা" ফরেষ্ট বাংলোর পেছনে একটা বেশ চওড়া ও নিচু পাহাড়ী নদী বা নালার মত দেখে আমরা সেই নালাতে নেমে পড়লাম। নালার বেশীর ভাগই শুকনো কোথাও বা এক আধটু জল আছে। আমরা প্রত্যেকটা জলের জায়গা ও নালার দুপাশের 'গেমট্র্যাক'গুলো পরীক্ষা করতে করতে এগুতে লাগলাম। বাংলো থেকে মাইল খানেক আসার পর নালার

ডানদিকে একটা 'গেমট্র্যাকে' বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। কুট্‌সকে ডেকে দেখিয়ে আমরা সেই দাগ ধরে আরও কিছুটা এগুতে দেখলাম একটা ছোট জলের জায়গায় বাঘটা গত সন্ধ্যের দিকে জল খেয়েছে। প্রথম দিনেই বাংলো থেকে মাইল খানেকের মধ্যে বাঘের পায়ের দাগ দেখে আমরা দুই বন্ধুতে খুব খুশী হলাম। এইভাবে নালা ধরে আরও ৩।৪ মাইল এগিয়ে ঘোরাঘুরি করে ফেরার পথে দেখি আমার বন্ধু খোঁড়াচ্ছেন এবং বারবার সেই বহু প্রশংসিত জুতোর ফিতে খোলা-বাঁধা করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি? শুনলাম নতুন জুতোয় তাঁর দুপায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেছে এবং খুব লাগছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনি কোন রকমে বাংলোয় ফিরে এলেন এবং জুতো খোলার পর পায়ের যা অবস্থা দেখলাম তাতে মনে হোল তাঁর পক্ষে পায়ে হেঁটে আবার জঙ্গলে যাওয়ার দফা রফা হয়ে গেছে। হায়রে ৩০।৪০ মাইল হাঁটার জুতো!

আমি নম্বুদ্রিপাদকে ডেকে আমাদের জন্যে দুটো মাঝারি মাপের মোষ জোগাড় করতে বললাম এবং খোঁজ করতে বললাম একজন ভাল স্থানীয় শিকারীর যে আমাদের বাঘের সব খবর এনে দিতে পারবে এবং যে মাচান বাঁধা, মোষ বাঁধা ইত্যাদি সব জানে। সে চলে গেল মোষ ও শিকারীর সন্ধানে—তখন সকাল ন'টা হবে। আমরা বসলাম প্রাতঃরাশে, চা, টোষ্ট, ডিম, পরিজ ইত্যাদি নিয়ে। কুট্‌স ফোস্কাতে নানারকম ওষুধ লাগিয়ে 'আঃ' 'উঃ' করতে করতে চা খেয়ে বিছানায় শুলেন ট্রানসিস্‌টার নিয়ে। আমি বারান্দায় বসে নানান ভাবনা ভাবতে লাগলাম। বেলা প্রায় ১২টার সময় নম্বুদ্রিপাদ ফিরে এলো ঘামতে ঘামতে, সঙ্গে একটা মস্ত পাগড়ী-ওয়ালা লম্বা চওড়া লোক। লোকটির বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে—সে আমাকে একটা লম্বা সেলাম করল। নম্বুদ্রিপাদ বলল—'এই লোকটি এখানকার খুব নামকরা শিকারী। এখানে যারা শিকারে আসে, সবাই একে ডাকে। এর নাম শম্ভু শিকারী।' আমি শম্ভুকে

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি হিন্দিতে কথাবার্ত্তা বলতে পার? সে মাথানেড়ে বলল—পারে। আমাদের শিকারের জায়গাটা মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মাঝামাঝি তাই ওখানকার লোকদের কথাবার্তা বোঝা খুবই কষ্ট। তারা না হিন্দি না মারাঠি—এ দুয়ের মাঝামাঝি এক রকমের ভাষা বলে। শম্ভু হিন্দি জানায় আমাদের খুব সুবিধে হোল। আমি নম্বুদ্রিপাদকে জিজ্ঞাসা করলাম—মোষের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? সে বল্ল—'অনেক কষ্টে একটা মাঝারি মাপের মোষ পাওয়া গেছে—দাম ৭৫·০০ টাকা, বিকেল ৩।৪টের মধ্যে মোষটা পোঁছে যাবে। আরেকটা মোষের খোঁজ করছি কিন্তু এখনও পাইনি। এখানকার লোকে শিকারের জন্য মোষ বেচতে চাইছে না। সকলে বলছে ক'দিন পরে এখান থেকে ১০।১২ মাইল দূরে একটা হাট হয়। সেখানে যত খুশি কিনতে পারা যায়।' আমি মনে মনে ভাবলাম আমাদের বরাত ভাল, অন্ততঃ একটা'ত পাওয়া গেছে। আমি এমন এমন জায়গাতেও শিকার করতে গিয়েছি যেখানে লোকেরা শিকারী দেখলেই ৩০।৩৫ টাকার মোষের বাচ্চার দাম ২০০ টাকা চেয়ে বসেছে এবং এক পয়সাও কমাতে চায় নি। আবার এমনও অনেক জায়গা দেখেছি যেখানে শিকারীদের বাঘকে খাওয়াবার জন্য মোষ বা ছাগল তারা বেচেই না। বাঘে ওদের গরু ছাগল মোষ প্রতি মাসে দু-একটা করে মেরে নিয়ে যাবে সেও আচ্ছা তবুও তারা শিকারীকে বেচবে না, আমার এ জাতীয় অনেক অভিজ্ঞতা আছে।

শিকার নিয়ে শম্ভুর সঙ্গে অনেক কথা হোল। আমি তাকে বললাম—তোমার প্রধান কাজ হবে বাঘের খবরাখবর আনা কোথায় বাঘে জল খেয়েছে, কোথাও কোন মারী হ'য়েছে কিনা—মারীর খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবে। এখন খুব গরম পড়েছে তাই দুপুরে বাঘ জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে পারে। সেই ধরণের জল কোথায় আছে সেই সব জলের ওপর খুব সাধধানে

লক্ষ্য রাখতে হবে। মারীর খবর পেলেই খুব তাড়াতাড়ি মাচান বাঁধতে হবে। এই সব তোমার কাজ। সে ঘাড় নেড়ে বলল—'জী হাঁ ঠিক হ্যায়।' তাকে তখন বললাম—তাহলে তুমি চলে যাও এবং দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে তোমাকে যে ধরণের খবর আনতে বললাম সেই সব খবর নিয়ে তুমি সন্ধ্যের সময় এখানে এসে বলে যেও কি দেখলে না দেখলে। শম্ভু সেলাম করে চলে গেলে আমি গেলাম স্নান করবার জন্য; দেখি কুট্স স্নান সেরে ট্রানসিসটার শুনছেন। আমি তাঁকে শম্ভু শিকারী ও মোষের খবর বলাতে তিমি বললেন—'আরেকটা মোষ তো চাই না হলে কি করে হবে? এমনিতেই আমরা দুজন শিকারী আর তা ছাড়া ক'দিন পরে তোমার আর এক বন্ধু গাঙ্গুলী আসছে।' আমি বললাম আর একটা মোষের জন্যেও বলেছি এবং তার চেষ্টাও করা হচ্ছে। এখন যদি আর না পাওয়া যায় তাহলে আপাততঃ একটাতেই কাজ চালাতে হবে। তাছাড়া উপায় কি বলুন? দেখলাম বন্ধুটি খুব খুশী হলেন না, তাঁর অখুশী হবার আরেকটা কারণ—আমার বন্ধু ভবানী গাঙ্গুলীকে শিকারে আসার নিমন্ত্রণ করেছি বলে—সেটা তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু আমাকে জোর করে কিছু বলতে পারছেন না কারণ এই রাজসিক শিকারের সব ব্যবস্থাটাই আমার করা।

তারপর স্নান সেরে আমরা খেতে বসলাম। কাগজের কলের বিলিতি রান্না জানা লোকটি ভালই খাওয়াল। মুরগীব মাংস, ভাত ও তার সঙ্গে আরও দুএকটা পদ—কপির তরকারী, ডাল ও বোতলের চাট্নি। ভাল খাবার পেয়ে বন্ধু তো খুব খুশী। উপস্থিত কিছু করার না থাকায়, খাওয়া দাওয়ার পর আমরা দরজা বন্ধ করে খুব একটা লম্বা ঘুম দিলাম। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে আমরা গল্প করতে লাগলাম। সন্ধ্যের কিছু আগে শম্ভু এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলে তাকে জিজ্ঞাসা

করলাম—কি কি দেখলে বল? সে হতাশায় সিঁড়ির উপর বসে জানাল, আজ এই জঙ্গলে সে বাঘের কোন খোঁজ খবর পায়নি। আমি তাকে আমাদের সকালের দেখা বাঘের পায়ের দাগের কথা এবং কোন খানে আমরা দেখেছি তা বলার পরেও সে বলল ওই দিকটা সে যায়নি তবে বাকী যে সব জায়গাতে এ অঞ্চলে বাঘের খবর পাওয়া যায়, সে সেই সব জায়গা সমস্তই দেখে এসেছে—কিন্তু সেখানে বাঘের কোন চিহ্ন সে খুঁজে পায়নি। আমি সব শুনে বললাম—কাল খুব ভোরে উঠে তুমি জঙ্গলে যাবে এবং বাঘের তাজা পায়ের দাগ, বাঘ কোথায় কোথায় জল খেয়েছে ইত্যাদি সব দেখে খবর নিয়ে আসবে। সে বলল—'জী হাঁ'।

সেদিন ১লা এপ্রিল। ক্রমে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এমন সময় শম্ভু বলে উঠল—'সাহাব চলিয়ে, জীপ গাড়ীসে থোড়া ঘুমকে আয়গা।' কথাটা শোনার পর কুট্সের খুব উৎসাহ দেখলাম। উনি বলে উঠলেন—"খুব ভাল বলেছে। এখানে শুধু শুধু বসে থেকে কি হবে? তার চেয়ে জঙ্গলে ঘুরে আসা ভাল।" তার যুক্তিহীন কথা শুনে বললাম—তাত ভালই কিন্তু জীপের পেট্রোল যদি এই ভাবে খরচ করি তাহলে দরকারের সময় পেট্রোল পাব কোত্থেকে? পেট্রোল সেই চাঁদা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তার মানে এখান থেকে ১২৫ মাইল গিয়ে পেট্রোল নিয়ে আবার ১২৫ মাইল ফিরে আসতে হবে। আমাদের সঙ্গে যদিও দুটো আলাদা মাঝারি ড্রামে ৪০।৫০ গ্যালন পেট্রোল রাখা আছে যা আমরা এখানে পাওয়া যায় না বলে সঙ্গে করে এনেছিলাম, কিন্তু তা খরচ করা কি ঠিক হবে? আমার কথাগুলো বন্ধুর মোটেই ভাল লাগল না বুঝলাম, তাই তিনি মুখ গোমড়া করে ঘরে গিয়ে ট্রানসিসটার বাজাতে লাগলেন। নির্বিবাদে নিখরচায় সব হচ্ছে বলেই—তাঁর এত বায়না।

কিছুক্ষণ পর আমাদের ড্রাইভার মিঞাদাসকে ডেকে পাঠালাম।

সে আসতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—জীপের ট্যাঙ্কে কত পেট্রোল আছে? সে বলল—'জীপের ট্যাঙ্ক ভরতি আছে এবং ছুটো ড্রামে আরও ৪০।৪৫ গ্যালন পেট্রোল আছে।' সব শুনে আমি ভাবছি কি করা যায়। মিঞাদাস আমাকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করল—'কেঁও সাব, কিয়া বাত হ্যায়?' আমি তাকে বললাম—সাহেবের ইচ্ছে জীপ নিয়ে খানিক জঙ্গলে ঘুরে আসার, পাছে পেট্রোল ফুরিয়ে যায় তাই আমি রাজী হচ্ছি না। সে শুনে বলল—'দাবে সাহাব কো তো ২।৩ তারিখেমে আনেকা বাত হ্যায়। সাহাব জরুর হামলোকঁন কা বাস্তে পেট্রোল লে কর আয়গা। হামভী দাবে সাহাব কো আউর ওঝা সাহাব কো বোলকে আয়া।' শুনে বললাম—যদি ওরা না আসে বা পেট্রোল আনতে ভুলে যায়, তখন কি হবে? মিঞাদাস বলল—'এ কভী হো নেহী সেক্‌তা। হামলোক জঙ্গলমে পড়া হ্যায়। আউর ও লোক জানবুঝকে কভী এইসা কর নেহী সেক্‌তা। দাবে সাহাব যব বাত দিয়া তব জরুর লেকে আয়গা।' সব শুনে আমি ঠিক করলাম, তবে খানিক ঘুরেই আসা যাক—তবে হরিণ মারা হবে না। খালি বাঘ, চিতা কি জংলী শুয়োর ছাড়া অন্য কোন জন্তু জানোয়ারের ওপর গুলি চলবে না। বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে কাপড় জামা বদলে তৈরী হয়ে নিলেন আমিও পোশাক পরে নিয়ে মিঞাদাসকে গাড়ী আনবার জন্য বললাম। মিঞাদাস গাড়ীটা বাংলোর সামনে এনে রাখতে দেখি সে একটা স্পট লাইটও এনেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে স্পট লাইটটা লাগান হলে আমরা ছুই বন্ধু রাতের অন্ধকারে সফরের জন্য বের হলাম। সঙ্গে আমার অতি প্রিয় ·৪০৫ রাইফেল, তাতে টর্চের মাথাটা ক্ল্যাম্প করে লাগান এবং সঙ্গে একটা টেপা স্যুইচ আর আমার পকেটে একটা বাক্সে ছ'সেলের ব্যাটারী আছে। স্যুইচ টিপলেই ছ'সেলের টর্চ জ্বলে উঠে নিমেষের মধ্যে রাইফেলের সামনের দিক আলোকিত করে তোলে—সেই আলোতে জন্তু-জানোয়ারদের সঠিক জায়গা বুঝে গুলি

চালাতে খুব সুবিধে হয়। জিনিষটা আমার নিজের তৈরী এবং বহু কাজে এসেছে। কুট্‌স নিয়েছেন ·৩০-০৬ রাইফেল। আমরা "জীমলগাট্টার" ফরেষ্ট বাংলোর গেট ছাড়িয়ে ২০।২৫ হাত তফাতে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেঞ্জারের বাড়ীর কাছে এসে থেমে জিজ্ঞাসা করে জানলাম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেঞ্জার ক'দিন হোল 'টুরে' গেছেন এবং তু তিন দিনের মধ্যে ফিরবেন। পাশেই একটা ঘরে ফরেষ্ট গার্ডকে পেলাম এবং তাকে আমাদের সংগে আসার জন্য অনুরোধ জানাতে সে আমাদের গাড়ীতে এসে উঠল। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেঞ্জারের ঘরের পাশ দিয়ে জীপ চালিয়ে বস্তী পার হতেই দেখি জীপের হেড লাইটের আলোয় এবং স্পট লাইটে জোনাকীর মতন এদিক-ওদিক হাজারো চিত্‌রা হরিণের চোখ জ্বলছে। একসঙ্গে প্রায় ৬০।৭০টা—কি তার বেশীও হতে পারে! এক অপূর্ব দৃশ্য! গভীর বনজঙ্গলে প্রাকৃতিক পরিবেশে কত অপরূপ রূপে দেখা যায় জন্তু-জানোয়ারদের—তার বর্ণনা দেওয়া লেখকের সাধ্য নেই? শুধু এটুকু বলতে পারা যায়—জন্তুজগতের ঐ ঐশ্বর্যের সংগে যাঁরা পরিচয় লাভ করেছেন—বিরাট আকর্ষণীয় ঐ রূপ তাঁদের চিরদিন টেনে নিয়ে যাবে সেখানে; প্রাণবন্ত অথচ নিথর নির্জনতাময় প্রকৃতি তাঁর কতরকম সন্তান সন্ততিদের নিয়ে আবহমান কাল থেকে চলেছেন অসীমের সময় প্রবাহে। মানুষের অনুভূতিময় হৃদয়বৃত্তিতে ঐ পরিবেশ একটি মনোরম একাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে সর্বস্তরের প্রাণীজগতের সঙ্গে। মানবিক সভ্যতার কঠোর কাঠামোতে তার স্পন্দন ব্যাহত হয়ে ফিরে যায়। আমরা ওখানে গাড়ী থামিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হরিণগুলোকে লক্ষ্য করলাম; তারাও দেখলাম পালাবার বিশেষ চেষ্টা করলো না। এই দৃশ্য বেশ খানিক উপভোগ করে রাস্তার তুধারে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা খুব আস্তে আস্তে গাড়ী চালাতে চালাতে তুপাশের জঙ্গলে স্পট লাইট ফেলে দেখতে লাগলাম। স্পট লাইটে বাঘ বড় একটা

দেখতে পাওয়া যায় না। শিকারের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাতে আমি মাত্র একবার বহুদূর থেকে স্পট লাইটে বাঘ দেখেছিলাম—তারপর আর কখনও আমার সে সৌভাগ্য হয়নি। চিতাবাঘ স্পট লাইটে দেখা যায় প্রায়ই এবং মারাও পড়ে। আমি নিজে জীপের আলোতে চিতাবাঘ দেখেছি এবং তিনটে মেরেওছি। সে ঘটনা পরে জানাবার ইচ্ছে রইল।

এইভাবে জীপে করে চলতি রাস্তা ধরে আমরা ৬।৭ মাইল জঙ্গলের মধ্যে এক চক্কর মেরে ফিরে এলাম। বাঘ, শুয়োর বা চিতা আমাদের নজরে পড়েনি। ফিরে এলাম প্রায় রাত সাড়ে ন'টায়। জামা কাপড় বদলে বারান্দায় বসে গল্প করতে লাগলাম। এমন সময় বেয়ারা এসে বলে গেল—'খানা টেবিল পর লাগা হ্যায়।' তুজনে হাতমুখ ধুয়ে গল্প করে খেতে খেতে কয়েকবার বাংলোর খুব কাছে সম্বর ও চিত্‌রা হরিণের ডাক শুনতে পেলাম। কুট্‌স সে সব শুনে বললেন—'সত্যিই এটা শিকারের খুব ভাল জায়গা। বাংলোর ধারে বস্তীর কাছেই সন্ধ্যে ৯ টায় একসঙ্গে ৬০।৭০ টা হরিণ ঘুরছে, এটা কি বিহারের কোন জঙ্গলে সম্ভব হোত? এত হরিণ শুয়োর আমরা এ পর্যন্ত একসংগে দেখিনি।' আমিও ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। আমরা খুব তৃপ্তি করে খেয়ে বারান্দাতে আরাম কেদারায় বসে মনে হল তখন বেশ ঠাণ্ডা এবং রাত বাড়ার সংগে সংগে ঠাণ্ডাও যেন বাড়ছে। অল্পক্ষণ মধ্যেই কুট্‌স শুতে চলে গেলেন এবং আমি অনেক রাত পর্যন্ত বসে জঙ্গলের নানা জন্তু জানোয়ারের ডাক ও কৌতূহলভরা ইঙ্গিত শুনতে থাকলাম। রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় আমি শুতে গেলাম। তখন আকাশে একফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানারকম চিন্তা করতে লাগলাম আগামী কাল বাঘের খবরাখবর জোগাড় করা চাইই, একবার আশপাশের গ্রামগুলোতে যাওয়া দরকার, গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে কোথায় বাঘ আছে, কবে মারী করেছে এসব খবর নেওয়া দরকার। ওদের

গ্রামে মারী করলে ওরা যেন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খবরটা দেয় তাহলে বকশিস পাবে—এইভাবে লোভ দেখিয়ে বুঝিয়ে বলাও দরকার। ছ'টো সুটিং ব্লকে যে ক'ঘর আদিবাসী আছে তাদের সাথে আলাপও করা প্রয়োজন, বাঘের সঠিক খবরাখবর না পেলে আন্দাজে টোপ বাঁধার কোন মানে হয় না। এইভাবে নানান ভাবনা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। উঠেই তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নিলাম। কুট্‌সের দেখলাম ওঠার মোটেই ইচ্ছে নেই। প্রথমদিন নতুন জুতো পরে পায়ে ফোস্কা হবার পর তাঁর সব উৎসাহ শেষ হয়ে গেছে। তবুও আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি আমার সঙ্গে যাবেন কি না? তার উত্তরে তিনি বললেন—না, তাঁর পায়ের অবস্থা খুব খারাপ। আমি আর সময় নষ্ট না করে কাঁধে ·৪০৫ রাইফেলটা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাংলোর পেছনের নালাটায় যে সব জায়গাতে জল আছে সেই সব জল পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে গেলাম প্রায় ৪।৫ মাইল। প্রত্যেকটি জলের জায়গাতেই হরিণের পায়ের দাগ দেখলাম। কিন্তু বাঘ বা চিতা বাঘের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল। বাংলোতে ফিরে এলাম প্রায় ন'টায়। ফিরে দেখি কুট্‌স সকালের খাবার খেয়ে বারান্দায় বসে বেশ একটু জোরেই ট্রানসিসটার বাজাচ্ছেন। বাংলোটার কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া জায়গাটার বাইরে একটা বেশ বড় বাঁধান কূয়া আছে। জীমলগাট্টা ফরেষ্ট বাংলোকে কেন্দ্র করে যে কয়েক ঘর আদিবাসী নিয়ে একটা বস্তীমত গড়ে উঠেছে তারা সবাই সকাল সন্ধ্যে ওখান থেকে জল নেয়। ছেলে মেয়ে বৌ বাচ্চারা সবাই আসে কুয়াতলায়। দেখি, এরা সবাই অবাক হয়ে বন্ধুর ইংরাজী বাজনা শুনছে। ভিতরে গিয়ে ঘর্মাক্ত জামা কাপড় ছেড়ে রাইফেল রেখে বারান্দাতে ফিরে এসে একটা আরাম কেদারা টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। বন্ধুকে রসিকতা করে বললাম—আপনি

ত দেখছি এখানকার সব আদিবাসী মেয়েদের হৃদয় জয় করে ফেলেছেন ইংরাজী বাজনা বাজিয়ে। দেখবেন ফিরে যাবার সময় ওদের কেউ যেন না আবার গলায় মালা দিয়ে বসে। তাহলে ফিরে গিয়ে আপনার বদলে আমাকেই মেমসাহেবের কাছ থেকে মার খেতে হবে। শুনে তিনি খানিক হাসলেন। খানিক পরে বেয়ারা আমার চা ও খাবার নিয়ে এ'ল। চা খেতে খেতে দেখি শম্ভু আসছে। আমি মনে মনে তার কথাই ভাবছিলাম। তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলাম—'শম্ভু, আব বাতাও, শের কা পাত্তা মিলা কেয়া নেহী?' সে বলল—'নেহী সাহাব। কোই পাত্তা নেহী মিলা।' শুনে আমার মনটা বড় দমে গেল। আবার তাকে বললাম, দুপুরবেলায় সব জলের জায়গাগুলো ভাল করে দেখতে এবং বিকেল চারটা পাঁচটা নাগাদ এসে খবর দিতে। মনে করলাম ওকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে যে সব ছোটখাট বস্তী আছে সেখানে যাব এবং খবর নেব, বাঘে কোন মারী করেছে কি না? ইতিমধ্যে জঙ্গলের কয়েকটি ঠিকেদার ও তাদের লরী ড্রাইভাররা আমাদের সংগে আলাপ করতে এল। ওদের কাছে যা শুনলাম তা খুবই আশাপ্রদ। তারা বললে ওখানে প্রচুর বাঘ ও চিতা আছে—চিতাগুলোতো সন্ধ্যো থেকে কুকুরের মতন ঘুরে বেড়ায়, বাঘও অনেক আছে। শুনে বললাম, আমরা তো তার কোন নমুনা পাচ্ছি না। তারা সকলে আশা দিয়ে বলে গেল, পাবেন। আমরা উঠে একে একে স্নান সেরে নিয়ে খেয়েদেয়ে একটা লম্বা ঘুম দিলাম। বিকেল ৪টের মধ্যে উঠে আমরা দুই বন্ধু জামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিয়ে মিঞাদাসকে জীপ আনতে বললাম। মিঞাদাস সব সময়েই প্রস্তুত। ঠিক করলাম, দিনের আলো থাকতে থাকতে আমরা এঙ্কাবাণ্ডা" ব্লকের জঙ্গলের মধ্যে যে সব আদিবাসীরা বাস করে তাদের সংগে দেখা করবো এবং ফেরার সময় একটু দেরী করে ফিরবো যদি সন্ধ্যের অন্ধকারে জীপের বাতিতে চিতা বা শুয়োর পাওয়া যায়। গাড়ীতে

করে বন্ধুর ঘোরার খুব উৎসাহ দেখলাম—পায়ে হেঁটে সে আর বেরুতে নারাজ। ইতিমধ্যে শম্ভুও ফিরে এ'ল। জানতে চাইলাম বাঘের কোন খবর সে জোগাড় করতে পেরেছে কিনা। সে জানাল 'না'। যা হোক আমরা তৈরীই ছিলাম—শম্ভুকে জীপে বসিয়ে আমরা রওনা হ'লাম। জঙ্গলের সব বস্তীতে নেমে নেমে আমি শম্ভুর মাধ্যমে তাদেব বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমরা দুই শিকারী ওখানে বাঘ শিকারের জন্য এসেছি এবং "জীমলগাট্টা" ফরেষ্ট বাংলোতে আছি। তাদের গরু, বাছুর বা মোষ বাঘে মারী করলে তারা যেন তাড়াতাড়ি এসে আমাদের খবর দেয়। তাড়াতাড়ি তাজা খবর দিতে পারলে বকশিস পাবে আর আমরা বাঘ মারতে পারলে তাদের বস্তীর সব্বাইকে পেটভরে হাড়িয়া খাওয়াব। জঙ্গলের লোকেদের টাকা পয়সার চাইতে হাড়িয়া খাবার লোভ বেশী, তাই আমি তাদের হাড়িয়ার লোভ দেখালাম। ওরা সকলেই ঘাড় নেড়ে বললে খবর দেবে। এই করতে করতে আমরা "ইঙ্কাবাণ্ডা" জঙ্গলের একদিক দিয়ে ঢুকে অপরদিকে এসে বড় রাস্তায় পড়লাম। সেখানে বনবিভাগের ছোট ছোট কয়েকটি ঘর এবং রাস্তার ধারেই একটা চায়ের দোকান দেখলাম। চায়ের দোকানের সামনে আমরা জীপ থামিয়ে মিঞাদাসকে বললাম ভাল করে চা বানাতে বল এবং সকলকে চা খাওয়াও। জানলুম জায়গাটার নাম রিপনপল্লী। শম্ভু সেখানকার ফরেষ্ট গার্ডের সংগে আমাদের আলাপ করিয়ে দিল। লোকটার নাম ইউসুফ। আমি তাকে খুব খাতির করে ইউসুফভাই বলে ডেকে চা খাওয়ালাম এবং জানলাম ইঙ্কাবাণ্ডা ও রিপনপল্লী এই দুই ব্লক তার নখদর্পণে। কোন ব্লকে ক'টা বাঘ, ক'টা বাঘিনী মায় ক'টা বাচ্চা পর্যন্ত আছে, সে সবই বলে দিতে পারে। এই সব শুনে আমিতো ইউসুফভাই-এর হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বললাম—'আপ হামলোগন কে লিয়ে কুছ মদত কিজীয়ে। বিগর আপকো মদতসে কুছ নেহী হো স্কেকতা।' আমার আপ্যায়নে ইউসুফভাই বেশ খুশী হয়ে সম্মতি জানালেন

সাহায্য করার। সন্ধ্যে আটটায় আমরা জীমলগাট্টার পথে রওনা হ'লাম। রিপনপল্লী থেকে জীমলগাট্টা প্রায় ১১।১২ মাইল। গাড়ী ছাড়তেই কুট্স খুব খানিক হাসতে হাসতে আমাকে ঠাট্টা করতে লাগলেন ইউসুফকে ভাই বলে ডেকে চা খাওয়ান ও খাতির করার জন্য। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—'এগুলো খুব দরকার। এরা যদি সাহায্য না করে, তাহলে একদম অজানা জায়গাতে এসে বাঘ শিকার করে নিয়ে যাওয়া কোন শিকারীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এসব লোককে হাতে রাখা খুবই দরকার।' ফেরার পথে রাস্তাতে কয়েক জায়গায় চিত্‌রা হরিণ দেখলাম এবং বহুদূরে একটা শুয়োরকে আমাদের বাতি পড়ার সংগে সংগে জঙ্গলের মধ্যে ছুটে চলে যেতে দেখলাম। এইভাবে বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা বাঁ-হাতি জীমলগাট্টার পথ ধরলাম এবং উদগ্রীব হয়ে রইলাম, বাংলোর কাছাকাছি হরিণগুলোকে দেখবার জন্য। আমাদের জীপ জীমলগাট্টার বস্তীতে ঢোকবার আগে একটা সেগুনের আবাদের মধ্যে প্রায় ৬০।৭০টা চিতরা হরিণের চোখ জ্বলতে দেখলাম। এতগুলো হরিণ একসংগে দেখে আমাদের খুব ভাল লাগল। বেশ কিছুক্ষণ হরিণগুলোকে দেখে আমরা বাংলোয় ফিরে এলাম।

জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করে আমরা খেতে বসলাম। মাদ্রাজী রান্নার লোকটি ভালই খাওয়াচ্ছিল। বন্ধু খুশী হয়ে হাসতে হাসতে আমায় বললেন—'এই লোকটিকে সংগে না আনলে আরাম করে কি খেতে পেতে? ভাগ্যিস আমি মিঃ ঝাকে বলে আনিয়েছিলাম, তাই জঙ্গলে বসে এই ভাল খাবার পাচ্ছ। জঙ্গলে ছুরি কাঁটা দিয়ে টেবিলে বসে ভাল খাবার খাওয়ার একটা বিশেষ সৌভাগ্য ও আনন্দ আছে।' আমি শুনে বললাম—'তা আছে, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমরা জঙ্গলে এসেছি শিকার করতে—বিলিতি কায়দায় খেতে' ত আসিনি।' আমার কাছে এই বিলিতি কায়দায় খাওয়ার কোন দামই নেই—শিকার না পেলে আমার কাছে এগুলো সব বিষ হয়ে যাবে।' খাওয়ার পর আমরা বারান্দায় এসে বসলাম। কুট্স

খানিক পরে শুতে গেলেন আর আমি একা একা বারান্দায় বসে ভাবতে লাগলাম, বাল্লারপুর গেষ্টহাউস থেকে জঙ্গলে আসা দুদিন হয়ে গেল কিন্তু এখনও বাঘের কোন খবর পর্যন্ত পেলাম না। বাল্লারপুর ছেড়ে আসবার আগে আমি মিঃ ঝার কাছে টাকা দিয়ে এসেছিলাম আমাদের ফেরার টিকিট ও ১৫ই তারিখের রিজার্ভেসান করার জন্য; তার মানে ১১।১২ তারিখ পর্যন্ত আমরা বড় জোর জঙ্গলে থাকতে পারি। এই ক'দিনের মধ্যে আমরা কতদূর আমাদের কাজে সফল হতে পারবো জানি না। এখন ইউসুফভাই-ই আমাদের ভরসা। এইসব ভাবতে ভাবতে আমি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম—কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে বেরুচ্ছি, দেখি কুট্‌সের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আমার সংগে যাবেন কিনা? তিনি বললেন—না, তাঁর পায়ের অবস্থা তখনও ভাল নয়। আমি আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম। জলের জায়গা ও 'গেম ট্রাক'গুলো ভাল করে পরীক্ষা করতে করতে এগুতে এগুতে এক জায়গায় কতকগুলো জংলী কুকুরের পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। জংলী কুকুরের দল ডানদিকের জঙ্গল থেকে নেমে এসে নালাতে জল খেয়েছে এবং কিছু কুকুর জলে ও কাদাতে বসে গা ঠাণ্ডা করেছে। দলটাতে ২৫।৩০টা কুকুর ছিল বলে মনে হোল। এই জংলী কুকুরের পায়ের দাগ দেখে আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল কারণ জংলী কুকুরের দল যখন যে জঙ্গলে থাকে তখন সেখানকার প্রত্যেকটা জন্তু জানোয়ার এদের ভয়ে পালায়। এমনকি শুনেছি বাঘও এদের ভয়ে পালিয়ে যায়। এরা ভীষণ নিষ্ঠুরভাবে জন্তু জানোয়ার মেরে খায়। বড় বড় হরিণদের এরা দল বেঁধে তাড়া করে—কেউ পায়ে কামড়ে ধরে, কেউ বা পেটে ও পিঠে উঠে কামড়াতে থাকে। হরিণ প্রাণের দায়ে ছুটতে থাকে আর তারাও যে যেখানে পারে কামড়ে ধরে ঝুলতে

থাকে। তারপর একসময় দেখা যায় বড় হরিণটা হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়েছে, তখন ওরা সকলে একসংগে মিলে হরিণের চারপাশ থেকে মাংস ছিঁড়ে খেতে থাকে। বেচারা হরিণের করবার কিচ্ছু থাকে না। তার সব শক্তি দিয়ে সে যতখানি সম্ভব ছুটে ওদের নাগালের বাইরে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু পরিশ্রান্ত অবস্থায় যখন সে বসে পড়ে, তখন তারই চোখের সামনে কুকুরগুলো তার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এইভাবে তিলে তিলে তার প্রাণ বার হয়ে যায়। জংলী কুকুরের এই নিষ্ঠুরতার জন্য জঙ্গলের সব জন্তু জানোয়ার ওদের ভয় পায় এবং ওদের দেখলেই পালিয়ে বাঁচে। জন্তুজগতে এমনভাবে নৃশংস শিকার করে খাওয়ার নজির আর শুনতে পাওয়া যায় না। আমি খানিকক্ষণ ধরে জায়গাটা পরীক্ষা করার পর বাংলোর পথে রওনা হলাম। পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম, জীমলগাট্টা ব্লকে আমাদের আর বাঘ পাবার কোন আশা নেই। এখন একমাত্র ইউসুফ ভাই-ই ভরসা—সে যদি ইঙ্কাবাণ্ডা ব্লকে কোন খবর দেয় তবেই কিছু হতে পারে, নয়তো আমাদের এ যাত্রায় খালি হাতে ফেরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

বাংলোতে ফিরে দেখি, কুট্‌স বারান্দাতে বসে যথারীতি ট্রানসিসটার বাজাচ্ছেন আর ওখানকার মেয়ে, ছেলে ও বাচ্চারা কুয়াতলা থেকে হাঁ করে সব শুনছে। আমাকে দেখে ট্রানসিসটারটা একটু কমিয়ে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, বাঘের কোন খবর আমি করতে পেরেছি কি না? জামা কাপড় ছেড়ে রাইফেল রেখে বারান্দায় একটা আরাম কেদারায় বসে বললুম—'না, তাছাড়া খবর অত্যন্ত খারাপ।' তিনি চোখ বড় বড় করে বললেন—'কি রকম?' বললাম—'আজ ২৫।৩০টা জংলী কুকুর আমাদের জীমলগাট্টা ব্লকে এসেছে। এখানে আর বাঘ পাবার কোন আশা নেই। এখন ইউসুফ ভাই-ই একমাত্র ভরসা। তিনি এই কথা শুনে বললেন— 'আমারও মন বড় খারাপ। এখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়াই

ভাল।' আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনার আবার মন খারাপ কেন? তিনি উত্তরে বললেন—'মিঃ ঝা আমাকে কথা দিয়েছিলেন মেমসাহেবের চিঠি এলেই তিনি সেটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন কোনও রকমে। কিন্তু এ পর্যন্ত আমি কোন চিঠি পেলুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অন্ততঃ ২ খানা চিঠি এসেছে, কিন্তু আমি তার একটাও পেলাম না। মিঃ ঝা পাঠাবার কোন বন্দোবস্তই করেন নি।' সব শুনে বললাম—এখানে চিঠি পাঠানো কি সহজ ব্যাপার? দেখছেন আমরা ১২৫ মাইল দূরে আছি। এখানে বাস চলে না, ট্রেন চলে না মধ্যে মধ্যে কাঠ বোঝাই লরী যাতায়াত করে মাত্র। এই লরীওয়ালাদের ধরতে পারলে মিঃ ঝায়ের পক্ষে চিঠি পাঠানো সম্ভব। আপনার মেমসাহেবকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, যে কদিন আমরা জঙ্গলে আছি সে কদিন তিনি যেন চিঠি না লেখেন। ১১।১২ তারিখ নাগাদ আমরা বাল্লারপুরে ফিরবো, সেই সময় তিনি যেন চিঠি দেন। আমার কথা শুনে বন্ধুর মুখ তো লাল হয়ে গেল। আমি একটু পরে বললাম, চার পাঁচ তারিখে গাঙ্গুলীকে নিয়ে মিঃ দাবের এখানে আসার কথা আছে। কোন চিঠি থাকলে মিঃ ঝা নিশ্চয়ই তা মিঃ দাবের হাতে পাঠিয়ে দেবেন। কুট্‌স আর একটা কথাও না বলে ট্রানসিস্‌টার নিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

হঠাৎ দেখি শম্ভু এসে হাজির। আমি রোজকার মত তাকে বাঘের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে সিঁড়ির ওপর বসে বলল—'বাঘের কোন খবর নেই।' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—'এ অঞ্চলে 'কুইয়া' এসেছে কি?' জংলী কুকুরকে এরা 'কুইয়া' বলে। সে বললে—'না তো'। আমার কেমন সন্দেহ হল। আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি আজ জঙ্গলে গিয়েছিলে?' সে ঘাড় নেড়ে বলল—'জী হাঁ। আমি তখন সন্দেহ মনে জিজ্ঞাসা করলাম—'কুইয়ার পায়ের দাগ তোমার নজরে পড়েনি?' সে বলল—'না সাহেব।' দেখলুম আমার সন্দেহ ভুল নয়, শম্ভু ফাঁকি

দিচ্ছে। সে জঙ্গলে গিয়ে বাঘের খবরাখবর না নিয়েই সকাল বিকেল আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে। আমি তাকে বললাম—শম্ভু, তুমি যদি আমাদের সংগে বেইমানি কর, তা'হলে আমরা বাঘের খবর পাব কি করে? তুমি কি সত্যিই জঙ্গলে গিয়েছিলে না বাড়ী থেকে এখানে এসে বলছ বাঘের খবর মিলছে না? কুট্স ঘর থেকে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শম্ভুকে খুব খানিক বকলেন এবং এ'ও বললেন, তিনি আর ২।৩ দিন দেখবেন, তখনও যদি সে ফাঁকি দিতে থাকে, তা'হলে তাকে তাড়িয়ে দেবেন। শম্ভু বেচারা ঘাড় নিচু করে বকুনি খেল। আমি মনে মনে ভাবলাম, সত্যিই যদি বাঘ উপস্থিত এ জঙ্গলে না থাকে তা'হলে ও বেচারী আর কি করবে? সেদিন ৩রা এপ্রিল। আমরা রোজকার মত চান করে খেয়ে শুতে গেলাম। বিকেল চারটায় উঠে বারান্দাতে বসে ভাবছি, এইভাবে দিন চলে যাচ্ছে কিন্তু শিকারের কোন হদিস্ পাচ্ছি না। আর ৮।৯ দিনের মধ্যেই ফিরতে হবে—এর মধ্যে কি আমাদের শিকার জুটবে? এমন সময় দেখি শম্ভু খুব জোরে জোরে পা ফেলে আমাদের বাংলোর দিকে আসছে। সে বারান্দার কাছে এসেই আমাকে বলল—'সাহেবজী চলিয়ে, ইহাঁ সে তিন চার মাইল দূর মে এক জঙ্গলকা কুয়া পানি মে, এক বড়া শের বৈঠা হুয়া দেখকে আ রহা।' কুট্স তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ট্রানসিস্টারে গান শুনছিলেন। আমি তাঁকে ডেকে এই শুভ খবরটা দিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হবার জন্য বললাম, শম্ভুকেও বললাম—'তুমি মিঞাদাসকে ডাক, গাড়ী নিয়ে আসুক।' আমরা দুই বন্ধু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে নিয়ে আমার ফোল্ডিং মাচানটা বাঁধা অবস্থাতেই শম্ভুকে জীপে নিতে বললাম। এর মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় মোষটাও নিয়ে এসেছে—মোষ দুটো বাংলোর এলাকার বাইরে চরে বেড়াচ্ছিল। মিঞাদাস ও শম্ভুকে

বললাম, মোষ দুটোর মধ্যে ছোট মোষটাকে জীপে তুলে নিতে। ইতিমধ্যে আমার ·৪০৫ রাইফেল ও তার আনুসঙ্গিক টর্চ ও ক্ল্যাম্প ইত্যাদি নিয়ে যখন রওনা হলাম তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। মিঞাদাস খুব জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সেই জঙ্গলের কূয়াটার কাছাকাছি নিয়ে এল। আমরাও খুব সাবধানে নেমে কোনরকম আওয়াজ না করে কূয়াটার দিকে এগুতে লাগলাম। শম্ভু ইশারাতে জানাল যে বাঘ এখন কূয়াতে নেই। আমরা কূয়াটার কাছে এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, শম্ভু ঠিকই দেখেছে, সে মিথ্যে বলেনি। দেখতে পেলাম একটা পাহাড়ী শুকনো নদীর বেড়ের বাঁদিকে একটা খুব বড় গাছ নদীর বেড়ের সেই কিনারাটাকে ছায়া করে রেখেছে, এবং সেই গাছটার ছায়ায় ঘেরা জায়গাটায় বালি খুঁড়ে ৪।৫ ফুট ব্যাসের ও ২।৩ ফুট গভীর একটা খাদের মত করা ছিল, তার মধ্যে বালি চুইয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল জমে আছে। গরমের সময় জঙ্গলের লোকেরা এই ধরনের কূয়া করে রাখে জঙ্গলে জল খাবার জন্য। কাঠ কুড়াতে বা অন্য কোন কাজে জঙ্গলে এলে তারা এই জাতীয় কূয়ার থেকে জল খায়। কখনও কখনও আবার দেখা যায়, পাতা দিয়ে এই জাতীয় কূয়ার কাছাকাছি "আঁটা" বেঁধে বসে পাতার আড়ালের মধ্যে থেকে তীর ধনুক বা গাদা বন্দুক দিয়ে চুরি করে শিকার করে। অনেক সময় বাঘও এই সব 'আঁটা' থেকে জংলী শিকারীদের হাতে অজান্তে মারা পড়ে। সন্ধ্যের অন্ধকারে জংলী শিকারীরা বাঘকে হরিণ মনে করে তীর ধনুক বা গাদা বন্দুক চালিয়ে দেয়। অনেক সময় বাঘ মারা পড়ে আবার কখনও কখনও শুনতে পাওয়া যায়, বাঘ ও শিকারী দু'জনেই প্রাণ হারিয়েছে। আবার এমনও হয় যে বাঘ জখম হ'য়ে চলে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যে মানুষ খেকো হয়ে গেছে।

আমরা কূয়াটার আশেপাশে পায়ের দাগ পরীক্ষা করে দেখলাম ওটা একটা বড় বাঘিনীর পায়ের দাগ। বাঘিনী যখন শম্ভুকে দেখতে

পায় তখন সে আস্তে আস্তে কূয়াটা থেকে উঠে নদীর বেড় ধরে ডানদিকের জঙ্গলে চলে যায়। বাঘিনীর পেট ও গা থেকে জলপড়ার দাগ বালির ওপর তখনও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি সময় নষ্ট না করে চারদিক দেখে নিয়ে নদীর ডানহাতি একটা গাছে শম্ভুকে মাচান বাঁধতে বললাম। দূর থেকে আমি যে গাছটাকে পছন্দ করেছি, কাছে গিয়ে দেখি সেই গাছে একটা পুরোন মাচান বাঁধা আছে। আমি দেখেই বুঝলাম আমার আগে অনেক শিকারী এই কূয়োতে শিকার করে গেছে। আমি শম্ভুকে খুব নিচু গলাতে বললাম—তুমি ওই পুরোন মাচানটা যত তাড়াতাড়ি পার খুলে নামিয়ে ফেলে আমার মাচানটা ওইখানে খাটিয়ে দাও। আমার নিজের তৈরী মাচানটা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খাটান যায়। শম্ভু গাছে চড়ে পুরোন মাচানটাকে খুলতে লাগল এবং আমি তাকে সাহায্য করলাম মাচান খোলা ও বাঁধার কাজে এবং ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে আমাদের মাচান বাঁধা হয়ে গেল। আমি কুট্‌সকে বললাম মাচানে বসার জন্য কিন্তু তিনি বললেন তাঁর শরীর খারাপ তাই সারারাত তিনি মাচানে বসতে পারবেন না, তিনি আমাকেই বসতে বললেন। আমি আর সময় নষ্ট না করে সংগে সংগে গাছে চড়লাম। শম্ভু তখনও গাছের ওপরেই ছিল—আমার যদি কোন ডালপালা আড়াল হয় তা'হলে সেটা কেটে দেবে বলে। আমি মাচানে বসে কূয়োটার দিকে নজর দিয়ে দেখি মাচান থেকে কূয়াটা দেখা যাচ্ছে না—নদীর দিকে ১৫।২০ হাত পর্যন্ত মোটামোটা ডালপালা ও পাতাতে কূয়াটা আড়াল করে আছে। শম্ভু সেই ডালপালাগুলো কাটার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ আমার মনে হোল ওগুলো না কাটাই ভাল হবে, কারণ বাঘিনীটা যেদিক দিয়ে ফিরে গিয়েছিল, সেইদিক দিয়েই যদি কূয়াতে আসে, তা'হলে ডালপালা কাটলে আমার আর আড়াল থাকবে না—বাঘিনীর নজর সোজা আমার ওপর পড়ে যেতে পারে;

আর বাঘ বা বাঘিনীর যদি কোনরকম সন্দেহ হয় বা তারা যদি শিকারীকে দেখতে য় তাহলে তারা কর্পূরের মতন উধাও হয়ে যায়। তাদের স্নান করা, জল খাওয়া বা মারাতে আসা, তা সে যত খিদেই পেয়ে থাকুক না কেন, সন্দেহ হলে তারা সব কিছুর লোভ ছেড়ে চলে যায়। তাই শম্ভুকে বললাম—'উধারসে পেড় কাটো মাৎ—কাট্‌নে সে শের কা নজর সিধা হামারা উপর আ যায়গা, ইধার বাকী সব ঠিক হ্যায়। তুম আভি উতারকে "কাঁড়াকো" ঠিক জায়গামে বাঁধো।' নদীর বাঁকের অপর কিনারাতে আমার মাচানের কোণ বরাবর ৫০।৬০ গজ দূরে, পাড়ের ওপর একটা শাল গাছ কাটা খুঁটো ছিল, সেই খুঁটোটাতে মোষটাকে বাঁধার কথা আগেই ঠিক করেছিলাম—সেখানে মোষটাকে বাঁধতে বললাম। মনে মনে ভেবেছিলাম বাঘটা যদি আমার আড়ালে আড়ালে ডান হাত বরাবর নদীর অপর পাড়ে কূয়াটায় স্নান করাব জন্য আসে, তা'হলে মোষটা আগেই বাঘের নজরে পড়ে যাবে। মাচানের ডানহাতি যত আড়াল থাকে আমার পক্ষে ততই ভাল। আমি মাচানে রাইফেল টর্চ ইত্যাদি সব ঠিকঠাক করে নিয়ে বসে দেখলাম, মিঞাদাস ও শম্ভু মোষটাকে খুঁটোতে বাঁধছে। বাঁধার পর ওরা আমায় ইশারা করে জানাল সব ঠিক আছে। তারপর কুট্‌স ইশারা করে ওদের নিয়ে চলে গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে জীপ গাড়ী চলে যাবার আওয়াজ পেলাম, তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। আমি শরীর বা মাথা না নাড়িয়ে নিশ্চল অবস্থায় বসে আছি আর কূয়া ও মোষটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ডালপালাগুলির জন্য কূয়াটা একটুখানি আড়াল হলেও কূয়ায় পৌঁছাবার আগেই বাঘিনীকে আমার দেখতে পাওয়া উচিত। হঠাৎ আমার বন্ধুর কথা মনে পড়ল—তিনি কেন মাচানে বসতে চাইলেন না! এমন কিছু কি তিনি লক্ষ্য করেছেন যে বাঘিনীর আসার আর সম্ভাবনা নেই। আমার মনে হোল তিনি শম্ভুর কথা

শুনে ধরে নিয়েছেন যে বাঘিনী আর আসবে না, কারণ শম্ভু আমাদের বলেছিল যে সে যখন খুব সাবধানে পা পা করে কূয়াটা দেখতে আসে, বাঘিনী দূর থেকেই বুঝতে পারে যে মানুষ আসছে। তাই শম্ভু কূয়ার কাছে পৌঁছবার অনেক আগেই সে শম্ভুর ওপর লক্ষ্য রাখে এবং শম্ভু কাছাকাছি আসতেই সে জল থেকে উঠে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। বাঘিনীকে কূয়া থেকে উঠতে দেখে শম্ভু ভয়ে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে পড়ে এবং বাঘিনী ওর দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে ও খুব জোরে পা চালিয়ে এসে আমাদের বাংলোয় খবর দেয়। তাই বোধহয় কুট্স ভেবেছেন যে বাঘ যখন একবার মানুষ দেখেছে তখন সে আর এই জলে আসবে না।

এইসব ভাবছি, এমন সময় মোষটার ওপর আমার নজর পড়ল। দেখি তার কান খাড়া এবং লেজটাও খানিক খাড়া হয়ে আছে এবং সে একদৃষ্টে নদীর পাড়ের বাঁহাতি কোণাকুণি দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে আছে। অপলক দৃষ্টিতে আমিও সেই দিকটা লক্ষ্য করে আশায় সময় গুণছি। একটু পরেই আগাছাগুলোর মধ্যে আস্তে আস্তে একটু মৃদু দোলা নজরে পড়ল—তারপরেই বাঁশ ও ঘন শালের জঙ্গলে এঁকে বেঁকে আসতে দেখলাম বাঘিনীটাকে। পড়ন্ত রোদ লেগে তার বিশাল দেহ চক্‌চক্ করছে এবং সে ধীরে ধীরে নালার কিনারার দিকে এগিয়ে আসছে। আমার সামনে এবং ডানদিকে গাছটার বড় বড় ডালপালা ও পাতা দিয়ে আড়াল থাকায় বাঘিনীটা আমার উপস্থিতি মোটেই টের পায়নি। সে হেলতে দুলতে এগিয়ে এসে নদীটার ওপারে এমন একটা জায়গায় থম্‌কে দাঁড়াল যেখানে তার সামনে বর্ষার জল নেমে ৫।৬ হাত চওড়া ও ৪।৫ হাত নীচু একটা নালার মতন হয়েছে। আর সেই নালাটা এপাড়ে বাঘিনী এবং ওপাড়ে মোষটাকে মাঝামাঝি রেখে ভাগ করেছে। বাঘিনীটা থেমেই সোজা মোষটাকে দেখতে পেল। চোখের সামনেই বাঘিনীটা ২০।৩০ হাতের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়ায় মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিত প্রাণ

হারাবার সর্বনেশে আশঙ্কায় মোষ বেচারার অর্ধেক মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। কী করুণ এক শোচনীয় দৃশ্য! জীবনের অন্তিম কয়েকটি স্পন্দন থেমে যাবার আগে বাঁচবার শেষ চেষ্টায় সে একবার প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার একটা পা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকায় পায়ে টান লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, পরক্ষণেই কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে আতঙ্কে কাঁপতে লাগল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমার মানসিক অবস্থা তখন মোষটার থেকেও খারাপ, সহানুভূতিতে, গভীর বেদনার আলোড়নে আমি তখন অভিভূত। বাঘিনীকে দেখার পূর্ব পর্যন্ত প্রাণের আশঙ্কায় বেচারার কালো পাথরের মূর্তির মত ভয়ে বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা অবর্ণনীয়। কান দুটি খাড়া, লেজটা পিঠের শিরদাঁড়ার সংগে আতঙ্কে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। তার শেষ হয়ে যাবার ক্ষণটি যখন সামনে এসে পড়ল তখনকার ভয়ঙ্কর অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য নেই। বাঘিনীটা গাছের ডালপালাগুলোর সম্পূর্ণ আড়ালে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে গুলি করতে গেলেই সেই ডালপালাগুলোতে লেগে গুলি ঘুরে যেতে পারে। একটা সাংঘাতিক উত্তেজনার মধ্যে পড়ে গেলাম ; মনের মধ্যে আমার ভাবনাগুলো বিদ্যুৎবেগে ছুটতে লাগল, বেচারা মোষটাকে বাঁচাতে পারবো না, আর বাঘিনীটাকেও মোষটার কাছে না আসা পর্যন্ত বিনা বাধায় গুলি করতে পারবো না। ভাবছি এইবার হয়তো মুহূর্তের মধ্যে বাঘিনীটা মোষটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে : সে মোষটাকে মেরে যখন উঠে দাঁড়াবে সেই সময় আমি গুলি করবো। ভগবানের নাম জপছি আর অপেক্ষা করছি, কখন সে মোষটার কাছে যাবে আর তাকে আমি এক গুলিতে শেষ করবো। বাঘিনী আর মোষটার দিকে দৃষ্টি রেখে আমি এইসব নানান কথা চিন্তা করছি—আর ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে তার শরীরটা একটু একটু নজরে পড়ছে। ভাবতে লাগলাম ভগবানের দয়ায় বাঘিনীকে মেরেই আমি

তাড়াতাড়ি বাংলোয় ফিরে যাবো, নয়তো তার আগেই কুট্‌স জীপ নিয়ে শিকারে বেরিয়ে যেতে পারেন। আমাকে দেখেই ওরা খুব অবাক হবে। আমি তখন সব ঘটনাটা ওদের আস্তে আস্তে বলবো।

এমন সময় হঠাৎ একটু হাওয়া দিতে ডালপালাগুলো একটু দুলতেই আমি বাঘিনীটার মাথাটা দেখতে পেলাম এবং নিশ্চিন্ত হলাম যে এটাই সেই বাঘিনী, যে কূয়াতে জলের মধ্যে বসেছিল। হঠাৎ বাঘিনীটার পেটটা আমার নজরে পড়তে দেখলুম, পেটটা খুব ফোলা ফোলা। মনে হলো সে নিশ্চয়ই একটা কিছু মেরে পেট ভর্তি করে খেয়েছে, তাই বোধ হয় মোষটা মেরে খাবার তেমন ইচ্ছে নেই। সে নিশ্চল অবস্থায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে জঙ্গলের চারদিক দেখতে লাগল এবং মাঝে মাঝে মোষটার দিকেও তাকাতে লাগল। প্রায় ১৫।২০ মিনিট এই অসম্ভব উত্তেজনার অবস্থাতে কেটে গেল – আর আমিও রাইফেল ধরে নিশ্চল অবস্থাতে বসে আছি আর অপেক্ষা করছি কখন বাঘিনীটা লাফ দিয়ে নালার এপারে এসে মোষটার ঘাড়ে পড়বে। এক একটা মিনিট মনে হচ্ছে যেন এক একটা ঘণ্টা। হঠাৎ কেন জানিনা, দেখি সে মাচানের ডালপালাগুলোর আড়াল থেকে কর্পূরের মত কোথায় উধাও হয়ে গেল! উত্তেজনায় মাথা না ঘুরিয়ে কেবল চোখের তারা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম এবং কিছুক্ষণ পরে কূয়ার জলে ঝপাস্‌ করে একটা আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম, বাঘিনীটা কূয়ার জলে নেমেছে এবং কূয়াটা আমার মাচানের ডালপালাগুলোতে আড়াল থাকায় আমি কিছু দেখতেও পাচ্ছি না। আমি খুব সাবধানে আমার মাথাটা একটু উঁচু নিচু করে বাঘিনীটাকে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম এবং একটু চেষ্টা করার পর বাঘিনীটার কানের ডগা আমার নজরে পড়ল। আরেকটু চেষ্টা করে দেখলাম সে আমার ও মোষটার দিকে পেছন করে কুয়াটার মধ্যে শরীর ডুবিয়ে বসে আছে—শুধু গলা থেকে

মাথাটা জলের ওপর রয়েছে। আমি ভগবানকে প্রার্থনা করতে লাগলাম—'হে ভগবান বাঘিনীটা যেন আবার জল থেকে উঠে মোষটার দিকে যায় এবং আমি যেন বাঘিনীকে মোষটা মারার আগে গুলি করতে পারি।' ক্রমশঃ সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসতে লাগল। মধ্যপ্রদেশে এপ্রিল মাসে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত দিনের আলো থাকে। আমি যখন প্রথম বাঘিনীটার দর্শন পেলাম তখন ছ'টাও বাজেনি কিন্তু তারপর সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত তার সংগে আমি আমার নসীব লড়িয়ে চলেছি। সাড়ে সাতটার পর—সন্ধ্যের অন্ধকারে আমি তার জল থেকে ওঠার আওয়াজ পেলাম এবং অন্ধকারে দৃষ্টি চালিয়ে সে কোনদিকে যায় তা দেখার চেষ্টা করলাম। আবছা ভাবে লক্ষ্য করলাম তার ছায়ার মতন শরীরটা নদীর কিনারা ধরে আমার ও মোষটার থেকে দূরে চলে গিয়ে ক্রমশঃ জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। আমি কপাল চাপড়ে ভগবানকে বলতে লাগলাম—'ভগবান একি করলে! আমার সমস্ত আশা যে চুরমার হয়ে গেল। যে সুযোগ দিয়েছিলে তাতেই ভেবেছিলাম দিনের আলোতেই হয়ত বাঘিনীটাকে মেরে, তাড়াতাড়ি বাংলোতে গিয়ে সবাইকে অবাক করে দেব; সে'ত হলই না—উল্টে বাঘিনীটা আমাকে অবাক করে দিয়ে চলে গেল। তারপর থেকে নানা ভাবনা-চিন্তা ও আশা-নিরাশার মধ্যে দিয়ে রাতের প্রহরগুলি কেটে গেল। মোষটারও এক একবার উঠে এক একবার বসে সারারাত কাটল। রাত প্রায় নয়টার সময় মাচানের ডানহাতি জঙ্গলে, মাইল খানেকের মধ্যে একটা চিতরা হরিণের 'বিপদ সংকেত' শুনলাম। রাত দেড়টা নাগাদ ঠিক ওই জায়গা থেকে একটা সম্বর হরিণেরও 'বিপদ সংকেত' এলো।

সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখে বুঝলাম বাঘিনীটা এই কুয়া থেকে আমার ডানহাতের জঙ্গলে, মাইল খানেক দূরে একটা বড় সম্বর কি একটা চিত্‌রা হরিণ আগের ভোর রাত্রে মেরে

খেয়েছে—তাতেই তার পেটটা ভর্তি হয়ে ফুলে উঠেছিল এবং মারীর কাছাকাছি একটা ঠাণ্ডা জায়গাতে সে দিনের বেলায় ঘুমিয়েছিল। দুপুরের গরমে তার শরীরটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য সে কুয়ার মধ্যে ডুবে বসেছিল—একপেট মাংস খাওয়ার পর তার শরীরটা বোধহয় একটু বেশীই গরম হয়েছিল—তাই ঠাণ্ডা হবার জন্য দু'বার করে জলে নেমেছিল, তা না হলে শম্ভুকে দেখার পর চলে গিয়ে আবার তার কুয়োর জলে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। আর মোষটাকে না মারার কারণও আমার মনে হোল, সম্বর বা চিতরা হরিণের মাংস অতি সুখাদ্য—তার কাছে মোষের মাংস লাগে না। তাই বাঘিনীটা নিজের মারা সম্বর বা চিতরা হরিণের মাংসের লোভে মোষটাকে না মেরে বাকী মাংসটুকু খাবার জন্য ঠিক সন্ধ্যে হতেই আবার নিজের মারীতে ফিরে গিয়েছিল। বাঘ বা বাঘিনী তাদের নিজেদের মারী চট্ করে ছাড়তে চায় না। একমাত্র তখনই তারা মারী ছেড়ে চলে যায়, যখন তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় যে আশে পাশে শিকারী লুকিয়ে আছে তাকে মারার জন্য। এ ছাড়া তারা নিজেদের মারীর ভাগ অন্যকে দিতে নারাজ; মারীর ওপর অপর বাঘ বা ভল্লুকের সংগে তুমুল লড়াই হতে শোনা গেছে।

আমার নিজের অবশ্য এটা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। যা'হোক এই সব নানান চিন্তা-ভাবনাতে মাচানের উপর রাত কেটে গেল। ভোরের মৃদু আলোর সংগে নানারকম পাখীর গান শুনতে পেলাম। মাচানের ওপর প্রায় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বসে থাকার পর দূর থেকে জীপের আওয়াজ কানে এলো এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই কুট্স, মিঞাদাস ও শম্ভুকে দূর থেকে দেখতে পেলাম। কুট্স দূর থেকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্যাপার কি?' পাল্টায় আমি ইশারায় আমার কপাল দেখিয়ে জানালাম—কপাল মন্দ। আমি নিঃশব্দে মাচান থেকে নেমে খুব নিচু গলাতে কুট্সকে বললাম—আপনারা চলে যাবার ২৫।৩০ মিনিটের মধ্যেই বাঘিনীটা এসেছিল ঠিকই, কিন্তু এমন জায়গায়

দাঁড়িয়েছিল যে ডালপালাগুলোর আড়াল থাকায় আমি মারতে পারলাম না। আমি জায়গাটা ও বাঘিনীটার পায়ের দাগ কুট্‌সকে দেখালাম। আমার কথা শুনেই কুট্‌স তো খুব হাত পা ছুঁড়ে বলতে লাগলেন—'তোমাকে তো শম্ভু বলেছিল ডালপালাগুলো কেটে দিই, কিন্তু তুমিই তো ওকে মানা করলে।' আমি শুনে বললুম—ঠিক তাই। আমি ভেবেছিলুম ওগুলো না কাটাই ভাল, কারণ একটা আড়াল থাকবে। কিন্তু মোষটার কাছে তো আর আড়াল ছিল না। বাঘিনীটা যে মোষটার কাছে এলই না। সবই আমার ভাগ্য, তা না হ'লে বাঘিনীটা সেখানে প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে আমার রাইফেলের নাগালের এত কাছে ছিল আর তাকে আমি মারতে পারলাম না। এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? আমরা যদ্দূর সম্ভব নিচু গলাতে কথা বলছিলাম—আমি কুট্‌সকে বললাম—চলুন আমরা মোষটাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাই। আজ আবার এই মোষটাকে নিয়ে আমার বসার ইচ্ছে আছে। তারপর মোষটাকে জীপে তুলে আমরা বাংলোর পথে রওনা হলাম।

পথে যেতে যেতে গতকালের সমস্ত ঘটনাটা কুট্‌সকে বললাম। তিনি'ত আমাকে অনেক বক্তৃতা দিলেন এবং বললেন তোমার ওই ডালপালার মধ্যেই বাঘিনীটাকে গুলি করা উচিত ছিল কিন্তু আমি সে কথা মানতে মোটেই রাজী নই। যাই হোক, বাংলোতে পৌঁছে শম্ভুকে বললাম—তুমি মোষটার জল ও খাবারের ব্যবস্থা কর, আমরা আজ আবার একে নিয়ে একটার মধ্যে মাচায় বসবো। আমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সকালের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য। গতকাল সারারাত বাঘিনীর আশায় আশায় বসে থেকে আমি দুচোখের পাতা ফেলিনি কিন্তু ঘুমোতে গিয়ে দেখি চোখে ঘুম আসছে না, নানান চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। আর ওদিকে আমার বন্ধু ট্রানসিসটার নিয়ে বারান্দায় বসে গান শুনতে শুনতে নম্বুদ্রিপাদকে ডেকে অনেকরকম বক্তৃতা দিয়ে

তাকে বোঝাতে লাগলেন, আমার কি কি দোষের জন্য আমি বাঘিনীটাকে মারতে পারিনি। আমি শুয়ে শুয়ে ওদের সব কথা শুনছিলাম। দুপুরে সাড়ে এগারটা নাগাদ আমরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। শোবার আগে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি মাচানে বসতে চান কি না? তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন—'না'। তখন আমি তাঁকে বললাম—আজ রাত নটা-দশটা পর্যন্ত ওখানে মোষ বেঁধে বসব এবং তারপর চলে আসব এই আমার ইচ্ছে। বন্ধু তার কোন জবাব দিলেন না। আমি একটা পর্যন্ত বিছানায় এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লাম এবং মিঞাদাস ও শম্ভুকে ডেকে জীপে মোষটাকে তোলার ব্যবস্থা করে আমিও তৈরী হয়ে নিয়ে আড়াইটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। জীপটা একটু দূরে রেখে আমি রাইফেল নিয়ে খুব সাবধানে দূর থেকে কুয়াটার ওপর নজর রেখে পা পা করে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম বাঘিনীটা কুয়োতে আসেনি। তখনই মনে হোল আজ আমার এখানে বসাটা বেকার যাবে! তবে যখন তৈরী হয়ে এসেই পড়েছি তখন বসেই দেখা যাক। এই ভেবে আমি জীপের কাছে এসে ওদের বললাম—বাঘিনীটা কুয়োতে আসেনি, মনে হয় সে আর এ অঞ্চলে নেই। যাই হোক, আমি মাচানে বসছি তোমরা মোষটাকে নিয়ে এসে খোঁটাতে বাঁধ। আমি রাত ৯।১০ টা পর্যন্ত দেখব। তারপর তোমরা জীপ নিয়ে এস, আমি ফিরে যাব। আমি মাচানে বসার পর ওরা মোষটাকে খোঁটাতে বেঁধে আমাকে যখন ইশারায় জানাল তখন আমি ওদের চলে যেতে বললাম।

আবার অধীর অপেক্ষা, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। রাত সাড়ে ন'টায় জীপের আওয়াজ পেলাম। বেলা আড়াইটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ওই জায়গার আশপাশে ২।৪ মাইলের মধ্যে বাঘিনী ছিল না বলেই মনে হোল, কারণ ওই সময়ের মধ্যে আমি কোন বিপদ সংকেত ধ্বনি শুনতে পাইনি। সম্বর, চিতরা হরিণ, মুরগী বা ময়ূরের বিপদ সংকেত থেকে জানতে পারা যায় বাঘের উপস্থিতি।

তাই আমার ধারণা হোল বাঘিনীটা নিশ্চয়ই ও অঞ্চলের নয়, সম্ভবতঃ জীমলগট্টাতে বেড়াতে এসে সেদিন একটা সম্বর মেরেছিল এবং সেইটে খাবার জন্য দুদিন ওখানে ছিল। বাঘিনীটা যদি ও অঞ্চলে বরাবর থাকত তাহলে কোনো না কোনদিন আমার বা শম্ভুর নজরে তার পায়ের দাগ ধরা পড়তো। ওরা টর্চ জ্বেলে আমায় ইশারা করল, আসবে কি না? আমি ওদের টর্চের আলোর ইশারাতে সম্মতি জানালে ওরা আমার মাচানের তলাতে এলে আমি শম্ভুকে আমার মাচানটা খুলে নিতে বললাম এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সেটা খুলে নিয়ে ও মোষটকে জীপে তুলে আমরা বাংলোর দিকে রওনা হ'লাম। বাংলোয় ফিরে দেখি কুট্স খাওয়া দাওয়া সেরে আলো নিবিয়ে শুয়ে আছেন। আমি ঘরে যেতেই তিনি শুয়ে শুয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন—'কি বাঘ এসেছিল?' আমি বললাম—না। তখন তিনি আবার আমায় অনেক বক্তৃতা শোনালেন, যার মর্মকথা হোল আমি নিজের দোষেই বাঘ পেয়েও মারতে পারলাম না। আমি তর্ক না করে জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করতে গেলাম এবং স্নান সেরে এসেও আবার খানিক বক্তৃতা শুনলাম। তারপর তিনি বললেন—'এখানে আর বাঘ শিকার হবে না। এখানে বাঘ হয়তো এক আধটা আছে কিন্তু আমাদের সম্ভাবনা খুবই কম, হাতে আরও বেশী দিন সময় থাকলে বরং চেষ্টা করা যেত। মিঃ ঝা ও মিঃ দাবে সময়মত বিগ্‌গেম লাইসেন্স ও পারমিটের ব্যবস্থা না করে আমাদের অনেক সময় বৃথাই নষ্ট করে দিলেন। ওরা ৩।৪ দিন পরপর আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবেন বলেছিলেন কিন্তু এলেন না। মেমসাহেবের কাছ থেকে চিঠি এসে নিশ্চয়ই ওখানে পড়ে আছে, কিন্তু ওঁরা না আসায় আমি তাও পাচ্ছি না, তাই এখানে আমার আর একদিনও থাকতে ইচ্ছা করছে না।' আমি আর কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার খাওয়া হয়েছে? তিনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন—'খাবার কিছুই নেই, যা

আছে তা আমি মুখে দিতে পারিনি। শব্জী, ডিম, মুরগী সব ফুরিয়ে গেছে—শুধু ডাল আর চাপাটি আমার সহ্য হয় না।' আমি বললাম —ছু-তিন রকমের জেলী আছে, মাখন আছে, তাই দিয়ে খাননি কেন? শুনে তিনি একটু রেগে আমাকে বললেন—'আমি তোমাকে বলেছি এই সব ভারতীয় খাওয়া আমার আদৌ সহ্য হয় না। এই সব খেলেই আমার শরীর খারাপ হয়।'—অথচ জন্ম থেকে তিনি ভারতেই মানুষ হয়েছেন। আমি বললাম আজ ৪ঠা এপ্রিল। আজ গাঙ্গুলীকে নিয়ে মিঃ দাবের আসার কথা আছে। মিঃ ঝা নিশ্চয়ই মিঃ দাবের হাতে আমাদের জন্য ডিম, শব্জী, মুরগী ইত্যাদি সব পাঠাবেন। শুনে তিনি বললেন,—'রাত সাড়ে এগারটা বেজে গেছে, আর তারা কখন আসবে। ওদের কথার কি কিছু ঠিক আছে?' বললাম—আমার বন্ধু গাঙ্গুলী যদি এসে থাকে তাহলে সে যত রাতই হোক ওদের কাউকে না কাউকে নিয়ে আসবেই। আর কথা না বলে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখন নানা চিন্তায় —হতাশায় মনটা অস্থির। শুধু কি তাই—যায় পাল্লায় পড়ে এতো সব হাঙ্গামা করে শিকারে এসেছি তারই সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন বিস্বাদ লাগছিল। আচারে ব্যবহারে যেন আমাদের সম্পর্কের "ডাইভোর্স" হ'বার পূর্ব খতিয়ান। এত বছরের শিকারী জীবনে যে সব ধৈর্য, স্থৈর্য, তিতিক্ষা ও অসীম আশাবাদী মন বহু অধ্যবসায়ে গড়ে উঠেছিল--সেটির ভিত্তি যেন নড়ে উঠার উপক্রম! বন্ধু কুট্সেরও তেমন কি আর দোষ। এ রাজ্যে এসে পেঁীছবার পর দীর্ঘ বারো দিন কেটে গেছে বাল্লারপুর গেষ্ট হাউসের রাজসিকতার মধ্যে, তারপর এলো শিকারের পারমিট—১লা এপ্রিল থেকে যার কার্যকারিতা আরম্ভ হল—তারপরও কেটে গেল ৪।৫টা দিন; শিকারের নিষ্ফল চেষ্টায় জঙ্গলে একা একা বসে মাচানের উপর সারারাত কাটানোর বিফল প্রয়াস। মাচানের উপর এই একা নিঝুম রাতে বিশাল জঙ্গলে জনপ্রাণীহীন হয়ে নিশ্চল নিথর ভাবে বসে

থাকার অভ্যাস যাদের হয়ে ওঠেনি তাঁরা হয়ত আমার এসব অনুভূতির সামিল হতে পারবেন না। দুই তিনজন মিলে শিকারের মাচানে বসা—সে অন্য ব্যাপার। প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করবার একটা মাত্রাহীন গুণ শিকারীর আয়ত্বে একান্তভাবে থাকার প্রয়োজন—যেমন প্রয়োজন নিরঙ্কুশ আশা নিয়ে শিকারচর্যা করা। কঠোর পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আহার নিদ্রায় আকর্ষণশূন্যতা অর্জন করা শিকারীর পক্ষে বিশেষ দরকার বলে জেনেছি এবং আয়ত্বে আনবার চেষ্টা করেছি। আগামীদিনের শিকারী ভাইদের জন্য এসব জানবার বিষয় বলেই লিখলাম। যাই হোক শিকারের রোজনামচায় আবার ফিরে আসা যাক্।

রাত আড়াইটা তিনটের সময় বাংলোতে হঠাৎ একটা জীপ ঢোকার আওয়াজ পেয়ে আমরা দুজনেই বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় এসে দেখলাম দু' একটি সাঙ্গপাঙ্গকে নিয়ে মিঃ দাবে এসেছেন ভবানী গাঙ্গুলীকে পৌঁছাতে। ভবাদা আমাকে দেখেই দাদা বলে জোর এক চীৎকার করে লাফ দিয়ে জীপ থেকে নেমে পড়েই, কুট্স ও আমার সঙ্গে হাত মেলাল। কুট্স প্রথমেই ওঁদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কোন চিঠি আছে কিনা? ওঁরা বললেন—না, থাকলে মিঃ ঝা নিশ্চয়ই ওঁদের হাতে দিয়ে দিতেন। শুনে কুট্স বললেন—'হতেই পারে না। এ' কদিনের মধ্যে আমার মেমসাহেবের কাছ থেকে অন্ততঃ ২।৩ খানা চিঠি আসার কথা।' মিঃ দাবে হাসতে হাসতে বললেন—'আপনার মেমসাহেব হয়তো ভেবেছেন জঙ্গলে চিঠি দিয়ে তাঁর কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিলে আপনি হয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়বেন—তাই বোধহয় চিঠি লেখেননি।' বন্ধুর মুখ দেখে বুঝলাম চিঠি না পাওয়ার জন্য তাঁর মেজাজ খুব খারাপ। তিনি মুখ লাল করে মিঃ দাবেকে বললেন—আপনারা গল্প করুন, আমি শুতে যাচ্ছি।' আমি বেয়ারাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে মিঃ দাবের জন্য চা করতে বলে বারান্দায় বসে

ওদের সংগে গল্প করতে থাকলুম। এ' কদিনের শিকারের অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বললাম যে আমি একটি বাঘিনী পেয়েও মারতে পারিনি। তারপর কথায় কথায় মিঃ দাবেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি আমাদের জন্যে কিছু রসদ এনেছেন? মিঃ দাবে বললেন —'না, আমি আনতে পারিনি। আমি ফিরে গিয়েই আপনাদের যা কিছু কম আছে সব পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।' পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—১৫ই এপ্রিল আমাদের ফেরার জন্যে টিকিট ও রিসার্ভেসান করান হয়েছে কিনা? তিনি বললেন—'হাঁ, আপনাদের রিসার্ভেসান হয়ে গেছে এবং টিকিটগুলো মিঃ ঝায়ের কাছে আছে।' আমি তখন তাঁকে বললাম—আপনি দয়া করে মিঃ ঝাকে বলবেন যে ১১ই এপ্রিল তিনি যেন কিছু পেট্রোল দিয়ে ট্রেলার সমেত জীপটা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন, তা না হলে আমরা সময়মত ফিরতে পারবো না। তিনি বললেন—'সে সব ব্যবস্থা আমি ঠিক করবো, আপনি কিছু ভাববেন না।' আমি বললাম—মনে হয়, এবার আমাদের খালি হাতেই ফিরতে হবে। উপস্থিত জীমলগাট্টা ব্লকে আর বাঘ নেই, তবে শুনেছি এঙ্কাবাণ্ডা ব্লকে ৩।৪টি বাঘ আছে। আজ তো চার তারিখ হয়ে গেল, আর বাকী পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে আমরা আর কিছু করতে পারবো বলে মনে হয় না। তবে আমাদের বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলী যদি আমাদের জন্য কোন বিশেষ সৌভাগ্য নিয়ে এসে থাকেন, তবেই কিছু আশা আছে, নয়তো নয়। ভবাদা হাসতে হাসতে বললে—'কিচ্ছু ভাববেন না দাদা, আমি যখন এসে গেছি, তখন আপনাদের বরাত ফিরিয়ে দিতে পারবো।' আমি বললাম— দেখা যাক। ভবাদার কাছে বাল্লারপুর সে কবে এসে পৌঁছেছে জানতে চাইলে সে বললে,—"২রা এপ্রিল এসে পর্যন্ত সে মিঃ ঝা ও মিঃ দাবের জীবন অতিষ্ঠ করে ছেড়েছে তাকে শিকার ক্যাম্পে পৌঁছে দেবার জন্যে, শেষ পর্যন্ত মিঃ দাবে আজ দয়া করে নিয়ে এলেন। এখান থেকে ৩০।৩৫ মাইল দূরে এক ডিভিশনাল কমিশনার শিকার

করতে এসেছেন। দাবে সাহেব আমাকে নিয়ে প্রথমে সেখানে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলাম, শিকারের কথা সবাই ভুলে গিয়ে খুব মদ খাচ্ছেন ও আদিবাসী মেয়েদের নাচ দেখছেন। কমিশনার সাহেব আমাদের কিছুতেই ছাড়লেন না। আমাদেরও মদ খেতে হবে এবং নাচ দেখতে হবে। আমরা ওখানে গিয়ে আটকে পড়েছিলাম—তাই এত দেরী।" দাবে সাহেব বারান্দায় আরাম কেদারাতে বসে খুব খানিক ঘুমিয়ে নিলেন আর আমি ভবাদার সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। ভবাদাকে সব বললাম, কি করে বাঘিনীটা আমাকে ধোঁকা দিয়ে পরিষ্কার দিনের আলোয় পালিয়ে গেল। বিকেলের পড়ন্ত রোদে বাঘিনীটা প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা আমার রাইফেলের নাগালের মধ্যে ছিল কিন্তু আমি মারতে পারলাম না। আমি আমার ভাগ্যের দোহাই দিয়ে খুবই আপশোষ করতে লাগলাম—আর এরকম সুযোগ পাব বলে মনে হয় না। কুট্টসের ধারণা আমি আমার নিজের দোষেই বাঘিনীটাকে মারতে পারিনি। ভবাদা আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলে উঠল—'ও আবার এক মস্ত পণ্ডিত—আপনি যদি গুলি করতেন আর ওই ডালপালা গুলোতে গুলি লেগে একটু ঘুরে গিয়ে বাঘিনীর মোক্ষম জায়গায় না লেগে অন্য কোথাও লাগতো, তাহলে চোট খেয়ে বাঘিনীটা হয়তো মানুষ খেকো হয়ে যেতে পারত। এমনিতেই আমাদের হাতে সময় কম, ঐ চোট খাওয়া বাঘিনীকে চার পাঁচ দিনে খুঁজে না পেলে আমাদের ফিরে যেতেই হোত। রিজার্ভেশান করা থাকায় ফিরে না গিয়ে আমাদের উপায়ও নেই। তারপর ওই চোট খাওয়া বাঘিনী এখানকার কত নিরীহ লোক যে মারতো তার ঠিক নেই। তাতে চারদিকে আপনার বদনাম ছড়িয়ে পড়তো; মিঃ বোসের কাছেও আপনি মুখ দেখাতে পারতেন না, উপরন্তু মিঃ ঝা কি মিঃ দাবে এরা সব বদনাম করতেন। তাছাড়া ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টেও ব্ল্যাক লিষ্টেড

হয়ে যেতে হোত—আর কোনদিনই চাঁদাতে শিকার করতে আসতে পারা যেত না। এবার যদি আমরা সুনাম বজায় রেখে ফিরে যেতে পারি, তাহলে পরের বারে আমাদের পারমিট পেতে কোনই অসুবিধে হবে না।" ভোর চারটে সাড়ে চারটের সময় দাবে সাহেব ঘুম থেকে উঠে ঘড়ি দেখে বললেন—'আমাকে এখুনি যেতে হবে, আর দেরী করা যাবে না। আমার আজ সকালে একটা খুব জরুরী মিটিং আছে।' বলেই তিনি জীপে চড়ে বসলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার ছুটি জিনিষের কথা মনে করিয়ে দিলাম—প্রথম নম্বর —১১ তারিখ ১টা আলাদা টিনে কিছু পেট্রোল নিয়ে ট্রেলার সমেত জীপটা পাঠাবার জন্য ; দ্বিতীয় নম্বর শব্জী, ডিম ইত্যাদি পাঠাবার জন্য এবং মেমসাহেবের চিঠি এসে থাকলে তা-ও। আমার কথা শুনে তিনি বললেন যে তিনি ফিরে গিয়েই সব পাকা ব্যবস্থা করবেন। বলেই রওনা হয়ে গেলেন।

তখনও একটু একটু অন্ধকার ছিল। আমি ভবাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে একটুখানি ঘুমিয়ে নিতে চায় কিনা ? ভবাদা যথেষ্ট ক্লান্ত ছিল, তাই একটু ঘুমোতে চাইল। আমাদের পাশের ঘরে একটা চারপাই ছিল সেটা আমি আগেই ভবাদার জন্যে ব্যবস্থা করে রেখে-ছিলাম। ভবাদা সেই চারপাইটার ওপর তার বিছানাটা খুলে কোন-রকমে শুয়ে পড়ল—আমিও শুয়ে পড়লাম। সকালে একটু দেরী করে আমরা সবাই উঠলাম। চায়ের টেবিলে আমার সাহেব বন্ধুর মুখে একটুও হাসি দেখলাম না। খুব গম্ভীরভাবে চা খেয়েই তিনি উঠে গেলেন। ভবাদা আমাকে জিজ্ঞেস করল—'আপনার বন্ধুর মুখ হাঁড়ীপানা কেন ?' আমি বললাম—বোধহয় ওর মেমসাহেবের চিঠি পাননি বলে। আমরা দুজনে চায়ের টেবিলে অনেকক্ষণ বসে আলোচনা করতে থাকলাম কিভাবে চেষ্টা করলে আমরা বাঘ পেতে পারি। ভবাদাকে বললাম—যা দেখছি, এখন আমাদের একমাত্র ভরসা ইউসুফভাই। সে যদি এক্কাবাগুা ব্লকে বাঘের খোঁজ দেয় এবং

আমাদের সাহায্য করে তবেই কিছু হবার আশা আছে। তা না হলে আমাদের খালি হাতেই ফিরতে হবে। ভবাদা বলল—'চলুন, আজ আমরা একটু সকাল সকাল গিয়ে ইউসুফকে ধরি। দেখা যাক সে কি বলে। চলুন না, এখনই তার কাছে যাওয়া যাক।' উত্তরে জানালাম—না, এখন না গিয়ে বিকেল সাড়ে তিনটের সময় যাওয়া যাবে, তখন দেখা করে খবরাখবর জানা যাবে এবং ফেরার পথে সন্ধ্যের দিকে যদি কিছু শিকার পাওয়া যায় সে চেষ্টাও করা যাবে। আমাদের পেট্রোলের যা অবস্থা তাতে জীপ নিয়ে যখন তখন যাওয়া যাবে না। তাই সাড়ে তিনটের সময় যাওয়াই ঠিক হোল। আমরা দুজনে তখন বারান্দায় পায়চারি করে গল্প করতে লাগলাম। তারপর একবার উঁকি মেরে দেখি কুট্স তার সবগুলো বন্দুক খুব মন দিয়ে পরিষ্কার করছেন। এগারোটা বাজলে আমরা স্নান করতে গেলাম। দেখি কুট্সের তার মধ্যে স্নান সারা—তিনি বিছানায় শুয়ে ট্রানসিস্টার বাজাচ্ছেন। আমি বেয়ারাকে খাবার দিতে বলে তাঁকে ডাকতে তিনি গম্ভীরভাবে খেতে এলেন এবং খাবারের ব্যবস্থা দেখেই তাঁর মেজাজ চড়ে গেল। ডাল, ভাত, আর দু'রকম বোতলের চাটনি ;—ডিম, শব্জী, মুরগী ইত্যাদি সব ফুরিয়েছিল ৪ঠা তারিখ রাত্রেই। সকালে চায়ের সঙ্গে পরোটা দিয়েছিল—জল খাবারের জিনিষও ফুরিয়েছে! এ পর্যন্ত কর্ণফ্লেক্স, পরিজ, ডিম, রুটি, মাখন, কলা, কমলালেবু সব কিছুই ছিল কিন্তু এখন বাড়ন্ত। ১২৫ মাইল দূর থেকে যানবাহনের অসুবিধের জন্য কোন কিছু পাঠানও মুস্কিল। অনেকের ধারণা জঙ্গলের গ্রাম থেকে ডিম, দুধ, শব্জী ইত্যাদি খুব সস্তায় ভাল জিনিষ পাওয়া যায় কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। এই সব জঙ্গলের মধ্যে যে সব ছোটখাট বস্তী আছে, সেখানে প্রত্যেকের কাছেই কিছু না কিছু গরু মোষ অবশ্যই আছে কিন্তু তারা সাধারণতঃ খাবারের অভাবে কোন দুধই দেয় না। বর্ষার জল পেয়ে আশেপাশের জঙ্গলের চারিদিকে নতুন ঘাস হলে তাই খেয়ে

তারা এক আধটু দুধ দেয় এবং তখন তারা ওই দুএক মাস তাদের শিশুদের দুধ খাওয়ায়—দুধ বিক্রী করে না। মুরগীর বেলাতেও তাই —যা দু' একটা ডিম হয় তা ওরা নিজেরাই খায়—বেচতে চায় না আর শাক শব্জী চাষের বালাই ওদের নেই। ধান, গম, মকাই, বজরা চানা এই ওরা চাষ করে। নম্বুদ্রিপাদ ডিম ও মুরগীর জন্য গতকাল সমস্ত বস্তী ঘুরেছে কিন্তু পায়নি তাই আজ আবার গিয়েছে, যদি পায়। কুট্স তো দু'চামচ ভাত খেয়েই রাগ করে উঠে গেলেন। আমি তাঁকে অনেক করে ডাকলুম কিন্তু তিনি এলেন না। আমি ও ভবাদা ওই-ই পেটভরে খেয়ে শুতে গেলুম। ঘরে এসে দেখি কুট্স তাঁর সব বন্দুক বাক্সে তুলে রাখছেন। আমি তাই দেখে জিজ্ঞাসা করলুম—কি ব্যাপার? সব বন্দুক তুলে রাখছেন যে? তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন—'আমার শিকারের সখ মিটে গেছে, এখন এখান থেকে যেতে পারলে বাঁচি।' শুনে একটু রাগ করে বললাম—আপনি এত অবুঝ হ'লে চলবে কি করে? ১২৫ মাইল দূর থেকে কিছু পাঠান কি সহজ কথা? এই ক'দিন তো আমরা খুব ভালোই খেয়েছি—সে আপনি নিজেই বলেছেন। জঙ্গলে শিকার করতে এসে এই ধরণের ভাল খাওয়া ও থাকার আরাম কখনও পেয়েছেন কি? গতকাল রাত থেকে আমাদের একটু অসুবিধে হচ্ছে স্বীকার করি কিন্তু উপায় কি? লোক পাঠান হয়েছে বস্তীতে। নম্বুদ্রিপাদ কাল থেকে কত চেষ্টা করছে ডিম বা মুরগী কেনার জন্য। আমি আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।

উঠলাম তিনটের কিছু আগেই। বিকেল সাড়ে তিনটের সময় আমাদের এক্কাবাণ্ডা ব্লকে যাবার কথা। ভবাদা ও মিঞাদাসকে ডেকে তুললাম। কুট্সকে জাগিয়ে বললাম—উঠুন আমরা এক্কাবাণ্ডা ব্লকে যাব। আপনার রাইফেল বার করুন। তিনি আমার কথা শুনে বলে উঠলেন—'আমার রাইফেল বন্দুক আর আমি এখানে বার করবো না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব আমার ·২২ রাইফেল নিয়ে।'

শুনে বললাম—'২২ রাইফেল দিয়ে কি হবে? নিতে হয়তো আপনার '৩০—০৬ রাইফেল বা 'সটগান'টা নিন। তিনি বললেন —'আমার এখানকার শিকার হয়ে গেছে। হাতে একটা '২২ থাকলেই যথেষ্ট।' আমি তার কথা না বাড়িয়ে জামা কাপড় পরে নিলাম। বেলা সাড়ে তিনটের সময় রওনা হয়ে ১০।১২ মাইল দূরের এঙ্কাবাণ্ডা ব্লকে যেখানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের কোয়ার্টারে ইউস্থফ থাকে, সেখানে গেলাম। জায়গাটা বড় রাস্তার ধারেই এবং সেখানে একটা ছোট চায়ের দোকানও রয়েছে। ওখানকার এক আদিবাসী সপরিবারে দোকানের পেছনে থাকে আর সামনেটায় তারা চায়ের দোকান করেছে। চায়ের দোকানে বসে আমরা ইউস্থফভাইকে ডেকে পাঠালাম। সঙ্গে সঙ্গেই সে এল। আমি তাকে ছু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে খুব খাতির করে চা খাওয়ালাম ও চা খেতে খেতে আমরা তাকে আমাদের ছুঃখ জানালাম—আমাদের ফেরার প্রায় সময় হয়ে এ'ল কিন্তু আজ পর্যন্তও আমরা বাঘের কোন বিশেষ সন্ধান পাইনি। ইউস্থফভাই সব শুনে বললে—'উপস্থিত আপনাদের জীমলগাট্টায় কোন বাঘ নেই—আমার এখানে ৩।৪টে বাঘ আছে। তারা এঙ্কাবাণ্ডা ও রিপনপল্লী এই ছুই ব্লকে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু বাঘগুলো থাকে রিপনপল্লীতে।' আমি তখন ইউস্থফভাইএর হাত ধরে তাকে বললাম—'আপ মেহেরবাণী করকে হামলোগন কে লিয়ে কুছ মদত কীজীয়ে। বিগর আপকো মদত সে হামলোগন কুছ কর নেহী স্তকতা।' অনেক খোশামোদ করার পর আমার মনে হোল ইউস্থফভাই একটু নিমরাজী হয়েছে। ইতিমধ্যে বাঁহাতি জঙ্গলের রাস্তা ধরে একজন লোক এল। তার পোষাক-আশাক বেশ ভদ্রোচিত। ইউস্থফ তাকে দূর থেকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল—'আইয়ে মুন্সীজী আইয়ে।' মুন্সীজী কাছে এলে পর ইউস্থফ আমাদের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল—'এঁরা শিকার করতে এসেছেন, আপনাকে এঁদের একটুখানি সাহায্য করতে হবে। মুন্সীজী শুনে

বলল—'জরুর'। ইউসুফ জিজ্ঞাসা করল—'আপকা হুঁয়া শের হালমে কোই মারী কিয়া হ্যায়?' মুন্সীজী শুনে বলল—'হাঁ, তিন চার রোজ পহেলে এক মারী কিয়া থা। উয়ো তো সব খা গিয়া। "কাঁড়া" বাঁধনেসে এক দো রোজ মে শের পাকড়া যায়গা। ইঁহা ৩।৪ শের হ্যায়।' তখন ইউসুফ আমাদের বলল—'আপলোক এক কাম কিজীয়ে—কাল একঠো কাঁড়া ভেজিয়ে, হাম বাঁধনেকো বন্দোবস্ত করেগা—শের আপকো মিল যায়গা।' রাস্তার অপরপারে রিপনপল্লীর এক ডাকবাংলো ছিল। ইউসুফ আমাদের বলল—'আপলোক ডেরা উঠাকে ইঁহা আ যাইয়ে। ইঁহা রহনে সে আপলোগনকা বহুত সুবিস্তা হোগা। মারীকো খবর মিলনে সে তুরন্ত দেখকর সব বন্দোবস্ত কর স্যাকতা।' আমরা সব কথা শুনে বাংলোটার ভেতরে গিয়ে সব কিছু ভাল করে দেখলাম, কিন্তু দেখে মনে হোল ওটা বহুকাল কেউ ব্যবহার করেনি। আমি তখন ইউসুফভাইকে বললাম —বাংলোর চেহারা দেখে মনে হয় এখানে বড় একটা কেউ থাকে না। ইউসুফ বললে—'হাঁ, হিয়া খাস কোই নেহী ঠাহ্‌রতা। পর সাল এক আম্‌রিকান সাব ইঁহা পর শিকার কা বাস্তে ঠাহ্‌রা থা। উসনে রিপনপল্লী ব্লকসে এক শের মারকে লে গয়া।' এ খবরটা অবিশ্যি আমরা ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছে পেয়েছিলাম এবং এখানকার ফরেষ্ট-ডিপার্টমেন্টের নিয়ম হচ্ছে, যে ব্লকে একটা বাঘ মারা পড়বে সে ব্লকে সে বছর এবং তার পরের বছরও পারমিট দেওয়া বন্ধ থাকবে। বাংলোটার ভেতরে সব কিছু দেখে নিয়ে আমরা বাইরে জলের কি ব্যবস্থা দেখতে গেলাম। দেখলাম একটা কূয়ো আছে কিন্তু সে কূয়োটা বিশেষ ব্যবহার হয় না। জলের চেহারা দেখে কুট্‌স বলে উঠলেন—'না, এখানে থাকা যাবে না। এই জল খেলে সকলেই অসুখে পড়ে যাব।' আমারও ঠিক ওই জল পছন্দ হল না।

একবার আমরা দুই বন্ধুতে মধ্যপ্রদেশের কাবীরচবুত্রা ব্লকে শিকার করতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা অতি মনোরম—চারিদিকে

পাহাড় আর গভীর জঙ্গল। কাবীরচবুত্রা পাহাড়ের ওপর থেকে নর্মদা নদী বেরিয়েছে। ফরেষ্ট বাংলোটাও ছোট একটা পাহাড়ের ওপর—সেখানে ব্যবস্থাও চমৎকার, প্রত্যেক ঘরে ভাল আসবাবপত্র ও কার্পেট পাতা। 'সাওয়ার' ট্যাপ সবই আছে কিন্তু জলের ব্যবস্থা তখনও কিছু হয়নি। বোধহয় নীচের কূয়া থেকে জল তোলার জন্য পাম্প লাগান হবে। কূয়ার পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা রাস্তা—ওই রাস্তা দিয়ে জঙ্গলের কাঠ বোঝাই গরুরগাড়ী ইত্যাদি যাতায়াত করে। পাহাড়ে ওঠার সময় তারা কূয়াতলাতে গাড়ী থামিয়ে জল খায়, স্নান করে ও রান্না করে—তারপর আবার পাহাড় থেকে কাঠ বোঝাই করে নিচে নামে। নিচের ওই কূয়া থেকে জল তোলার জন্য একজন 'বায়গা' রেখেছিলাম—'বায়গা' বলে মধ্যপ্রদেশে একরকম আদিবাসী আছে। ওরা খুব ভাল শিকারী হয়। আমাদের 'বায়গাটা' একটু বুড়ো মত, সে প্রায়ই জল তোলার সময় কূয়োতে দড়ি বালতি ফেলে দিত এবং সে জন্য বাংলোর চৌকিদার তাকে খুব বকাবকি করতো। একদিন সেই বুড়ো 'বায়গা' কূয়োতে দড়ি বালতি ফেলে দিয়ে বকুনি খাবার ভয়ে কাউকে কিছু না বলে ওই কূয়োটার কাছের একটা ডোবা থেকে নোংরা জল তুলে এনে দেয়। তাই দিয়েই সেদিনকার রান্না খাওয়া সব হয়। ওই ডোবার জলে গাড়োয়ানরা তাদের গরু মোষ স্নান করাতো, যার ফলে জলটা ছিল একদম অপরিস্কার। ওই জলের রান্না খেয়ে কুট্সের খুব খারাপ ধরণের রক্ত আমাশা হয়—প্রায় মর মর অবস্থা। আমি তখন শিকার ফেলে ওঁকে নিয়ে এসে কোনরকমে প্রাণ বাঁচাই। সেই থেকে শিকারে গিয়ে খাবার জলের দিকে আমার বন্ধুর খুব কড়া নজর। কাবীরচবুত্রা শিকার কাহিনী পরে লেখার ইচ্ছা থাকল।

মুন্সীজী ও ইউসুফকে বললাম—আমরা ভেবে দেখি, চার পাঁচ দিনের জন্য বাংলো বদল করবো কিনা। আমরা কাল তোমাকে একটা মোষ পোঁছে দেবার ব্যবস্থা করবো, তুমি তোমাদের সব

লোকজনদের খবর পাঠিয়ে দাও, শের কোথাও মারী করলে তারা যেন তখনি তোমাকে খবর দেয়। তোমাকে আমাদের জন্য একটু চেষ্টা করতেই হবে—আমাদের জোর বিশ্বাস তুমি একটু চেষ্টা করলে বাকী চার পাঁচ দিনের মধ্যেই আমরা হয়ত একটা বাঘ পেয়ে যেতে পারি। শুনে ইউসুফ বললে—'সব মালিককা দোয়া'। ইউসুফকে যতখানি সম্ভব তোয়াজ করে সন্ধ্যের অন্ধকারে রিপনপল্লী থেকে জীমলগাট্টার দিকে রওনা হলাম। রাস্তার দুধারের জঙ্গলে বাতি ফেলতে ফেলতে, মাত্র ১০।১৫ মাইল গতিতে গাড়ী চালিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় দু' একটা চিতল হরিণ দেখলাম। শম্ভুর খুব লোভ হরিণের ওপর। সে হরিণ দেখলেই গাড়ী থামাতে বলে, আমি কিন্তু বাঘ শিকারে গিয়ে হরিণ মারা মোটেই পছন্দ করি না। হরিণ দেখলে গাড়ী থামিয়ে ওদের হাবভাব শুধু লক্ষ্য করি। এইভাবে বড় রাস্তা পেরিয়ে জীমলগাট্টার রাস্তায় বাঁহাতি বাঁক নেব, সেই সময় ভবাদাকে বললাম—একটু এগিয়ে আমাদের বাংলোর কাছে একপাল পোষা চিতল হরিণ আছে—তুমি গুণে শেষ করতে পারবে না। ভবাদা শুনে 'এঁ্যা' বলে—চোখ বড় বড় করে বসে থাকল। ঠিক জীমলগাট্টার বাংলোয় ঢোকবার আগে যে কয়েকটি ছোট ঘর আছে সেই ঘরগুলোর বাঁদিকের খোলা মাঠেতে এসে বাতি ফেলতেই তারাবাতির মতন হাজার চোখ জ্বলে উঠল। ৬০।৭০ টা চিতল হরিণ ওই দলে ছিল। ওই পথে যেতে আসতে আমরা রোজ তাদের দেখতাম। জীপ থামিয়ে এবারও আমরা অনেকক্ষণ তাদের দেখলাম। হরিণগুলো পালাতো না। তারাও বুঝে নিয়েছিল যে এরা শুধু আমাদের দেখে, মারে না। বাংলোয় পৌছলাম প্রায় রাত সাড়ে দশটায়।

জামা কাপড় ছেড়ে ওরা খাবার টেবিলে গেল, আমি চট্ করে স্নান করতে গেলাম। ফিরে এসে খাবার টেবিলে গিয়ে দেখি, মুরগী রান্না হয়েছে। বুঝলাম নম্বুদ্রিপাদ কোনরকমে জোগাড় করেছে।

মুরগীসহ একটু ভাল খাবার দেখে কুট্সের মুখে হাসিও ফুটল। খাবার টেবিলে আমরা তিনজনে অনেক গল্প করলাম; তারপর উঠে বারান্দাতে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে আমরা শুতে গেলাম। পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে আমরা আলোচনা করতে লাগলাম কি করে মোষ দুটোকে এঙ্কাবাণ্ডা ব্লকে পৌঁছান যায়। ওখান থেকে এঙ্কাবাণ্ডা ঠিক কত মাইল আমরা আন্দাজ করতে পারছিলাম না, কেউ বললে দশ, কেউ বললে বারো মাইল। আমি মিঞাদাসকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে জীপের মাইল মিটারে লক্ষ্য করেছে কিনা? সে বললে—'হাঁ সাব, পাক্কা বারো মাইল।' আমি শুনে বললাম—তাহলে মোষ হাঁটিয়ে পাঠান যাবে না। এপ্রিল মাসের এই গরমে মোষগুলো যেতে যেতেই মরে যাবে। তখন ঠিক হোল, সেদিন আরেকবার যাওয়া হবে ইউসুফভাই-এর কাছে, সে সত্যি-সত্যিই কিছু করেছে কিনা দেখতে—তার ভাবগতিক দেখে মোষ নিয়ে যাওয়া যাবে। কুট্স কিন্তু মুখ বেঁকিয়ে বললেন—'তোমরা বৃথা সময় নষ্ট করছো। ইউসুফ তোমাদের বোকা বানিয়ে কিছু বকশিস নেবার তালে আছে—তিন চারঠো শের হ্যায় এসব ফালতু কথা, এসব বলার মানে যাতে তোমরা লোভে পড়ে ওখানে যাও এবং তাকে তোষামোদ কর। আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমার মনে হয় বাঘ আর পাওয়া যাবে না—কোন আশা নেই। এখন এখান থেকে যেতে পারলেই হয়।' আমি শুনে বললাম—যতক্ষণ আমরা আছি, ততক্ষণ আমাদের চেষ্টা করা উচিত। পাওয়া না পাওয়া সবই ভাগ্যের ব্যাপার কেউই তা বলতে পারে না। তাছাড়া আজ যাব বললেই তো আমরা এখান থেকে যেতে পারছি না—যতক্ষণ না মিঃ ঝা আরেকটা জীপ পাঠাচ্ছেন। শুনে কুট্স বললে—'চেষ্টা করলে আমরা একটা কাঠের লরী পেয়ে যেতে পারি।' শুনে বললাম—হয়তো পাওয়া যেতে পারে তবে এখান থেকে গিয়ে আবার আমাদের সেই বাল্লারপুর গেষ্ট হাউসে গিয়ে বসে

থাকতে হবে।, তাতে লাভ কি ?' আমাদের রিজার্ভেসান তো :৫ই এপ্রিলের জন্য। তার আগে আমরা এখানে আমাদের কপাল লড়াতে পারি। যদি কিছু মিলে যায়—কে বলতে পারে ? আমার কথা তাঁর মোটেই ভাল লাগল না—তিনি উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ট্রানজিস্টার বাজাতে লাগলেন। ভবাদা বলল—'ওর কথা বাদ দিন, ওটা একটা আস্ত পাগল—খালি বয়সই হয়েছে। আরে বাবা, তুমি বাঘ শিকারে এসেছ, শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবে। পাওয়া না পাওয়া সবই ভাগ্য।' ৬ই এপ্রিল বিকেল সাড়ে তিনটে হবে, আমরা একটা মোষ জীপে চড়িয়ে ইউসুফভাই-এর কাছে গিয়ে পৌছলাম। মোষটা তাকে দিয়ে বললাম—ইউসুফভাই, তুমি যেখানে ভাল বোঝ সেখানে এটাকে বাঁধার ব্যবস্থা কর। কাল আমরা আরেকটা মোষ নিয়ে আসবো। সে ঘাড় নেড়ে বলল—'ঠিক আছে, আমি এটাকে কাল বিকেলে বাঁধার ব্যবস্থা করবো। আজ আর বাঁধা যাবে না—সময় নেই।' আমাদের সামনেই ইউসুফ একটা আদিবাসীকে ডেকে মোষটাকে জিম্মা করে দিল এবং তাকে বলল—'গ্যয়া সাল আমরিকান সাহাব লোকক৷ বাস্তে যাঁহা কাঁড়া বাঁধা থা, রাস্তাকা পাশ যাঁহা পাত্থল হ্যায়, উস জায়গা পর খুঁটা গাড়কে কাঁড়া বাঁধেগা।' আমরা আরও কিছুক্ষণ ওখানে কাটিয়ে ইউসুফভাইকে চা ও কয়েকটা সিগারেট খাইয়ে সন্ধ্যের পর জীমলগাট্টার দিকে রওনা হলাম। সেদিন বেরোবার আগে অনেক করে বোঝানোতে আমার সাহেব বন্ধু ১২ বোরের বন্দুকটা সঙ্গে নিয়েছিলেন। আমি সকলকে বলেছিলাম কোন জাতের হরিণের ওপর গুলি চালান যেন না হয়—বাঘ, চিতা বা শুয়োর দেখলে মারতে পার—তাতে আমার আপত্তি নেই। সেদিনও আমরা খুব আস্তে আস্তে জীপ চালিয়ে ফিরছিলাম। দুধারের জঙ্গলে বাতি ফেলে প্রায় বড় রাস্তা পেরিয়ে জীমলগাট্টার দিকে মোড় নিতে যাব, এমন সময় দেখি বড় রাস্তার ধারে একটা মাইল পোষ্টের আড়ালে একটা বড় শুয়োর দাঁড়িয়ে আছে। আমি ও ভবাদা জীপের পেছনে

বসেছিলাম। আর কুট্‌স ছিল সামনে। শুয়োরটা ছিল রাস্তার বাঁ দিকে। জীপ থামাতে ইশারা করতে আমরা শুয়োরটা থেকে ১০।১২ হাত দূরে এসে থামলাম। জীপটা থামামাত্রই শুয়োরটা জীপের সামনে দিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালাম। কি হোল জানি না, আমার রাইফেলের গুলি লাগল না। শুয়োরটা জীপের সামনে দিয়ে ডানদিকে ছুট্ দিল। তখন কুট্‌সের ১২ বোরের বন্দুক থেকে এল. জি. আল্‌ফাম্যাক্স গর্জে উঠল, কিন্তু শুয়োরটার গায়ে তার একটা দানাও লাগল বলে মনে হোল না। শুয়োরটা যখন জীপের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন জীপের আলোতে দেখলাম ওটা একটা মাদী শুয়োর এবং পেটে বাচ্চা রয়েছে। তখন আমার গুলি না লাগাতে আমি মনে মনে খুব খুশীই হলাম। কুট্‌স বললেন তাঁর গুলি লেগেছে, কিন্তু আমি বেশ স্পষ্ট দেখলাম তাঁর গুলি শূয়োরটার পিঠের বেশ খানিকটা ওপর দিয়ে চলে গেল। জীপ থেকে নেমে কুট্‌স বেশ খানিক খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু এক ফোঁটা রক্তের দাগ বা শুয়োরটার কাছাকাছি দাঁড়াবার বা বসার কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। সাহেব হতাশ হয়ে জীপে ফিরে এলেন। আমরাও যে যার খোঁজাখুঁজির পর ফিরে এলাম। আমার খুঁজতে যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, কারণ আমি জানতুম এবং দেখেছি যে কুট্‌সের গুলি লাগেনি—আর আমার নিজের গুলি যে লাগেনি তা আমি খুব ভালভাবেই জানি। কারণ আমার ·৪০৫-এর গুলি যদি শুয়োরটার কোথাও লাগত তাহলে তাকে আর ওইভাবে পালাতে হোত না—সে সেইখানেই পড়ে যেত। মনে মনে আমাদের কারুর গুলি না লাগাতেই আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলাম। কারণ শুয়োরটার পেটে এক পেট বাচ্চা ছিল। কুট্‌স তার গুলি না লাগার জন্য খুব খানিক আপশোষ করলেন। আমি ভাবলাম, এত কাছ থেকে আমার না মারতে পারার কারণ কি? আমার নিজের ভুলটা কোথায় সেটা জানার চেষ্টা করতে লাগলাম।

মনে হল শুয়োরটা কাছে থাকার জন্যই আমি নিশ্চয় ভালভাবে নিশানা না করেই গুলি ছুড়েছি—তাই আমার গুলি লাগেনি। ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে এই ধরণের ভুল যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বলে মনে মনে ঠিক করে ফেললাম। বাংলোতে ফিরে এসে আমরা স্নান সেরে খেতে বসলাম। খাবার টেবিলে কুট্‌স আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি অত কাছ থেকেও শুয়োরটাকে মারতে পারলে না কেন? কি ব্যাপার? তোমার তো রাইফেলের হাত খুব ভাল।' বললাম—আমি আমার নিজের দোষেই ওটাকে মারতে পারিনি। শুয়োরটা খুব কাছে থাকায় নিশ্চিন্ত মনে আমি ভালভাবে নিশানা না নিয়েই গুলি চালিয়েছি। আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এই ধরণের ভুল আমি আর করবো না তুমি দেখে নিও। খাওয়া দাওয়ার পর কুট্‌স শুতে গেলে আমি ও ভবাদা রোজকার মত বারান্দায় বসে গল্প করতে করতে ভবাদাকে বললাম—দেখছি এ যাত্রায় আমাদের খালি হাতেই ফিরতে হবে। ভবাদা শুনে বলল—'দেখা যাক। এখনও আমাদের হাতে তিন-চার দিন সময় আছে—কি হয় কে বলতে পারে?' নিরাশায় জবাব এলো—ভগবান আমায় একটা সুযোগ দিয়েছিলেন কিন্তু কপাল দোষে আমি কিছুই করতে পারলাম না। আর কি হয়?

পরের দিন ৭ই এপ্রিল সাড়ে তিনটের সময় আমরা আবার ইউসুফভাই-এর সংগে দেখা করে জানলাম আমাদের মোষটা সেদিন বাঁধা হবে। ইউসুফভাইকে চা সিগারেট ইত্যাদি খাইয়ে একটু গল্প করছি, এমন সময় মুন্সীজী এ'ল। তার কাছে খবর পেলাম তার কাঠ কয়লার ডিপো থেকে মাইল দুই দূরে তিন চার দিন আগে বাঘে একটা বলদ মেরেছে। প্রায় সবটাই খেয়ে ফেলেছে —কিছু হাড় গোড় পড়ে আছে একটা নালার ধারে—সেই নালাতে একটু জলও আছে। ইউসুফ বলল—'যাইয়েগা? দেখিয়েগা?' আমি

বললাম—যা স্যাকতা, লেকিন আজ হামলোগন কা কাঁড়া অগর উস তরফ বাঁধনেকা বোলা হ্যায়—ইসলিয়ে উস তরফ যানা নেহি চাইয়ে। ইউসুফ শুনে বলল—'নেহি, মুন্সীজী যাঁহা বাতা রহা হ্যায়, কাঁড়া উসসে দূর মে বাঁধা হ্যায়। আমি বললাম—তব চলিয়ে দেখা যায়। দু'নম্বর মোষটা আমরা সেদিন সঙ্গে এনেছিলাম। ইউসুফ সেটা নিয়ে একটা লোকের জিম্মায় রেখে আমাদের সাথে চলল। সংগে মুন্সীজীও এলো আমাদের মারীর জায়গাটা দেখাবার জন্য। বিপনপল্লীর চায়ের দোকান থেকে রাস্তার ডানহাতি জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে মাইল দু'তিন যাবার পর আমরা মুন্সীজীর কাঠ কয়লার ডিপোতে এসে পৌছলাম এবং সেখানে জীপ থামিয়ে মুন্সীজীর আরও দু'তিনজন লোক সংগে নিয়ে মাইল দুয়েক যাবার পর মুন্সীজী এক জায়গায় এসে জীপ থামাতে বলল। আমরা জীপ থেকে নেমে প্রায় মাইল দেড়েক হাঁটার পর একটা নালার কাছে গিয়ে দেখলাম, বাঘটা মারীটার প্রায় সবটাই খেয়ে গেছে, শুধু বলদটার শিরদাঁড়ার খানিক হাড়, মাথার হাড় ও শিং দুটো রয়েছে। সব দেখে শুনে আমার মনে হ'লো বাঘ যদি এর মধ্যে আর কোন মারী না করে থাকে, তাহলে ওখানে হাড়গুলি চিবাবার জন্য আসলেও আসতে পারে।

তখন প্রায় বিকেল সাড়ে পাঁচটা—বেশ রোদ রয়েছে। আমি আর ভবাদা সুবিধেমত একটা গাছ দেখে মনে করলাম—তাড়াতাড়ি এই গাছে একটা মাচান বাঁধা যাক। দেখি বসে, কি হয়? তাড়াতাড়ি সংগের লোকেরা কোন রকমে একটা মাচান বাঁধার পর আমি ও ভবাদা উঠে বসলাম। কুট্‌স জীপেই বসেছিলেন—তিনি আসেন নি। মুন্সীজী আর ইউসুফকে বলে দিলাম সাহেবকে ও আমাদের ড্রাইভারকে বলে দিতে যে, কাল সকাল আটটার সময় যেন আমাদের নিতে জীপ পাঠায় মুন্সীজীর ডেরাতে। ওরা সব চলে গেলে আমরা দুজন মাচাতে বাঘের আশায় বসে রইলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম ওই মাচায় সারারাত বসে থাকা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। রোলার গাঁটগুলো আমাদের খুব কষ্ট দিতে লাগল। এক ভাবে স্থির হয়ে বসার দরুণ কোমর থেকে সমস্ত নিচের দিকটা যেন অসাড় হয়ে এলো—দুজনেরই পায়ে ও হাঁটুতে চাপ লেগে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে ব্যথায় সব অবশ হয়ে গেল—কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থার ত কোন উপায় নেই। সঙ্গে আমার ফোল্ডিং মাচানটা না নিয়ে আসায় ওই দুরবস্থা। এইভাবে রাত বারোটা পর্যন্ত আমরা দুজনে ছোট্ট রোলার মাচানে বসে কষ্টভোগ করতে লাগলাম কিন্তু বাঘ আসার কোন আভাস বা ইঙ্গিতও পেলাম না। রাত বারোটার পর ভবাদা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল—'দাদা, আর যে বসতে পারছি না—তাছাড়া বাঘ আসবে বলে মনেও হচ্ছে না। চলুন আমরা আস্তে আস্তে নেমে মুন্সীজীর ডেরাতে গিয়ে বাকী রাতটা একটু ঘুমুই। এ কষ্টভোগ করে কোন লাভ নেই।' আমি শুনে বললাম—কিন্তু রাত্রে আমরা পথ চিনে যেতে পারবো তো? ভবাদা বলল—'সে আমি ঠিক আপনাকে নিয়ে যাব—চলুন দেখি নামা ত যাক।' আর বসে থাকতে না পেরে আমরা দুজনে খুব সাবধানে নেমে পড়লাম।

অন্ধকারে পথ চলছি—মাথার ওপরে সরু একফালি চাঁদ আমাদের পথ দেখিয়ে একটু সাহায্য করছে। চতুর্দিকে ঘন সেগুন গাছের জঙ্গল। মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে গাছগুলোর পাতা ঝরতে ঝরতে সারা জঙ্গল বড় বড় শুকনো সেগুন পাতাতে ভরে আছে, এর উপর দিয়ে একটা টিকটিকি চলে গেলেও মনে হয় যেন একপাল হাতি চলছে। আমাদের দুজনের হাজার সাবধানতা সত্ত্বেও আমরা বিনা আওয়াজে এক পা-ও এগুতে পারছি না। এক এক জায়গাতে শুকনো পাতা প্রায় এক হাত উঁচু হয়ে আছে। আমরা দুজনে নালা থেকে ওপরে উঠে প্রায় সিকি মাইল এসেছি এবং ভবাদাকে সামনে রেখে খুব সাবধানে পা ফেলে এগুচ্ছি, এমন সময় আমার বাঁ

পা-টা হঠাৎ একটা শুকনো পাতায় ঢাকা গর্তে পড়ে মটাশ করে আওয়াজ করে উঠল। কিছুক্ষণ আমি পড়ে রইলাম কাৎ হয়ে রাইফেল সমেত, উঠবার শক্তি নেই। শুধু ভয় হল কোন বিষধর না ছোবল মারে। সেদিন আমার কাঁধে ছিল '৪৫০ দোনলা রাইফেল, যার ওজনই প্রায় ১৪½ পাউণ্ড। মধ্যে মধ্যে শিকারীরা শিকার না পেয়ে রাইফেল বদল করে দেখে, বরাত খোলে কি না। সেই আশাতেই আমিও এক নলার '৪০৫ এর বদলে দোনলা '৪৫০টা সেদিন নিয়েছিলাম। রাইফেলের ঐ ভার ও ভারী শরীর নিয়ে বেমোচরে হঠাৎ পড়ে গিয়ে আমি অসহ্য যন্ত্রণাতে চোখে কানে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। ভবাদা আমাকে তাড়াতাড়ি টেনে তুলল—দেখলুম ভগবানের দয়াতে পা-টা ভাঙ্গেনি, তবে পায়ের পাতার ওপরটা খুব খারাপ ভাবে মচ্‌কে গেছে। ওখান থেকে মুন্সীজীর ডেরা প্রায় মাইল দুয়েক হবে কিন্তু পায়ের যা অবস্থা তাতে পা ফেলাই যাচ্ছে না। শুধু মনের জোর নিয়ে আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভবাদার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর এগিয়েই আমার মনে হোল আমরা পথ হারিয়েছি! একে পায়ের ওই অবস্থা, তার ওপর অন্ধকারে পথ হারিয়ে দু'মাইলের বদলে ছ'সাত মাইল গভীর জঙ্গলের গোলক ধাঁধায় ঘোরাঘুরি করে আমরা কোন রকমে অতিকষ্টে মুন্সীজীর ডিপোতে যখন এলাম, তখন রাত তিনটে বেজে গেছে! মুন্সীজীকে ডেকে তুলে দুটো খাটিয়া নিয়ে কোন রকমে আমরা বাইরে শুয়ে পড়লাম। একদিকে আমি'ত পায়ের যন্ত্রণায় সারারাত ছট্‌ফট্ করলাম—আমার পা ফুলে ঢোল, ওদিকে ভবাদা খুব নাক ডাকিয়ে দিল লম্বা ঘুম। মুচড়ে মচ্‌কে যাওয়া এই পা নিয়ে ছ' সাত মাইল অসম্ভব কষ্টে ঘোরাঘুরি করে—ডেরায় পেঁীছে সারারাত অশেষ যন্ত্রণার মাঝে মাঝে সেই বহুকথিত যন্ত্রণার কথা মনে আসায় ভাবলাম—হায়রে, প্রসব যন্ত্রণার চেয়ে শিকার যন্ত্রণা কম ত নয়ই বরঞ্চ হাজার গুণ বেশী অথচ সকলের মুখে কতই না সহানুভূতি ঐ

আদি যন্ত্রণাটির উপর।, পায়ের টনটনানিতে কেবল মনে হচ্ছিল—এ কেমন একচোখামি। আমি ছাড়া কেউ কি এর প্রতিবাদ করবে না?

সকালে মুন্সীজীর বাড়ী থেকে চা এলো আমাদের তুজনের জন্য তু'গ্লাস। আমি মুন্সীজীর মেয়ে তুটোকে পকেটে যে কয়েকটা পিপারমেণ্ট লজেন্স ছিল তাই দিয়ে খুশী করে দিলাম। সকাল ন'টায় মিঞাদাস জীপ নিয়ে এলো এবং আমরা রওনা হয়ে রিপন-পল্লীর চায়ের দোকানের কাছে পেঁ ৗছে ইউস্থফভাইকে আসতে খবর পাঠালাম। তার কাছে আমাদের "কাঁড়ার" খবর জানতে চাইলে সে বলল, তার লোক তখনও জঙ্গল থেকে কোন খবর নিয়ে আসে নি। সে আমাদের অপেক্ষা করতে বলাতে আমরা তাকে গতরাত্রের সব ঘটনা বললাম। আমার পায়ের অবস্থা দেখে সে তুঃখিত হোল। সাড়ে দশটা নাগাদ তার লোক ফিরে এসে জানাল—'মারী নেহী হুয়া'। আমি তখন আবার ইউস্থফভাই-এর হাত তু'টো ধরে বললাম—আজ সামকো আচ্ছা জায়গা দেখকে দো কাঁড়াকো বাঁধিয়ে। অনুরোধ শুনে সে বলল—'সাব আপ ফিকির না কিজীয়ে। হাম খুদ যা কর কাঁড়া বাঁধকে আয়েগা। আপ বে ফিকির যা স্যাকতা।' আমার সেই একই অনুরোধ—দেখিয়ে আপ হি হামারা ভরসা—আউর বক্ত নেহী। আজ আট তারিখ—দশ বার তারিখ মে হামলোগন কো জরুর ওয়াপস যানা হ্যায়—১৫ তারিখ এপ্রিল কা বাস্তে হামলোগ ট্রেনকা টিকেট কাট চুকা। শের কা রাস্তা দেখ কর আজ আপ দো কাঁড়া দো জায়গা মে বাঁধিয়ে। কাল স্থবা ন'-দশ বাজে হামলোগ আ কর খবর লেগা—এইসব বুঝিয়ে আমরা রওনা হলাম। জীমলগাট্টায় যখন এসে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে স্নান করে খেয়ে ওষুধের বাক্স থেকে একটা মালিশের শিশি বার করে খুব ভাল করে পা-টা মালিশ করে শুতে গেলাম। বিকেলে

থেকে রাত পর্যন্ত আরও কয়েকবার মালিশ করেও পায়ের ব্যথা সারল না।

পরের দিন ৯ই এপ্রিল সকালে দেখি, কুট্‌স তাঁর বিছানা ছাড়া বাকী সব জিনিষ আগের দিনই গুছিয়ে ফেলেছেন। তাঁর সব তোলা হয়ে গেছে—মেমসাহেবের চিঠি না পাওয়ায় তাঁর মেজাজ খুবই খারাপ। কথায় কথায় আমার আর ভবাদার ওপর খুব রাগ করতে লাগলেন। ভবাদার সংগে কি একটা কথা কাটাকাটি হয়ে যাওয়ায়, তিনি তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। সকালে চা খাওয়ার পর আমি তাঁকে বললাম– চলুন, আমরা সবাই মিলে এঙ্কাবাণ্ডা ব্লকে গিয়ে ইউসুফভাইএর কাছে খবর নিয়ে আসি আমাদের মোষগুলো মারী হয়েছে কি না? তিনি বলে উঠলেন—'আমি যাব না, যেতে হয় তোমরা যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে গিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে নারাজ। আমার শিকারের সখ মিটে গেছে।. এখন এখান থেকে তাড়াতাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। তাছাড়া আমি আমার সব বন্দুক তুলে ফেলেছি। এখন বাঘে মারী করলেও আমি আমার বন্দুক বার করছি না।' এই বলে তিনি চায়ের টেবিল থেকে উঠে নিজের বিছানায় শুয়ে ট্রানজিস্‌টার বাজাতে লাগলেন। বৌ'র চিঠি কিছুদিন না পেলে এমন যে অবস্থা হয় তা ত আমার জানা নেই। ভবাদা বলল—'চল, আমরাই যাই, দু'দুটো মোষ বাঁধা আছে—বলা যায় না, হয়তো গিয়ে শুনবো একটাকে বাঘে মেরেছে। শুনে বললাম—আশা হয়তো আর নেই, কিন্তু তবুও আমাদের খবর নেওয়া খুবই দরকার। চল, আমরাই দুজনে যাই—উনি যখন যাবেন না তখন ওঁকে বাদ দাও। আমরা সকাল সাড়ে ন'টায় রওনা হলাম। প্রথমে আমরা মুন্সীজীর ডিপোতে গেলাম। অনেক ডাকাডাকি করতে মুন্সীজীর স্ত্রী ঘরের আড়াল থেকে আমাদের বললেন, রিপনপল্লীর বড় রাস্তার ধারে মুন্সীজী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, গতরাত্রে আপনাদের একটা

কাঁড়া বাঘে মেরেছে। খবরটা পেয়েই ভবাদার কী উল্লাস, আমিও খুব খুশী হলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা জোরে জীপ চালিয়ে রিপনপল্লীর বড় রাস্তার দিকে মাইল খানেক আসার পর, আমরা খুব বড় একটা মদ্দা চিতল হরিণ দেখতে পেলাম। রোদে তার সারা শরীরটা চক্‌চক্ করছে। হরিণটা আমাদের জীপ থেকে ৩০।৪০ গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, রাস্তা পেরিয়ে বাঁহাতি জঙ্গলে যাবার জন্য। আমরা জীপ থামাতে সে বেশ কয়েক মিনিট ধরে আমাদের দেখতে লাগল। তারপর যখন বুঝল যে আমরা তার কোন ক্ষতি করতে চাই না তখন নির্ভয়ে ধীরে ধীরে রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে আবার আমাদের দিকে চাইতে থাকল। এত কাছে এত বড় মদ্দা চিতল হরিণ আমরা আগে কখনও দেখিনি। যাই হোক, আমরা জীপ নিয়ে রিপনপল্লীর দিকে এগুতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তায় এসে পৌঁছলাম।

রিপনপল্লীর চায়ের দোকানের সামনে একটা ছোটখাট সভা বসে গেছে। মুন্সীজী, ইউসুফভাই ত' রয়েছেই, আরও কয়েকজন লোকও রয়েছে। জীপ থামতেই উৎসাহে ওরা সবাই উঠে এসে আমাদের শুভ খবরটি দিল। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করলাম—তোমরা কি মারীটা দেখেছ? মুন্সীজী বলল—'না, যে লোকটাকে কাঁড়া বাঁধার জন্য রাখা হয়েছিল, সে আমারই লোক। সে এসে খবর দিয়েছে, সকাল আটটার সময় একটা "কাঁড়া" মারী হয়েছে।' জিজ্ঞাসা করলাম—সে লোকটা কি দেখেছে—মারীর কোথায় কতখানি খেয়েছে? তার উত্তরে বলল—'নেহী। ইয়ে আদমী, ইসসে পুছিয়ে।' আমি সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল—'নেহী, হাম দূর সে দেখা খুঁটি টুটা হ্যায়, আউর কাঁড়া উঁহা নেহী। উয়ো দেখকর হাম হুঁয়া সে ভাগা। অগর শের আশপাশমে হোগা তো হামলা কর সেকতা।' ওদের সব কথা শুনে আমার ভাবনা হোল, বাঘে কাঁড়াটা মেরেছে না মোষটা ভয়ে খুঁটো ভেঙ্গে কোথাও চলে গেছে—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ওদের কথা থেকে

আমি আর সময় নষ্ট না করে সকলকে বললাম—জীপে চড় এবং এখনই, আমাকে মারীর কাছে নিয়ে চল। সকলে জীপে বসতে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরে প্রথমে মুন্সীজীর ডিপোতে এলাম এবং আরও ২।৩ জন লোক নিতে হল, যদি মাচান বাঁধতে হয়। আমাদের জীপ খুব সাবধানে এগুতে লাগল। যেখানে মোষটা বাঁধা হয়েছিল তার অনেক আগেই আমরা জীপ থামিয়ে খুব সাবধানে হেঁটে চললাম। আমার খোঁড়া পা নিয়ে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। আমি ভবাদাকে লোক নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে বলে আমিও একটু একটু করে তাদের পেছন পেছন যেতে লাগলাম।

আমি পৌঁছবার অনেক আগেই ভবাদারা খোঁটার কাছে পৌঁছে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। গিয়ে দেখলাম ওখানে কয়েক ফোঁটা রক্ত শুকিয়ে আছে এবং মোষটাকে টেনে নিয়ে যাবার একটু দাগও রয়েছে; ওখানে শক্ত মাটি ও পাথর থাকার জন্য বাঘের পায়ের ছাপ নজরে পড়ল না। আমরা নিঃশব্দে 'ড্র্যাগ মার্ক' ধরে এগুতে থাকলাম। এক জায়গায় জঙ্গলে আগুন লাগার দরুণ কিছু ছাই পড়েছিল—তার ওপরে বাঘের পায়ের ছাপের অস্পষ্ট দাগ দেখতে পেলাম। ভাল করে পরীক্ষা করার পর আমার মনে হোল ওটা একটা বাঘিনীর পায়ের ছাপ। তারপর আবার 'ড্র্যাগ মার্ক' ধরে আমরা আরও এগুতে লাগলাম। খুঁটো থেকে আধ মাইল পৌনে এক মাইল যাবার পর দেখলাম বাঘিনীটা একটা অগভীর নালার মধ্যে মারীটাকে নিয়ে গিয়ে শুকনো ডালপালা ও পাতা দিয়ে ভাল করে ঢেকে রেখে গেছে, যাতে শকুন কি অন্য জানোয়ার দেখতে না পায়। মারীটা পরীক্ষা করে বুঝলাম ওটা একটা বাঘিনীর কাজ এবং আরও লক্ষ্য করলাম বাঘিনীটা মোষটার একটা পেছনের পা কেটে নিয়ে গেছে।। সব দেখে শুনে মনে হোল বাঘিনীটা ভোরে ফেরার পথে আমাদের মোষটাকে দেখেছে এবং মেরে লুকিয়ে রেখে গেছে — সময় পায়নি খাবার। জঙ্গলের লোকেরা খুব ভোরে

উঠে জঙ্গলে যাতায়াত শুরু করে, তাই বাঘিনী "মারী" করেই তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছে।

ভবাদার ও আমার মনের মধ্যে আশা আকাঙ্ক্ষার ঢেউ উঠতে লাগল—এবার হয়ত বনদেবতা মুখ তুলে আমাদের দিকে চাইবেন। এ পর্যন্ত বড় নিরাশ হয়েছি এখানে শিকারে এসে; জুটেও জোটেনি কিছু—তবুও ভাঙ্গা মন নিয়ে আশায় আছি। যা হোক—এর পরের কাজ আমাদের একটা মাচান বাঁধা। চারদিক লক্ষ্য করে বুঝলাম ওখানে মাচান বাঁধা খুবই মুস্কিলের ব্যাপার। কারণ মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে সেগুন গাছের পাতা পড়া স্থুরু হয়ে এপ্রিলে গাছগুলো পাতাবিহীন ন্যাড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ দেখলে মনে হ'বে গাছগুলো যেন সব মরে গেছে। আলাপল্লীর ওই অঞ্চল সেগুন কাঠের জন্য খুব বিখ্যাত। বহুবছর আগে গাছগুলো লাগান, এখন সেগুলো বড় হয়ে জায়গাটাকে গভীর জঙ্গলে পরিণত করেছে। যাই হোক অনেক ভেবে চিন্তে আমরা দুটো পাশাপাশি সেগুণ গাছ দেখে, সেই গাছে মাচা বাঁধা মনস্থ করলাম। মারী থেকে গাছ দুটো ২০।২৫ গজ দূরে হবে। মাচা বাঁধার জন্য আমরা অনেক দূর থেকে রোলা কেটে আনতে বলে, আমি ও ভবাদা একটা ছায়া জায়গা দেখে বসে পড়লাম। অল্প কিছুক্ষণ পর লোকগুলো রোলা নিয়ে এল। ভবাদাকে বললাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটু দেখে শুনে মাচানটা বাঁধিয়ে নেবার জন্য। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মাচানের তলাটা বাঁধা হয়ে গেল। পর্দার জন্য সঙ্গের লোকদের আমি বললাম,—মুন্সীজীর ডেরার কাছে যে কয়েকটা জংলী গাছ আছে, তার বড় বড় পাতা নিয়ে, কঞ্চির ফ্রেম করে, চারটে পর্দা করে ছায়ায় রেখে দিতে। আমরা আড়াইটার সময় আসবো এবং সেই সময় ওরা এসে চারটে পর্দা যেন মাচানের চারদিকে বেঁধে দেয়, বাঁধা হলে আমার ফোল্ডিং মাচানটা নিয়ে এসে মাচানের রোলার ওপরে রেখে চার কোণে বেঁধে দেবো। আর মুন্সীজীকে বললাম

আপ মেহেরবানী করকে হমারা বাস্তে একঠো বাঁশকো সিঁড়ি বন্দোবস্ত করিয়েগা—মেরা প্যায়ের জখম হ্যায়, বেগর সিঁড়িসে হাম মাচান পর চঢ় নেহী সেকে গা। মুন্সীজী বলল—'মেরা পাশ সিঁঢ়ি হ্যায়, আপ ফিকির মৎ করিয়ে।' কথা হতে হতে ঘড়িতে দেখলাম বারোটা বেজে গেছে। আমি ওদেরকে বললাম—আর হামলোগন কো চলনা হ্যায়। জীপ ঘুরিয়ে আমরা মুন্সীজীর ডিপোতে থামলাম। ওরা সকলে নামলে আমি মুন্সীজীকে একটা সিঁড়ি ও চারটে পর্দার ভার দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি রিপনপল্লীতে এসে সেখানে ইউস্থফভাইকে নামিয়ে আমরা জীমলগাট্টার দিকে রওনা হলাম। সময় নেই, ওদের সবাইকেই বলে এসেছি আমরা আড়াইটার মধ্যে ওখানে পৌঁছাব এবং তিনটের মধ্যে মাচানে বসব। প্রায় পৌণে একটায় জীমলগাট্টাতে পৌঁছে কুট্সকে শুভ খবরটি দিলাম। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হোল তিনি তেমন একটা খুশী হলেন না। তিনি বললেন, যে তিনি তাঁর সব বন্দুক ভাল করে তেল মাখিয়ে তুলে রেখেছেন। এখন আর এগুলো বার করতে তিনি নারাজ। কাজেই মাচানে বসতে হলে আমরা তুজনেই যেন যাই। আমি শুনে বললাম—দেখুন আমরা শিকার করতে এসেছি। বন্দুক তুলে রেখেছেন তো কি হয়েছে? আবার বার করুন। বাক্স থেকে বার করা সে আর এমন কি বড় কাজ? কিন্তু দেখলুম, তিনি যখন একবার 'না' করেছেন তখন আর তাঁকে 'হাঁ' করান অসম্ভব। আমরা আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে শুয়ে পড়লাম কারণ সারারাত হয়ত জাগতে হবে।

বিছানায় শুয়ে একটু এপাশ ওপাশ করে তুটো বাজার আগেই আমি ও ভবাদা উঠে পড়ে মিশ্রাদাস ও শম্ভুকে জীপ আনার জন্য বললাম। বেরুবার আগে আমি কুট্সকে আরেকবার অনুরোধ করলাম আমাদের সংগে যাবার জন্য। কিন্তু তিনি বিছানা থেকেই উঠলেন না। আমরা আড়াইটা নাগাদ রওনা হলাম। যাবার পথে

রিপনপল্লী থেকে ইউস্থফভাইকে তুলে আমরা মুন্সীজীর ডিপো থেকে খুব তাড়াতাড়ি চারখানা পাতার পর্দা ও সিঁড়ি নিয়ে মারী থেকে দেড় মাইল দূরে জীপ থামালাম। মিঞাদাসকে বললাম—তুমি আজ জীপ নিয়ে মুন্সীজীর ডিপোতে থাকবে। যদি আমরা বাঘ মারতে পারি তাহলে বাঘ মারার পর আমরা ছুখানা ফাঁকা আওয়াজ করবো, তখন তুমি জীপ ও লোকজন নিয়ে মারীর কাছে আসবে, আর যদি বাঘ মারতে না পারি তাহলে সকাল আটটার পর জীপ নিয়ে এসে আমাদের নামিয়ে নিয়ে যাবে। সিঁড়িটা আনতে ভুলো না, সিঁড়ি না হ'লে আমি মাচান থেকে নামতে পারবো না। তারপর ভবাদাকে বললাম—তুমি লোকজন নিয়ে খুব সাবধানে বিনা আওয়াজে মাচানের কাছে গিয়ে আমার 'ফোল্ডিং সিট্‌টা বাঁধাও আর মাচানের চারপাশে পর্দাগুলো বাঁধাবার ব্যবস্থা করাও। আমি আস্তে আস্তে আমার খোঁড়া পা নিয়ে এগুচ্ছি। ভবাদা মালপত্র ও লোকজন নিয়ে রওনা হল নিঃশব্দে। মিঞাদাস জীপ রেখে আমার সংগে এলো। আমি যখন মাচানের কাছাকাছি পৌঁছেছি, তখন দেখি লোকগুলো খুব উত্তেজিত হয়ে আমাকে ইশারাতে তাড়াতাড়ি মাচানের কাছে যাবার জন্য ডাকছে। আমি পৌঁছাতে তারা বলল—'শের কা আওয়াজ মিলা। আপ জলদি মাচানপর চড়িয়ে। হামলোগ আভি ভাগে গা।' আমি বিনা কথায় সিঁড়ি বেয়ে মাচানে চাপলাম—ভবাদাও সংগে সংগে মাচায় উঠল। উঠে দেখি মাত্র দু'দিকে পাতার পর্দা লাগান হয়েছে, মাচানের পেছনে আর ডানদিকে! সামনেই যেখানে মারীটা আছে আর বাঁদিকে যে ধারে পাহাড় আছে সেই দুদিক খোলা! ভবাদা মাচানে চড়ে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে লোকগুলোর ওপর খুব রাগারাগি করতে লাগল। বলল—'ব্যাটারা কোত্থেকে বাঘের আওয়াজ পেল আমি বুঝলাম না। ওরা তাই মাচানের পর্দাগুলো না লাগিয়েই আমাদের তুলে দিল। এই খোলা মাচানে কি বাঘ

আসে ?' আমি শুনে বললাম—ভবাদা আমাদের কপালে যা আছে তাই-ই হবে। এখন এই নিয়ে মন খারাপ কোরো না। চুপচাপ গুছিয়ে বসে পড়। মনে রাখবে একেবারে খোলা মাচান—আমাদের কোন রকম নড়া চড়া চলবে না। এমন কি চোখের পাতা পর্যন্ত একভাবে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। তবেই কিছু আশা থাকতে পারে। আমি সংগে সংগে মাচানের 'ক্রশবারটা' লাগিয়ে তাতে রাইফেল রাখার জন্য একটি 'স্লাইডিং-ভি' পরালাম এবং তাতে আমার '৪০৫ রাইফেলটা রেখে রাতের জন্য রাইফেলের ক্ল্যাম্প টর্চ ইত্যাদি তাড়াতাড়ি লাগিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা দু'জনে তৈরী হয়ে কাঠের পুতুলের মতন বসে পড়লাম। সেদিন ৯ই এপ্রিল। মধ্যপ্রদেশের প্রচণ্ড গরমে বেলা তিনটেয় আমরা মাচানে চড়েই দরদর করে ঘামতে লাগলাম। তার ওপর মুখ ও হাত দুটো যতখানি খোলা ছিল তার ওপর হাজার হাজার 'ওয়ানি' (ছোট ছোট মাছির মতন পোকা) ছেঁকে ধরল। তখন আমাদের অবস্থা অতি সঙ্গীন—একদিকে খোলা মাচান, তার ওপর 'ওয়ানিগুলো' নাকে মুখে বসে খুবই অস্বস্তিতে ফেলছিল। কোন উপায় না দেখে আমরা তখন চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আমাদের ঘাম একটু কমতে বা শুকোতেই দেখলুম আস্তে আস্তে 'ওয়ানিগুলোও' কমে গিয়েছে। বিকেল চারটে নাগাদ দেখি একপাল হনুমান মারীটার বাঁহাতি জঙ্গলে এলো। দলটাতে প্রায় ৩০।৪০টা হনুমান ছিল। আমি মনে মনে ভাবলাম খুব ভাল হয়েছে—এই হনুমানগুলো বাঘিনী আসার পূর্বমূহূর্তে 'বিপদ সংকেত' করে জানিয়ে দেবে তার আগমন সংবাদ। প্রায় ৪০।৪৫ মিনিট ধরে আমরা হনুমানগুলোর নানান খেলা ও বাচ্চাগুলোর দুষ্টুমি দেখতে লাগলাম। ওরা ক্রমশঃ আমাদের মাচানের বাঁহাতি কোণা বরাবর এগিয়ে এসে আমাদের পেছনে ফেলে চলে গেল। হনুমানগুলো চলে যাবার পর এল চারটে ময়ুর—তার মধ্যে একটা

খুব বড় ময়ূর—তার লেজটা প্রায় ৫।৬ ফুট লম্বা ; আরেকটা ছোট্ট ময়ূর, তারও হাত খানেক লম্বা লেজ রয়েছে—বাকী ছুটো ময়ূরী বেশ বড় মাপের। মাচানের সামনে বাঁ কোণ বরাবর দূরে একটা খোলা জায়গায় ময়ূরগুলো চরে পোকা-মাকড় ধরে খাচ্ছিল। আমরা দুজনে নিশ্চল হয়ে বসে ময়ূরগুলো দেখছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি পাঁচটা চিতল হরিণ সেখানে চরতে এল, তার মধ্যে একটা মদ্দা, তিনটে মাদি ও একটা বাচ্চা। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমাদের বরাত খুব ভাল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও প্রখর শ্রবণশক্তির জন্য জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে ময়ূরের নাম আছে—আর হরিণেরও সেদিক থেকে অনেক সুনাম। লোকে বলে বাঘ ১২ হাত লাফায় তো হরিণ ১৩ হাত। হরিণেরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং প্রখর শ্রবণশক্তি। হরিণ ও ময়ূর বাঘ দেখলে 'বিপদ সংকেত' করবেই করবে। চুপ করে এসব ভাবছি আর দেখছি ময়ূরগুলো হরিণগুলোর দিকে এক পা এক পা করে এগুচ্ছে আর তাদের সংগে ঘুরতে ঘুরতে তাদের গা থেকে পোকা ও মাছি ধরে ধরে খাচ্ছে।

আমরা নিশ্চল অবস্থায় বসে থেকে এইসব মনোরম দৃশ্য দেখছি এমন সময় হঠাৎ আমার নজরে পড়ল মদ্দা চিতল হরিণটার দিকে। দেখি সে তার লেজটা খাড়া করে একদৃষ্টে আমাদের বাঁহাতি কোণাতে যে একটা মস্ত বড় পাহাড় আছে, সেইদিকে তাকিয়ে আছে। আমি আমার মাথাটা কোনোরকম না নাড়িয়ে যদ্দূর সম্ভব বাঁদিকে চোখের তারা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। এমন সময় হরিণটা দু'তিনবার বিপদ সংকেত করে কর্পূরের মতন উধাও হয়ে গেল। সেইসঙ্গে ময়ূরগুলোও বিপদ সংকেত করে কোথায় মিলিয়ে গেল। তারপর সমস্ত জঙ্গলটায় নেমে এল একটা অদ্ভুত নিথর নিস্তব্ধ ভাব। যেন গাছপালা পশু পক্ষী সব ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারুর যেন এতটুকু নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই; এইভাবে



শিকার-স্মারক (ট্রফি)



দক্ষিণচাঁদায় আদিবাসীকে বাঘিনীর মাংস বিতরণ

কতক্ষণ কেটেছে জানিনা। হঠাৎ অনেক দূরে পাহাড়ের দিক থেকে বাঘিনীটাকে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম—তার গায়ে বিকেলের পড়ন্ত রোদ পড়ে চক্‌চক্‌ করছে। সে এঁকে বেঁকে ধীরে ধীরে সেগুন গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে আসতে লাগল। যখন সে আমাদের মাচান থেকে মাত্র ৩০।৪০ গজ দূরে, তখন তার মৃদু গর্জনের আওয়াজ পেলাম—অনেকটা 'হ্যাঃ-হ্যাঃ-র মত আওয়াজ। বাঘ বা বাঘিনী যখন তাদের মারীতে আসে, তখন তারা এইভাবে হ্যাঃ—হ্যাঃ করে আওয়াজ করে। এটা হচ্ছে, যে সব ছোট জানোয়াররা বাঘের মারী চুরি করে খায়, তাদের হুসিয়ার করে দেওয়া—'তোমরা যে যেখানে আছ এবার পালাও—আমি জঙ্গলের রাজা এসে গেছি আমার নিজের মারীতে।' বাঘিনীটা সোজা আমাদের মাচানের দিকেই আসছে—তার হ্যাঃ—হ্যাঃ আওয়াজ ক্রমশঃ আমাদের কানে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—আর আমি চরম উত্তেজনায় আড়চোখে পাথরের পুতুলের মত বসে তাকে লক্ষ্য করে চলেছি। আমার বসা হয়েছে এই রকম—আমার বাঁহাত বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর রাখা আছে আর ডান হাতটা দিয়ে মাচানের 'ক্রশবার'টা মুঠো করে ধরা আছে, রাইফেলটা নয়। তার ৮।১০ ইঞ্চি তফাতে 'ক্রশবার'টার ওপরে আমার '৪০৫ রাইফেলটা রাখা আছে। আমি নিশ্চল নিঃস্পন্দভাবে চোখের পাতা ফেলা বন্ধ করে চোখের বাঁ কোণ দিয়ে বাঘিনীটার এগিয়ে আসা লক্ষ্য করে যাচ্ছি! ভবাদাও ঠিক আমার পেছনেই মাচানের গাছটাতে ঠেস দিয়ে পাথরের মত বসে আছে। ধীরে ধীরে বাঘিনীটা সোজা এসে মাচানের দশ বারো হাত দূরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আগেই বলেছি আমাদের মাচানের বাঁদিক ও সামনের দিক্‌টা একেবারেই খোলা। বাঘিনী হু'চোখে সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে হ্যাঃ—হ্যাঃ করে আওয়াজ করতে লাগল। আমাদের হু'জনের

অবস্থাই তখন বর্ণনার বাইরে। মাত্র দশ বার হাত দূরে—সামনেই একেবারে বেআব্রু অবস্থায় দিনের পড়ন্ত আলোয়—একটা বড়সড় বাঘিনী কট্‌মট্‌ করে জ্বলন্ত দুটো চোখ দিয়ে আমাদের দেখছে, আর আমরা দুই শিকারী বনের মধ্যে পাথরের দুই বুদ্ধমূর্তি হয়ে স্থবিরের মত বসে আছি! এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ বা বুকের ছাতির ওঠা নামাও একদম বন্ধ! ঐ অবস্থার কথা মনে এলে এখনও শিহরণ আনে। সে এক অবিস্মরণীয় সাংঘাতিক ঘটনা! সমস্ত শরীরের শিরায় শিরায় প্রচণ্ড উত্তেজনা—মনের মধ্যে নানা আশঙ্কার ঝড় অথচ কোন রকমেই সে উত্তেজনা প্রকাশ করবার একটুও অবকাশ নেই। নিস্পন্দ হয়ে একেবারে জমে যাওয়া অবস্থায় প্রতিটি মূহূর্ত কাটাতে হচ্ছিল। মরা মানুষের চোখের মত দু'টো চোখ বহুক্ষণ নিশ্চল করে রাখায়—হাপুস নয়নে অভিমানিনার নিঃশব্দ কান্নার মত অনবরত দু'চোখ দিয়ে জল এসে যাচ্ছিল—তারই মধ্যে কয়েকটা 'উয়ানি' পোকার বিরক্তিকর উপস্থিতি—সব মিলে একটা প্রচণ্ড বিশ্রী অস্বস্তি-উত্তেজনার শঙ্কাকুল সমাবেশ! আমার ভবানীদারও ঐ একই অবস্থা!

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভয় দেখিয়ে বাঘিনীটা আমাদের নড়াচড়া দেখার জন্য অপেক্ষা করল এবং আমার ও ভবাদার পাথরের মতন নিশ্চল দেহ দুটো দেখে ওর হয়তো কিছুটা সন্দেহ মিটল। বাঘিনীটা তখনও বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছে না আমি রক্তমাংসের মানুষ না জামা কাপড় পরা খড়ের তৈরী মানুষ, যা চাষীরা বা জঙ্গলের লোকেরা অনেক সময় ব্যবহার করে জন্তু জানোয়ারদের ভয় দেখাবার জন্য। বাঘিনীটা আমার মধ্যে যখন সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পেলই না, তখন সে সম্পূর্ণ ঘুরে হনহন করে, যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে কয়েক পা এগিয়েই ডানহাতি জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি মনে মনে ভগবানকে বলতে লাগলাম—ভগবান এ কি করলে? এত কষ্ট করার পর আমাকে

হু'হুবার বাঘিনীর সংগে ভেট মোলাকাত করালে কিন্তু আমাকে সুযোগ দিলে না মারার? ভাবছি কি কপাল আমার! এই খোলা মাচানে বসে আমি যত সাবধানেই রাইফেল তুলি না কেন বাঘিনী আমাকে দেখে ফেলতই—তাই নিশ্চল হয়ে বসে থাকা ছাড়া আমার কোন উপায়ও ছিল না। চিন্তা ভাবনা উত্তেজনার শেষ নাই—এমন সময় হঠাৎ দেখি বাঘিনীটা ৭০।৮০ গজ দূর থেকে খুব জোরে হেঁটে, আমাদের মাচানের সোজা যেখানে মারীটা আছে আবার সেখানে আসছে। তার চোখ সোজা আমাদের দিকে এবং সেই 'হ্যাঃ-হ্যাঃ' করে গর্জনও করছে। এবারও আমার কিছু করবার নেই—শুধু দেখা, সে কী করে। আমার সামনের নালাতে—যেখানে বাঘিনীটা মারী ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিল, তার পাশেই পড়ে থাকা একটা বড় শুকনো গাছের গুঁড়ি পড়েছিল। তার সঙ্গে আমি মোষটার পিছনের একটা পা বেঁধে রেখেছিলাম। বাঘিনীটা আমার দিকে চোখ রেখে হন হন করে সোজা এসে মারী-টাকে কামড়ে ধরে একটা টান দিল এবং টান দিয়েই বুঝল যে মারীটা বাঁধা আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মারী ছেড়ে উল্টোদিকে ঘুরে হন হন করে সোজা হাঁটা দিল। আমি তখনও ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বসে আছি—আমার করবার কিছু নেই! বাঘিনীর পেছনে গুলি করবার ত কোন মানে হয় না। তাতে হয়তো নাও মরতে পারে—শুধু শুধু তাকে জখম করে কোন লাভ নেই। ওঃ কী আপশোষ—আমার চোখের সামনে দিয়েই সে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে! এইভাবে সে সোজা ৭০।৮০ গজ দূরে চলে গেল। তারপর হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরে আমার চোখের আড়ালে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

তার অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাড়াতাড়ি আমার রাইফেলটা তুলে নিলাম এবং আমার বাঁহাতি সেগুন গাছগুলোর মাঝে যে গলির মত ফাঁক হয়েছে সেদিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম—এই ভেবে যে, এই গলিপথে

যদি বাঘিনীটাকে পেরিয়ে যেতে দেখি, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি গুলি করবো। এই আমার একমাত্র আশা, এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। এইরকম উত্তেজনায় কিছুক্ষণ কাটতে হঠাৎ দেখি প্রায় ৬০।৭০ গজ দূরে মোটা সেগুন গাছের আড়াল থেকে বাঘিনীটা আমাদের মাচানের দিকে যেন একটু তাকাল, তখন গাছের আড়াল থেকে তার মাথা ও ঘাড়ের একটুখানি আমার দৃষ্টিপথে এলো। আমি রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত ছিলাম—মুহূর্ত দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গেই তার বাঁ কাঁধটা নিশানা করে গুলি ছুঁড়লাম। আর বাঘিনীটা সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গেল! তার কোনরকম নড়া চড়া নেই হাত পা ছোঁড়া নেই! একটা অব্যক্ত নিশ্চয়তায় আমি মনে মনে খুব খুশী হলাম—যে আমি নিশ্চয়ই আমার গুলি যেখানে বসাতে চেয়েছিলাম ঠিক সেখানেই বসাতে পেরেছি! এতক্ষণ ভবাদা পিছনে পাথরের পুতুলের মত বসেছিল। বাঘিনীটাকে নিশ্চল হয়ে মাটিতে পড়তে দেখে, সে প্রায় চীৎকার করে 'সাবাস দাদা' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল, আর বার বার বলতে লাগল—'অপূর্ব, অপূর্ব এমন সুন্দর মার আর আমি দেখিনি। গল্পেও শুনিনি।' তারপর সে আমায় অনুরোধ করল আরেকটা গুলি করতে। আমি শুনে বললুম —বাঘিনীটা ত' মরে ভূত হয়ে গেছে ভবাদা---ওকে আবার গুলি করে কি হবে? ভবাদা শুনে বলল—'না দাদা, প্রত্যেক বড় বড় শিকারী তাঁদের বইয়ে বলেছেন, বাঘ যে মরেছে—এই নিশ্চয়তার জন্য দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়া অত্যন্ত জরুরী। আপনি আরেকটা গুলি করুন।' আমি বললুম—বাঘিনীটা যে একটুও নড়ছে না--এখন ওকে গুলি করা মানে শুধু শুধু চামড়াটাকে নষ্ট করা—কি হবে গুলি করে? কিন্তু ভবাদা নাছোড়বান্দা। অগত্যা আমি তখন রাইফেলে আবার গুলি ভরলাম এবং সত্যাই দেখলাম বাঘিনীটা তার মাথাটা একটু তোলার চেষ্টা করছে। আমি সংগে সংগে তার ঘাড়ের পেছনটাতে আর একটা গুলি বসিয়ে

দিলাম এবং তৎক্ষণাৎ বাঘিনীর মাথাটা ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল। ভবাদা আবার বলে উঠল—'অপূর্ব, অপূর্ব!' আগেই বলেছি আমি বাঘিনীটার বাঁ কাধ নিশানা করে গুলি করেছি—গুলির সংগে সংগে সে বাঁ দিকে কাত হয়ে মাটিতে পড়ে, যার ফলে ওর মাথার পেছন থেকে সারা শরীরটা আমার দিকে ঘুরে পড়ে যায়। আমি তার মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম—সেজন্যই আমার দ্বিতীয় গুলি তার মাথার পেছনে—যেখানে মাথাটা ঘাড়টার সংগে যুক্ত থাকে সেখানে লাগে। দুখানা গুলিই আমার নিশানা মত লাগার জন্য আমি ও ভবাদা দুজনেই প্রথমে—ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম এবং মনে মনে খুব খুশী হলাম। শিকারীদের কাছে এই জিনিষটা দারুণ গর্বের ও আত্মশ্লাঘার ব্যাপার। গুলি চালিয়ে হাতে, পায়ে বা পেটে মেরে জখম করার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। কিন্তু যখন শিকারীরা মুহূর্তের মধ্যে ঠিক ঠিক জায়গা খুঁজে নিয়ে নিশানা করে, নির্দিষ্ট জায়গায় গুলি বসাতে পারে, তখন যা আনন্দ হয় তা একমাত্র শিকারীরাই অনুভব করতে পারে—অন্য কাউকে সে আনন্দের কথা বলে বোঝান সম্ভব নয়। এ এক অপূর্ব আনন্দ ও তৃপ্তি।

ঘড়িতে দেখলাম বিকাল ছ'টা বেজে তিন মিনিট। তখনও সারা জঙ্গলে প্রচুর রোদ। ভবাদাকে বললাম—আজকাল গুলির যা দাম তাতে ফাঁকা আওয়াজ করে, দুটো গুলি নষ্ট করে, আমাদের লোক ডাকার কোন মানে হয় না—তার থেকে তুমি মাচান থেকে নেমে মুন্সীজীর ডিপোয় চলে যাও এবং সেখান থেকে গাড়ী নিয়ে মিঞাদাস মুন্সীজী ও আরও লোকজন নিয়ে এস, আর দরকার একটা খাটিয়া ও সিঁড়ি। ভবাদা শুনে বলল—'ঠিক বলেছেন দাদা, আমি এক্ষুনি ওদের ডেকে আনছি এবং সিঁড়ি খাটিয়া সব নিয়ে আসছি।' বলেই মাচান থেকে বীরের মত ঝুলে লাফিয়ে পড়ল এবং পরে আমার কাছ থেকে তার '৩৭৫ রাইফেলটা নিয়ে চলে গেল লোকজন

ডাকতে। আমি একা একা মাচায় বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভবাদার খুব পেটা স্বাস্থ্য—প্রচুর ডন বৈঠক ও কুস্তি করার ফলে তার দারুন ক্ষমতা ও সাহস। অতদূর হেঁটে গিয়ে লোকজন নিয়ে সে ফিরে এল প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ! সবাই খুব উত্তেজিত এবং উল্লসিত। ভবাদা আগে লোকেদের সিঁড়িটা মাচানে লাগাতে বলল। আমি আমার খোঁড়া পা নিয়ে সাবধানে নেমে এলাম। ভাবাদা বলল—'দাদা আপনি আগে চলুন, আপনি প্রথম আপনার শিকার করা বাঘিনীকে দেখুন, তারপর আমরা দেখব। বললাম—আমার জন্য আর বিশেষ ব্যবস্থা কেন—সবাই এক সঙ্গে দেখি চল। ভবাদার এক কথা—'না আগে আপনি।' আমি আর কথা না বাড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগুতে থাকলাম। তখনও কিছু কিছু দিনের আলো ছিল, দূর থেকে লোকেরা বাঘিনীটাকে দেখে বলে উঠল—'আরে এ'তো নর হ্যায়। বড়া ভারী।' যত বলি—নেহী, ইয়ে বাঘিন হ্যায়—লোকগুলি কিছুতেই মানল না যতক্ষণ না তারা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখল। সবাইকে তাড়া দিয়ে বললাম—সব লোগ মিলকর শেরকো খাটিয়া পর চড়াও—বহুত দের হো রহা। খাটিয়াটাতে ঐ মস্ত বড় বাঘিনীটাকে ধরাধরি করে তোলা খুবই শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরপর মুস্কিল হল সিভিলিয়ান জীপে (ছোট গাড়ী—পেছনে অল্প জায়গা) সেটাকে খাটিয়া শুদ্ধ তোলা। শেষ পর্যন্ত গাড়ীর ডালার পেছনের দরজা খুলে খাটিয়া বাদ দিয়ে কোনক্রমে বাঘিনীটাকে ঠেলেঠুলে ঢোকান হলে পর আস্তে আস্তে রওয়ানা হওয়া গেল।

আগলে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের জীপ ওদের কাছে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হোল। মুন্সীজী আমাকে বোঝাল যে ওখানকার দস্তুর হচ্ছে বাঘ জঙ্গলে মারা পড়লে জঙ্গলের লোকেরা বাঘ ও শিকারীকে পূজো করে। উপায় নেই দেখে আমি জীপ থেকে নেমে দাঁড়ালাম বাঘিনীর সামনে। বস্তীর সবচেয়ে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রথমে একটা পিতলের থালাতে কিছু সিঁদুর ও একটা প্রদীপ নিয়ে কি একটা মন্ত্র বলে বাঘিনীর কপালে সিঁদুর লাগাল-এবং প্রদীপ থেকে এক ফোঁটা তেলও বাঘিনীর কপালে লাগিয়ে পরে সিঁদুর ও তেল লাগাল বাঘিনীর পায়ে। তারপর বৃদ্ধা আমার কপালে ও পায়ে তেল সিঁদুর লাগাল। একে একে বস্তীর সব মেয়ে পুরুষরা এই প্রথামত পূজা পর্ব শেষ করলে বৃদ্ধা আমার সামনে এসে তার থালাটা দেখিয়ে চেঁচিয়ে কি একটা বলতে লাগল আমি বুঝলাম না। মুন্সীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার? মুন্সীজী একটু হেসে বললে—'বুড়ী বলছে ওই থালাতে পূজোর জন্য আপনাকে কিছু টাকা দিতে। মেজাজ আমার তখন খুব খুশই ছিল আমি পকেট থেকে একখানা দশটাকার নোট বার করে থালাতে দিলাম। বুড়ী আবাব চেঁচাতে লাগল। মুন্সীজী আমাকে বোঝাল, বুড়ী বলছে তাদের বস্তীতে অনেক লোক ওই দশটাকায় কিছু হবে না—তাই আরও টাকা চাইছে বুড়ী। আমি আরো একখানা দশটাকার নোট তার থালাতে দিয়েই জীপে চেপে মিঞাদাসকে রওনা হতে বললাম। আমাদের তখন অনেক কাজ—প্রধান কাজ হোল বাঘিনীর চামড়া ছাড়ান। তারপর ইউসুফভাইকে জিজ্ঞাসা করতে হবে ওখানে ভাল চামার কেউ আছে কিনা যে আগে বাঘের চামড়া ছাড়িয়েছে, তাকে এখন রিপনপল্লীতে পাওয়া যাবে। শম্ভু বলল—'রিপনল্লীসে ৫।৬ মাইল আগে এক চামার লোগ তিনচার ভাই রহতা হ্যায়, উস লোগ শের কা খাল উতার স্যাকতা। ইউসুফভাইকা সব মালুম হ্যায়।' আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই রিপনপল্লীতে এসে ইউসুফভাইকে ডেকে বাঘিনীটা দেখালাম

—দেখে সে খুব খুশী হোল। ওখানেও আশপাশের লোকেরা সেই বাঘ শিকারীর পূজো দিল। আমি তাড়াতাড়ি পূজোর থালাতে দশ টাকা ফেলে দিয়ে ইউসুফভাইকে নিয়ে চামারের খোঁজে রওনা হলাম। পাঁচছয় মাইল গিয়ে একটা বস্তী পেয়ে ইউসুফ নেমে বস্তীতে গেল চামারের খোঁজে। খানিক পরে তার সংগে তুজন লোককে আসতে দেখলাম। ওরা জানাল ওদের ওস্তাদ বড় ভাই তিন চারদিনের জন্য বাইরে গেছে তাকে পাওয়া যাবে না। তখন আর উপায় নেই দেখে আমরা ওই লোক তুটোকে সংগে করে রওনা হলাম। ইউসুফভাইকে রিপনপল্লীতে নামিয়ে আমরা যখন বাংলোয় পৌঁছলাম তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। জীমলগাট্টাতেও আরেকটা পূজা পর্ব আরম্ভ হয়ে গেল। জীপটা বাংলোর বারান্দার কাছেই রাখা হোল। সেখানে বাঘ দেখার জন্য ভীড় জমল বহু লোকের। আমি চারদিকে আমার সাহেব বন্ধুকে খুঁজতে লাগলাম কিন্তু দেখতে না পেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে গিয়ে দেখি তিনি খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছেন। আমি তাঁকে বললাম—এসে দেখুন, আমি একটা বাঘিনী মেরেছি। তিনি কোন উচ্চ বাচ্য না করে জাঙ্গিয়া পরে বাইরে এসে দূর থেকে তু'এক মিনিট দেখেই গম্ভীরভাবে ভিতরে চলে গেলেন! কি আর করি—একটি ঢোক গিলে ভবাদাকে বললাম—ভবাদা আর সময় নষ্ট না করে পেট্রোম্যাক্স তুটো জ্বেলে আমাদের ছাল ছাড়াবার কাজে লাগা উচিত। আমি রাইফেল রেখে জামা কাপড় ছেড়ে আসছি এমন সময় কুট্স আমায় জিজ্ঞেস করলেন—'বাঘিনীর মাপ নেওয়া হয়েছে?' বললাম—না, এই তো আমরা এলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—'মাপ নেবার জন্য তোমার কাছে ফিতে আছে?' আমি বললাম—না, বহু বছর ফিতে নিয়ে ঘুরেছি কিন্তু বাঘ পাইনি। তাই আর ওসব আমি সংগে আনি না। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার কাছে আছে? উত্তরে বললেন—'নিশ্চয়ই।' —তাহলে আপনি আপনার

ফিতেটা দিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করুন, ঠিকভাবে মাপ নেবার জন্য, ভবাদাও তখন কাছে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কুট্‌স একটু বেতর সুরেই বললেন—'কেন আমি আমার ফিতে দেব? তোমার নিজের প্রয়োজনের জিনিষ তোমার নিজের থাকা উচিত।' একটু রাগ হোল আমার। মনে মনে বললাম—ঠিক আছে, তোমার ফিতে তোমার কাছেই থাক। ভবাদা বলল—'দাদা আপনি চলে আসুন, আমরা দড়ি দিয়ে মাপ তুলবো।'

মাৎসর্য্য বা পরশ্রীকাতরতা মানুষকে যে কতটা অসহনশীল করে তোলে তার পরিচয় পেলাম—বন্ধুবর কুট্‌সকে মাপবার টেপ্ বা ফিতে দিয়ে সাহায্যের অনুরোধ করাতে। বহুদিন বহু দুঃখ-কষ্টের পর আমার ভাগ্যে একটা বাঘ শিকার করার সুযোগ হওয়াতে তিনি খেলোয়াড়ী মনোভাবটি হারিয়ে মাৎসর্য্যের কবলে পড়ে গেলেন—অতি সামান্য একটা ফিতেও এগিয়ে দিতে পারলেন না। তারই বহু অনুরোধে এতবড় একটা রাজসিক শিকারের ব্যবস্থা—যেখানে আমাদের বিশেষ কিছু খরচই করতে হয়নি—আর করতে হলে অন্ততঃ হাজার কয়েক ত লাগতই; খাওয়া-দাওয়া-থাকার সর্বাঙ্গীন সুবন্দোবস্ত, মিঃ ঝা ও মিঃ দাবে এবং ওঝা ভাই দু'টীর সর্বপ্রকার সাহায্য ও সদাজাগ্রত আতিথেয়তা—সব কিছুই ধুয়ে মুছে গেল ঐ মাৎসর্য্যের পাল্লায় পড়ে। না এলো তাঁর আমার প্রতি একটু প্রশংসা, না এলো একটু কৃতজ্ঞতাবোধ শিকারের সমস্ত ব্যবস্থাপনার জন্য!

যাই হোক আমরা বাঘিনীটাকে জীপ সমেত বাংলোর পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে সেখানে ঘাসের ওপর চিৎ করে রেখে তার নাকের ডগা ও লেজের ডগায় দুটো খুঁটি পুঁতে কাপড়ের ফিতে দিয়ে মাপ তুলে নিলাম, পরে আমরা মেপে দেখেছি নয় ফুট। এরপর আমরা দুটো পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বেলে ছাল ছাড়াবার কাজে লেগে গেলাম। আমার কাছে—"ভ্যান ইনুজেন এণ্ড ভ্যান ইনজেনের" বইটা ছিল—সেটা এবং ছাল ছাড়াবার জন্য আমার বানান ছুরি ও

আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির থলিটা ভবাদার হাতে দিলাম। ইউসুফের জোগাড় করা লোক দুজনও ছাল ছাড়াবার কাজে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম, লোকদুটো জাতে চামার হতে পারে কিন্তু এরা কখনও বাঘের ছাল ছাড়ায়নি। প্রতি পদে পদে আমাকে আমার খোঁড়া পা নিয়ে তাদের বলতে বা দেখিয়ে দিতে হল। আমি ভবাদা ও লোকদুটো মিলে বাঘিনীর ছাল ছাড়িয়ে যখন উঠলাম তখন সকাল হয়ে গেছে। আমরা রাত সাড়ে ন'টায় ছাল ছাড়াতে বসেছিলাম আর আমাদের কাজ শেষ হল পরদিন সকাল প্রায় সাতটায়। ছালটাকে ভাল করে নুন মাখিয়ে বাণ্ডিল করে ছায়ায় রেখে মুখ ধুয়ে এবং বেশ কয়েক কাপ চা খেয়ে আবার লাগলাম বাঘের মাংস কাটার জন্য। ভোর থেকেই বড় বড় কাঁসার বাটি হাতে নিয়ে, বাঘের মাংস নেবার জন্য লোকে লাইন দিয়েছিল। সবাইকে মাংস বিলি করে, হাড়গুলো ফেলে দিয়ে বাঘের মাথাটা কেটে অল্প আঁচে সেদ্ধ করতে লাগলাম। বাঘছালটা মাথা সমেত ঠিকমত লাগাবার জন্য (স্কাল মাউন্টিং) মাথাটা দরকার। এ দিকে দেখি ভবাদা খানিক মাংস সহ চর্ব্বি জলে ফোটাচ্ছে। ভবাদা বলল—'সকলে বাঘের তেল চায়, এবারে আমি খানিকটা তেল করে নিয়ে যাব।'

তখন বেলা এগারটা বাজে, ভবাদা আমাকে বলল—'দাদা আপনি এবার স্নান করে নিন এবং খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করুন। বাকী কাজগুলো আমি একাই সব করে নিতে পারবো। আমি একেবারে শেষ করে স্নান খাওয়া সারবো।' বললাম—তাহলে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে। উত্তর পেলাম—'তা হোক।' পূর্ণ স্বস্তিতে আমি তখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে স্নান করে এসে দেখি ভবাদা তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাকে খাবার জন্য কয়েকবার তাগাদা দিলাম কিন্তু সে রাজী হোল না। অগত্যা আমি একাই খেয়ে ঘুমোতে গেলাম। উঠে দেখি বিকেল চারটে বেজে গেছে এবং ভবাদাও তার কাজ

প্রায় শেষ করে এনেছে—বাঘিনীর মাথা থেকে মাংস ছাড়ান হয়ে গেছে এবং মাথাটা ভাল করে ধুয়ে আলাদা করে রেখেছে। কয়েকটা খালি স্কোয়াশের বোতলও জোগাড় করেছে তেল নেবার জন্য। এইভাবে ৯ই এপ্রিল রাত থেকে ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা সারাদিনরাত ব্যস্ত রইলাম ছাল ছাড়ান, চর্ব্বি গলান ও মাথা ফুটিয়ে মাংস ও চর্ব্বি বার করার কাজে। সন্ধ্যেবেলায় আমরা বারান্দায় বসে আরামে খানিক গল্প করে সকাল সকাল রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম।

রাত হু'টো আড়াইটার সময় আমরা বাংলোতে একটা জীপ ঢোকার আওয়াজ পেলাম। উঠে দেখি মিঃ ঝা ওঁদের ট্রেলার সমেত জীপটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কুট্‌সও উঠে পড়ে ছিলেন জীপের আওয়াজ শুনে। তিনি জীপ আসাতে খুব খুশী হয়ে আমাকে বললেন—'জীপ যখন এসেই গেছে তখন কাল ভোরেই আমরা রওনা হতে পারি।' বললাম—তা করা যেতে পারে। জীপের ড্রাইভারকে খানিক শুয়ে আরাম করে নিতে বলে বাকী রাত-টুকুর মধ্যে আমাদের জিনিষপত্র সব গুছিয়ে ফেললাম। ভোরে আমরা যাকে যা বকশিস দেবার দিয়ে প্রায় ছটার সময় জীমলগাট্টা ফরেষ্ট বাংলো থেকে রওনা হলাম বাল্লারপুর গেষ্টহাউস অভিমুখে। সেদিন ১১ই এপ্রিল। আমরা বিকেল চারটেয় বাল্লারপুর গেষ্ট হাউসে এসে পৌঁছলাম। কুট্‌স গেষ্ট হাউসের বেয়ারা ও দ্বারোয়ানদের জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর নামে কোন চিঠি এসেছে কিনা? জবাবে—'নেহী সাহাব' শুনেই বন্ধু একটু গম্ভীর ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জিনিষপত্র নামিয়ে, গেষ্ট হাউসের বারান্দার একটা তারের ওপর বাঘিনীর চামড়াটাকে সাবধানে লম্বালম্বিভাবে ঝুলিয়ে দিলাম যাতে ভাল করে হাওয়া লাগে এবং মাথাটাকে আমাদের খাটের তলায় রেখে দিলাম। ক্লান্ত শরীরটাকে নিয়ে গতরাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক কথাই মনে হচ্ছিল। (নির্বন্ধ বা ক্ষণ এ হু'টি কথার

সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না তাদের একান্ত বাঞ্ছিত বা একান্ত অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যায়। নির্বন্ধ বা ক্ষণটি এলে সব কিছুই মূহূর্তে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এসে যায় শুভদৃষ্টির শুভলগ্ন, একটি ক্ষণের দেখা রেখে যায় চিরকালের জন্য মধুময় স্মৃতি বা দিয়ে যায় চিরমিলনের শুভ গ্রন্থি। তেমনই সেই ক্ষণটি না এলে এ পৃথিবীতে আসারও উপায় নেই—তাকে ছেড়ে যাবারও উপায় নেই। নির্বন্ধ ও যোগসাজে ঐ কাজই করে যায় গোপনে গোপনে। নির্বন্ধের চোখ কানা কথাটি ত প্রায়ই শুনে এসেছি—কত সহস্র ঘটনা তাব সত্যতা প্রমাণ করেছে কিন্তু সেই মহাপুরুষটির চোখ দু'টি আব কানা হয়ে উঠতে পারলো না খোলাই বয়ে গেল আমার নিজের বেলায়—তিনি আর কানা বলে পরিচয় দিতে পারলেন না আমাকে। যাই হোক, ১২ই মার্চ থেকে ৯ই এপ্রিল এই ৩০।৩১টা দিন কত প্রচেষ্টা, কত আশা নিরাশা, কত না পরিশ্রম, সীমাহীন দুঃখ কষ্ট চলে গেল একটি বাঘ শিকারের জন্য। ওখানকার বন্ধুরা শিকারের জন্য দরাজ হাতে খরচ করে গেলেন বেশ কয়েক হাজার টাকা—বিলি ব্যবস্থা সবই হল, বেশ কয়েক বার মাচানেও বসা হল কিন্তু সেই 'ক্ষণ'টি না আসা পর্যন্ত শত চেষ্টায়ও কোন কিছুই ঘটল না—এমন কি অত কাছে শিকারী ও বাঘ মুখোমুখি হয়েও বন্দুকের গুলি বের হবার সুযোগই পেল না। যখন আবার সেই ক্ষণটি এলো তখন ঘন শালবনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটা অত্যন্ত শক্তকব নিশানায়—একটি গুলিতে পেয়ে গেলাম সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত বাঘ। একেই ত বলে "ক্ষণ"।)

১১ই এপ্রিল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় গেষ্ট হাউসের বাগানে মস্ত একটা সভা বসল। বাল্লারপুরেব বহু লোক বাঘিনীর ছাল ও মাথাটা দেখতে এল—মিঃ ওঝারা দুই ভাইও এলেন। তাঁরা আমাদের ওখানকাব 'তারোবা গেম সাংকচুয়ারি' দেখার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। 'তারোবা গেম সাংকচুয়ারি' মধ্যপ্রদেশে বিখ্যাত—জায়গাটা চাঁদা

শহর থেকে প্রায় ১৮।২০ মাইল দূরে। ঠিক হলো ১৪ই এপ্রিল বিকেল তিনটের সময় আমরা 'তারোবা' যাব—মিঃ ওঝারা তাঁদের জীপ ও স্পট লাইট নিয়ে আনাদের 'সাংকচুয়ারী' দেখাবেন এবং তাঁরা সে রাত্রের খাবারও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। 'সাংকচুয়ারী' লেকের ধারে খুব সুন্দর একটা ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস আছে—সেখানে আমরা সকলে বসে রাত্রের খাওয়া খেয়ে ফিরে আসবো। নির্দিষ্ট সময়ে রওনা হয়ে আমরা ছ'টায় সাংকচুয়ারীতে গিয়ে পেঁাছলাম। প্রথমেই দেখলাম একদল 'বাইসন'—প্রায় ২৫।৩০টা, রাস্তার ধারেই শুয়ে ছিল। তাদের নেতা একটা বড় মদ্দা বাইসন—সেও শুয়ে ছিল এবং আমাদের জীপটা থামতে দেখেই উঠে দাঁড়াল। বাইসনগুলো আমাদের জীপ থেকে মাত্র ২০।২৫ হাত দূরে ছিল। কুট্‌স কয়েকটা ছবি তোলার চেষ্টা করলেন। খানিক পর আমরা সাংকচুয়ারীর রাস্তা ধরে কিছুটা যেতেই ৮।১০টার একটা দল—সম্বর হরিণ দেখলাম। আরেকটু এগুতেই একপাল শূয়োর আমাদের জীপের সামনে দিয়েই রাস্তা পেরিয়ে গেল। তাদের নেতাটাও খুব বড় মাপের—তার দাঁত-গুলো তার মুখের ছুপাশে অর্ধচন্দ্রের মতন ঘুরে গেছে। দূর থেকে মনে হল দাঁতগুলোর ব্যাস ৮।১০ ইঞ্চি হবে। আরেকটু যেতেই আমরা "তারোবা" লেকের ধারের রাস্তায় পড়লাম। লেকটার ধার দিয়ে সমস্ত লেকটা ঘুরে একটা রাস্তা বানান হয়েছে। পুরো চক্করটা প্রায় আট দশ মাইল হবে। আমাদের জীপ আস্তে আস্তে চলতে লাগল এবং কিছুদূর যেতেই আমরা চিতল হরিণের একটা ঝাঁক দেখতে পেলাম—প্রায় তিন চারশ হরিণ একসঙ্গে রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটা মদ্দা হরিণের খুব বড় বড় শিং ছিল। একসঙ্গে এতগুলো হরিণ আমি আর কখনও দেখিনি। এইভাবে জন্তুজানোয়ার দেখতে দেখতে, লেকটাকে চক্কর দিয়ে আমরা 'তারোবা' ফরেষ্ট রেষ্ট হাউসে এসে পেঁাছলাম—অতি মনোরম লাগল সমস্ত পরিবেশটা। রেষ্ট হাউসটা খুব সুন্দর করে সাজান; চারপাশে

চমৎকার ফুলের বাগান। ভেতরে প্রত্যেকটা ঘরে ভাল কার্পেট ও আসবাবপত্র দিয়ে সাজান—থাকা খাওয়ারও সুন্দর ব্যবস্থা। বহু বিদেশী ট্রিষ্ট 'তারোবা সাংকচুয়ারী' দেখার জন্য আসে—অনেকে আবার মাসের পর মাস থেকেও যায় আমাদের দেশের জন্তু জানোয়ারদের আচার ব্যবহার দেখা ও জানার জন্য। জন্তু জানোয়াবদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জোগাড় করে তারা দেশে নিয়ে যায়। সমস্ত কিছু দেখে শুনে এবং খাওয়া দাওয়া সেবে আমরা বাল্লারপুব গেষ্ট হাউসে ফিবলাম প্রায় রাত বারটায়। পরের দিন ভোর সাড়ে ছ'টায় আমাদের ট্রেন ধরতে হবে, তাই গেষ্ট হাউসের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কুট্সের মেজাজ গরম হয়ে গেল—যার আঁচ ওঝারা দুইভাইও কিছুটা পেলেন। মিঃ ওঝাদের দুই ভাইএর কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ শিকারের জন্য, জীপ ও মিঞাদাসের মত ভাল ড্রাইভার দেবার জন্য এবং 'সাংকচুয়ারী' দেখাবার জন্য। তাঁরা বিদায় নেবার আগে আমবা তাঁদের অনেক ধন্যবাদ জানাতে তাঁরা আবার ভোরে চাঁদা স্টেশনে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে চলে গেলেন।

১৫ই এপ্রিল ভোরে যথাসময়ে আমরা চাঁদা স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশনে মিঃ ঝা, মিঃ দাবে এবং মিঃ ওঝারা দুইভাই এসেছিলেন। তাঁদের সকলেব কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম—সুন্দর ব্যবহার ও প্রচুর আদর যত্নের জন্য। আর কৃতজ্ঞ রইলাম আমি মিঃবোষ ও মিসেস বোসের কাছে এই রাজসিক শিকার ব্যবস্থার জন্য। আমার শিকার জীবনেব যা কিছু অভিজ্ঞতা তা আমি প্রচুর কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যেই সঞ্চয় করেছি কিন্তু ধারণাতীত প্রাচুর্যের মধ্যে এই রাজসিক শিকার আমার জীবনে ওই প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ।

শিকারে সাক্ষাৎ যমের মুখে

শিকারে সাক্ষাৎ যমের মুখে
কুমাণ্ডি—পালামৌ

বছর পনেরো আগের শিকার সফরের রোজ-ঘটনার পুরানো পাতাগুলি উল্টাতে গিয়ে নজরে পড়ল আমার নোটের এক জায়গায় লেখা আছে—"পঞ্জিকার শুভদিনের নির্ঘণ্ট পাতাটি পড়ে দেখার যে কতখানি গুরুত্ব—তা এবারে বোঝা গেল।" তারিখ দেওয়া আছে—ফেব্রুয়ারা ১৯৬০ সাল। সে সময়ে কাছে পিঠের কয়েকটা বছর ধরেই একটা "বড় জন্তু" (Big Game) শিকারের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি কারণ অন্যান্য নানা জন্তু জানোয়ার শিকার করলেও বাঘ শিকারে তখনও সফল হইনি। শিকারের সমস্ত দরকারী নিয়মগুলি তখন রপ্ত হয়েছে, কঠোর অধ্যবসায়ে শিকারীর নানা গুণাবলী—বিখ্যাত সব শিকারীদের উপদেশানুযায়ী বেশ খানিক অর্জিত ; অন্ধকার রাত্রে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একা একা সারারাত জেগে মাচানে বসে থাকার ধৈর্য ও সাহস সম্পূর্ণ আয়ত্বে এসে গেছে অথচ দেশের সব খ্যাত জঙ্গলে ঘুরেও বাঘ শিকার না করতে পারার আফশোষ সব সময়েই মনে দাগা দিত।

এমনি এক মনের অবস্থায় ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি—বিহারের লাতেহার ডিভিসনের কুমাণ্ডি স্যুটিং ব্লকে আমরা চার বন্ধু মিলে বাঘ শিকারের অভিযান সুরু করলাম—আমাদের গন্তব্যস্থল কুমাণ্ডি—আসানসোল থেকে প্রায় দু'শ মাইলের পথ। স্থানীয় এক বন্ধুর একটা ল্যাণ্ড রোভার আমরা ধার করলাম ড্রাইভার সমেত। এ অভিযান খুব অল্প কয়েকদিনের জন্য—মাত্র ৭।৮ দিনের। আমাদের চারবন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কুট্স ১০।১২ বছর আগে একটা বাঘ মেরেছিলেন, আমরা বাকী তিনজন—রেফিল্ড,

চাটার্জি ও আমি তখনও পর্যন্ত বাঘের সন্ধান পাইনি। তাই আমরা আমাদের ভাগ্য অন্বেষণের জন্য ১০ দিনের সুটিং পারমিট নিয়ে, ধার করা ল্যাণ্ড রোভারকে ভরসা করে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে মালপত্র ও রসদ ট্রেলারে বোঝাই করে রওনা হলাম জি. টি, রোড ধরে লাতেহারের পথে।

মাত্র মাইল দশেক যেতে না যেতেই আমাদের ড্রাইভার রামু মুখ কাল করে বলল—'সাহেব গাড়ীর ব্রেক কাজ করছে না' শুনেই'ত আমাদের সকলের চিত্তি চরকগাছ। জি, টি, রোডের বরাকরের পুলটা তখন মেরামতের জন্য বন্ধ ছিল। তাই কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরের পাশ দিয়ে মাইথন হয়ে আবার জি, টি, রোড ধরার কথা। আমরা যখন বরাকরের কাছে পোঁছেছি তখন বুঝলাম গাড়ীর ব্রেক কাজ করছে না। আমি শুনে বললাম—ঠিক আছে কোনরকমে খুব সাবধানে মাইথন পর্যন্ত চল ওখানে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। ওখানকার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমার বন্ধুলোক, তার মিস্ত্রি দিয়ে গাড়ী মেরামত করান খুব একটা শক্ত কাজ হবে না। আমরা কোনরকমে মাইথন পোঁছেই মিস্ত্রির সংগে আমি নিজেও লেগে পড়লাম। অনেক চেষ্টা করে বুঝলাম সামনের দু-চাকার বিনা ব্রেকেই আমাদের যেতে হবে—পেছনের চাকার ব্রেককে ভরসা করে। তখন প্রায় বিকেল ৫টা বাজে—ওদিকে সমস্ত পথটাই বাকি পড়ে আছে। ড্রাইভার রামুকে পিছনে বসিয়ে আমি নিজেই গাড়ী চালাতে লাগলাম। সারারাত গাড়ী চালিয়ে ভোর চারটের সময় আমরা চাঁদোয়ার একটা নতুন ডাক বাংলোতে এসে পোঁছলাম। হালে ঐ নতুন ডাক বাংলো হয়েছে, আমরা সেইটাতেই উঠলাম—পুরোন বাংলোটা লাতেহার যাবার রাস্তাতে ডানহাতি পড়ে। আমরা নতুন বাংলোর চৌকিদারকে ডেকে একটা ঘর খুলিয়ে কোন রকমে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম। সকাল সাতটা নাগাদ আমরা সবাই ঘুম থেকে উঠে চৌকিদারকে চা বানাতে বলে, হাত

মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। তারপর চা পর্ব সেরে সাড়ে আটটায় আবার রওনা হলাম।

চাঁদোয়া থেকে লাতেহার ২০।২৫ মইলের পথ। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া, আশপাশের মনোরম দৃশ্য, কিছু কিছু জঙ্গল এবং কাছে ও দূরের পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা এগুতে লাগলাম। বেলা দশটা নাগাদ আমরা লাতেহারে পৌঁছলাম। বন্ধু চ্যাটার্জির এক পরিচিত লোক লাতেহার রেল স্টেশনে কাজ করত। কথা ছিল সে আমাদের জন্য কিছু শব্জী, মুরগী ও ডিম কিনে রাখবে এবং আমরা কুমাণ্ডি যাবার পথে লাতেহার স্টেশন ঘুরে জিনিষগুলো নিয়ে যাব। সেই ব্যবস্থামত আমরা জিনিষগুলো নিয়ে আবার রওনা হলাম। পথেই ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের বাংলো, আমি কুট্সকে বললাম যে পথেই যখন ফরেষ্ট অফিসারের দপ্তর তখন একবার অফিসারের সংঙ্গে দেখা করে আমাদের জঙ্গলে যাওয়া উচিত। সকলেই এতে রাজী হওয়াতে আমি গাড়ী থামালাম। স্যুটিং পারমিট কুট্সের নামে থাকায় তাঁকে সামনে রেখে আমরাও গেলাম; গিয়ে শুনলাম সাহেব সরকারী কাজে বাইরে গেছেন, ফিরতে ৮।১০ দিন দেরী হবে। শুনে কুট্স বললেন—'ঠিক আছে, আমরা রেঞ্জার সাহেবের সংগে দেখা করেই জঙ্গলে যাব। উনি কুমাণ্ডিতেই থাকেন।' কুট্স এইদিকে কয়েকবার শিকার করে গেছেন—তাঁর অনেক কিছু জানা আছে। তাঁর সংগে নাকি চীফ কনসারভেটার অব ফরেস্টস-এরও খুব বন্ধুত্ব আছে। উনি নাকি কোন সময়ে কুট্সকে বলেছিলেন্ যে, তোমার যদি কখনও কিছু দরকার হয় তাহলে তুমি নিঃসঙ্কোচে আমাকে জানাবে। এই সব কারণে কুট্সের বেশ গর্ব্ব ছিল। অগত্যা তাঁর কথামতন আমরা কুমাণ্ডির পথে রওনা হলাম।

লাতেহার থেকে বেশ খানিকটা গিয়ে, বড় রাস্তা ছেড়ে, আমরা বাঁহাতি কাঁচা রাস্তা ধরে এগুতে লাগলাম। মাইল ৩।৪ যাবার পর

আমরা সামনে পেলাম ঔরাঙ্গা নদী। নদীটা বেশ চওড়া—নদীর ওপর দিয়েই আমাদের গাড়ী চালিয়ে যেতে হবে—এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই দেখলাম। মধ্যিখানে খানিক পরিষ্কার জল বয়ে যাচ্ছে। বালির ওপর কিছু কিছু বাঁশ এবং রোলা বা বল্লী পেতে দেওয়া আছে—তার ওপর দিয়ে কাঠ বোঝাই লরী ও জীপ যাতায়াত করে। দেখলাম একটা কাঠ বোঝাই লরী নদীর ধারে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। আমাদের ল্যাণ্ড রোভারের অবস্থাও খুব ভাল নয়—'ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ' কাজ করে না। আমি ত তুর্গা নাম জপ করতে করতে গাড়ী নিয়ে নদী পেরোতে লাগলাম। ঠিক নদীর মাঝ বরাবর এসে আমাদের গাড়ী আটকে গেল। কোন উপায় না দেখে ট্রেলারটা খুলে, সকলে মিলে গাড়ী ঠেলে নদীর ওপারে ওঠালাম এবং একই ভাবে ট্রেলারটাকেও ওপারে নিয়ে যেতে হল। এমনি করে আমরা যখন কুমাণ্ডি রেল স্টেশনে পৌঁছালাম তখন বেলা পড়ে এসেছে। স্টেশনে এসে খবর পেলাম রেঞ্জার সাহেব ওখানে থাকেন না—তাঁব অফিস ও বাড়ী লাতেহারে। খবরটাতে মনের মধ্যে বেশ একটু অস্বস্তি হতে লাগল, কারণ তাঁর সাথে দেখা করতে হলে আবার আমাদের নদী পার হয়ে লাতেহারে যেতে হবে। নতুন করে গাড়ী ঠেলার কথা চিন্তা করে বুকের মধ্যে কেমন যেন করতে লাগল। কিন্তু কি করা যায়? জঙ্গলে ঢোকার আগে 'ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার' বা 'রেঞ্জার' কারু না কারুর সাথে দেখা করা উচিত। এই নিয়মই আমরা বরাবর মেনে এসেছি। কিন্তু গাড়ীর এ অবস্থায় কি করা যায় ভেবে আমরা খুব চিন্তিত হয়ে স্টেশনমাষ্টার ও অ্যাসিসট্যাণ্ট স্টেশন মাষ্টারের সাথে দেখা করলাম—যদি তাঁরা কোন সুবিধে করে দিতে পারেন। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক স্টেশন মাষ্টার এবং তাঁর অ্যাসিসট্যাণ্ট একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। তাঁরা তুজনে শুনে বললেন—'রেঞ্জার সাহেব সন্ধ্যের দিকে স্টেশনে আসতে পারেন।' শুনে আমরা তাঁদের অনুরোধ

করলাম, যদি তিনি ওখানে আসেন তাহলে দয়া করে তাঁরা যেন তাঁকে কুমাণ্ডির ফরেষ্ট বাংলোতে পাঠিয়ে দেন। আরও বললাম যে, আমাদের ধারনা ছিল তিনি কুমাণ্ডিতে থাকেন। আমরা আসার পথে ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের অফিসে ও বাংলোতে গিয়েছিলাম অফিসারের সংগে দেখা করতে। কিন্তু শুনলাম তিনি সরকারী কাজে বাইরে গেছেন। তখন ভাবলাম রেঞ্জার সাহেব যখন কুমাণ্ডিতেই থাকেন তখন তাঁর সংগেই দেখা করে আমরা জঙ্গলে যাব। কিন্তু পথে ঔরাঙ্গা নদীতে আমাদের গাড়ী আটকে যাওয়ায় আমরা খুব নাকাল হয়েছি। তার ওপর সারাদিন না খাওয়া এবং আগের দিন সারাদিন ও রাত গাড়ী চালানর পর আমরা খুবই ক্লান্ত বলে, আমরা আজ আর লাতেহারে যেতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। আমাদেব কথা শুনে এবং অবস্থা দেখে ভদ্রলোক দুজন বললেন—'ঠিক আছে, সন্ধ্যেবেলায় রেঞ্জার সাহেব যদি এখানে আসেন তাহলে কথা দিচ্ছি আমরা তাঁকে নিয়ে আপনাদের বাংলোতে যাব।' এই শুনে আমরা তাঁদের অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম রেঞ্জার সাহেব যদি কোন কারণে নাও আসেন, আপনারা কিন্তু আসতে ভুলবেন না। আপনাদের সংগে ভাগ্যগুণে যখন পবিচয় হয়েই গেল তখন সেটাকে সন্ধ্যের আসরে চা খেতে খেতে আরও একটু পাকা করা যাবে। আরও একটা অনুরোধ আপনাদের করি—সেটা হোল, আপনাদের জানাশোনা যদি কোন স্থানীয় শিকারী থাকে, তাকে দয়া করে খবর পাঠাবেন আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। শিকারে সব কিছু জানাশোনা একজন স্থানীয় লোক দরকার। তখন ভদ্রলোকেরা দুজনেই একবাক্যে বলে উঠলেন—'এখানে তেত্‌রা বলে এক লোহার আছে—শিকারী বলে এ অঞ্চলে তার খুব নাম আছে। এখানে যাঁরাই শিকারে আসেন, তাঁরাই একে সঙ্গে নিয়ে যান। আমরা তাকে খবর পাঠাচ্ছি।' এই কথা শুনে, তাঁদের দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা কুমাণ্ডির 'ফরেষ্ট বাংলোর'

দিকে রওনা হলাম।

দিনের আলো থাকতে থাকতে আমরা কুমাণ্ডির ফরেষ্ট বাংলোতে পৌঁছলাম—স্টেশন থেকে প্রায় মাইল ২।৩ হবে। বাংলোটির অবস্থান অতি মনোরম জায়গায়—চারপাশে পাহাড় ও গভীর জঙ্গল। জঙ্গলে লরী চলাচলের রাস্তা থেকে ডানহাতি একটা সরু রাস্তা একেবারে বাংলোতে গিয়ে শেষ হয়েছে। সামনে বেশ একটা চওড়া ঢালা বারান্দা। ঢুকেই সামনে একটা বড় ঘর—খাবার এবং বসবার, একটি খাবাব টেবিল ও কয়েকখানা চেয়ার দিয়ে সাজান। খাবার ঘবের পাশেই দু'টো শোবার ঘর ও সংলগ্ন স্নান করার ঘর—তাতে জলের কলও লাগান। প্রত্যেকটা শোবার ঘরে একটা করে ড্রেসিং টেবিল, একটা করে লেখার টেবিল আর দুটো করে চেয়ার এবং নেয়ারেব খাট পাতা আছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে একজন বুড়ো চৌকিদার আমাদের ঘরগুলো সব খুলে দেখাতে লাগল। শুনলুম তার নাকি খুব জ্বব। যাইহোক সেই বুড়ো চৌকিদারের সাহায্যে একজন লোক ঠিক করে স্নান করার, খাবাব ও রান্নার জলের ব্যবস্থা হল। জিনিষপত্র তাড়াতাড়ি নামিয়ে অল্পসময়ের মধ্যে আমরা শোবার ঘর দুখানা গুছিয়ে ফেললাম। আমি ও চ্যাটার্জি নিলাম খাবার ঘরের বাঁদিকের ঘর আর কুট্‌স্ ও রেফিল্ড নিল খাবার ঘরের সামনের ঘরখানা। দেখলুম বাংলোর পেছনে খানিক উপরে একটা জলের চৌবাচ্চা আছে—পাশেই ইট দিয়ে বাঁধান সিঁড়ি। ভারে করে জল নিয়ে ওই চৌবাচ্চা ভরে দিলে সব কলে জল পাওয়া যায়। সব দিক দিয়েই পরিবেশটা খুব মনোরম বলে মনে হল।

পৌঁছান ত গেল, এবার একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। আমার পুরোণ রান্নার লোক দতুসাহা আমাদের সঙ্গে এসেছে। সে সব দিক দিয়েই বেশ নির্ভরযোগ্য—যেমন বিশ্বাসী তেমন ভাল রান্না করতে পারে। দতুকে প্রথমে আমাদের চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে

তাড়াতাড়ি রাতের খাবার তৈরী করতে বললাম। আমরা সকলেই খুব ক্লান্ত—তাড়াতাড়ি স্নান করে, জামা কাপড় বদলে বসবার ঘরে এসে বসার খানিক পরে স্টেশন মাষ্টার ভদ্রলোক দুটি এসে পৌঁছলেন, সঙ্গে একটি কাল মতন মাঝ বয়সী লোককে নিয়ে। তাঁরা বললেন এই লোকটিই তেত্‌রা শিকারী। শুনে আমরা খুব খুশী হলাম এবং তাড়াতাড়ি দতুকে আমাদের অতিথিদের চা দিতে বললাম। আমরা দুই ভদ্রলোককে কুমাণ্ডির শিকার সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতে করতে সেই সঙ্গে তেত্‌রার সঙ্গেও শিকার সম্বন্ধে অনেক কথা হোল। তেত্‌রাকে বললাম,—তুমি আজ এখানে থেকে যাও—এখানেই খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়—কাল ভোরে আমরা জঙ্গলে যাব বাঘের সন্ধানে। সে এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। আমরা স্টেশনমাষ্টার ভদ্রলোকদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলে তাঁদের আবার অনুরোধ করলাম যেন রেঞ্জার সাহেব এলেই তাঁকে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তাঁদের এ কথাও বুঝিয়ে বললাম যে গাড়ীটার যা অবস্থা তাতে নদী পার হতে ভরসা পাচ্ছি না। কুট্‌স এঁদের সামনেই বলে বসলেন যে তিনি আর গাড়ী ঠেলতে পারবেন না ; নদীর ঠাণ্ডা জলে খালি পায়ে গাড়ী ঠেলে তাঁর খুব সর্দ্দি হয়েছে এবং জ্বরও হবে বলে মনে হচ্ছে। এই শুনে ভদ্রলোক দুজন বললেন, 'না না, আপনাদের আর কষ্ট করে যাবার দরকার নেই। রেঞ্জার সাহেব কাঠের গাড়ী বোঝাই দেখতে রোজই স্টেশনে আসেন—আমরা তাঁকে পাঠিয়ে দেব। আপনারা কিছু ভাববেন না।' শুনে আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আমাদেরই তাঁর কাছে যাওয়া উচিত কিন্তু নানা অসুবিধের জন্য যাওয়া সম্ভব হবে কিনা জানিনা ; এই কথা বলে আমি রামুকে ওঁদের স্টেশনে পৌঁছে দেবার কথা বলায় চ্যাটার্জ্জি ও রেফিল্ড বলল, আমরাও যাব এঁদের পৌঁছতে। সঙ্গে বন্দুকও নিয়ে যাচ্ছি যদি কোন শিকার মিলে যায়। আমি শুনে বললাম, তোমরা যেতে চাও

যাও কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। তোমরা না ফিরলে, আমাদের খাওয়া হবে না।

ওরা চলে যাবার পর সুরু হোল আমার ও কুট্‌সের মধ্যে গল্প। রাতের খাবার তৈরী হয়ে গেছে কিন্তু ওরা দু'জন না ফেরা পর্যন্ত খাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে কুট্‌স হঠাৎ বলে বসলেন, মনে হচ্ছে তাঁর জ্বর আসবে। শুনে বললাম, আপনি যদি কোন ওষুধ খেতে চান তাহলে আমি দিতে পারি। একটা প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স সব সময় আমার শিকারের সাথী হয়ে ঘোরে। আমি প্রতি বছর একলা একলা অন্ততঃ একমাসের ছুটি নিয়ে শিকারের জন্য জঙ্গলে কাটাবার সময় এই ওষুধের বাক্সটা আমার নিজের জন্য না হলেও পরের অনেক উপকারে লেগেছে। কুট্‌স শুনে বললেন তিনি ইতিমধ্যে একবার ওষুধ খেয়েছেন এবং রাত্রে আরেকবার খাবেন। বললাম, আগামী কাল থেকে আমাদের শিকার শুরু হবে আর আপনি যদি শরীর খারাপ নিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে খুবই যে ক্ষতি হবে। দেখবেন যেন কাবীরচবুত্রার শিকারের অবস্থা না হয়। এই-খানে বলে রাখি, বছর তিনেক আগে আমি ও কুট্‌স লম্বা ছুটি নিয়ে মধ্যপ্রদেশের কাবীরচবুত্রা সুটিং ব্লকে শিকারে গিয়েছিলাম। জায়গাটি ছিল অতি সুন্দর—চারপাশে পাহাড় আর গভীর জঙ্গল। কাবীর-চবুত্রার ফরেষ্ট বাংলোটাও ছিল অতি মনোরম জায়গায় একটি পাহাড়ের চূড়োর ওপরে খুব সুন্দর আসবাবপত্র দিয়ে সাজান। ওইখানকার কোন উঁচু পাহাড়ের চূড়ো থেকে নর্মদা নদী বেরিয়েছে। ওখানে পৌঁছানর ২।১ দিনের মধ্যেই আমার বন্ধুর এমন অসুখ করল যে তাঁর প্রাণ বাঁচানর জন্য আমাকে শিকার ফেলে বন্ধুকে নিয়ে পালিয়ে আসতে হল। যদি কোনদিন সুযোগ পাই কাবীরচবুত্রার শিকার কাহিনী লেখার ইচ্ছা থাকল। আপাততঃ সাক্ষাৎ যমের মুখ থেকে আমি কি করে পৈত্রিক প্রাণ ফিরে পেলাম সেই ঘটনাটা বলি।

বেশ কিছুক্ষণ পর চ্যাটার্জি ও রেফিল্ড ফিরে এ'ল। ঘরে ঢুকেই তারা বললো— আমরা যখন দুই স্টেশন মাষ্টার ভদ্রলোককে পৌঁছে দিয়ে ফিরছি তখন উল্টো দিক থেকে একটা জীপ আসতে দেখে আমরা রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ীটা থামিয়ে ওদের রাস্তা দিলাম। জীপটা কাছে আসতে দেখলাম কয়েকজন বন্দুকধারী গাড়ীতে বসে—তার মধ্যে জীপের সামনে একজন খাকি পোষাক পরে বসেছিলেন। তিনি গাড়ী থামিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি করছো? কেন জীপ ও বন্দুক নিয়ে রাত্রে জঙ্গলে ঘুরছো? 'জান এটা বেআইনি? তোমাদের 'পারমিট' আছে?' আমরা তার উত্তরে বললাম, 'পারমিট আমাদের আছে কিন্তু আপাততঃ সঙ্গে নেই, বাংলোতে আছে।' শুনে তিনি খুব রাগ করে বলে উঠলেন, 'পারমিট তোমাদের সঙ্গে রাখার নিয়ম। এবার থেকে পারমিট সঙ্গে রাখবে এবং এখনই বাংলোতে ফিরে যাও।' এই শুনে আমরা'ত ভয়ে পালিয়ে এলাম। মনে হলো ওই ভদ্রলোকই এখানকার রেঞ্জার বা বন বিভাগের কোন অফিসার। কুট্স সব কিছু শুনে খুব রেগে বলে উঠলেন,—'তিনিই যদি রেঞ্জার বা কোন অফিসার হন তাহলে তাঁর জীপেই বা অতগুলো বন্দুকধারী কেন? তিনিই বা রাত্রে জঙ্গলে স্পটলাইট জ্বালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? এখানকার সুটিং ব্লক তো আমরা রিজার্ভ করেছি।' তাঁর কি উচিত হয়েছে আমাদের এলাকার মধ্যে জীপ ও স্পটলাইট নিয়ে শিকার করে আমাদের শিকার নষ্ট করা? আমি ফিরে গিয়েই আমার বন্ধু চীফ কনসারভেটার অফ ফরেস্টস্‌কে সমস্ত জানাব। এসব অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে এরা সব মাথায় চড়ে নাচবে, এর মধ্যে দতু রাত্রের খাবার নিয়ে এ'ল। আমরা সকলে খেতে খেতে এই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। খাওয়ার পর তাড়াতাড়ি যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম—কারণ ভোরেই আবার উঠতে হবে।

আমি আমার ঘরে শুতে যাবার মুখেই দেখি, বুড়ো চৌকিদারটা

সামনে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। সে বলল—'সাব হামারা বহুত জোর বুখার আয়া। তামাম বদনমে বহুত দরদ। হামকো কুছ দাবা দিজিয়ে—নেহিতো হাম মর যায়গা।' লোকটাকে দেখে আমার খুব খারাপ লাগল। তাড়াতাড়ি ওষুধের বাক্স বের করে তাকে একটা ওষুধ দিলাম আর দতুকে ডেকে বললাম, ওকে এক গ্লাস খুব গরম দুধ ও কয়েকখানা রুটি দিতে। চৌকিদারকে বললাম—এ দাওয়াই আউর গরম দুধ রোটি খা কর আজ শো যাও। কাল সুবা ফিন দেখ কর দাওয়াই দেগা। সে আমাকে সেলাম করে চলে গেল। রাত্রে ঘুমের মধ্যে আমি সারারাত আশপাশে অনেকবার বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। মনে মনে ভাবলাম রেঞ্জার সাহেব মনের আনন্দে আমাদের রিজার্ভ এলাকায় তাঁর বন্ধুদের নিয়ে শিকার করে বেড়াচ্ছেন। কিছুই করবার নেই। যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক। ভোরে আমরা চার বন্ধু যখন উঠলাম তখন আমাদের সকলের মুখে একই কথা—সবাই বলছে, শুনেছ গতরাত্রে আমাদের এলাকাতে কতবার বন্দুক চলেছে? সকলেই অন্তত: ৪।৫ বার করে বন্দুকের আওয়াজ শুনেছে। যাই হোক সকলে খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যে যার বন্দুক নিয়ে, গাড়ীতে উঠে বসলাম।

আমাদের একমাত্র ভরসা তেত্‌রা শিকারী। গাড়ীতে উঠে তাকে বলা হোল, যে সব এলাকাতে বাঘের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে সেই সব এলাকায় আমাদের নিয়ে যেতে। ভোর থেকে বেলা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত আমরা অনেক জায়গাতে ঘুরলাম কিন্তু তেত্‌রা এমন কোন জায়গা দেখাতে পারল না যেখানে বাঘের কোন চিহ্ন আছে। আমরা অনেক চিতল, সম্বর ও বার্কিং ডিয়ার দেখলাম। নানা জায়গাতে তাদের পায়ের দাগও দেখলাম এবং ডাক শুনলাম। নিরাশ হয়ে বাংলোতে ফিরে এসে সকলে মিলে একটু চা খেয়ে বুড়ো চৌকিদারকে দেখতে গেলাম। বুড়োর জ্বর কিছুটা কম বলে মনে হোল। তার জন্য আরও কিছু ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে

তেত্‌রাকে বললাম—তুমি দুপুরে খেয়ে তোমাদের গ্রামে চলে যাও। জানাশোনা আরও তিনজন লোককে নিয়ে এ'স যারা দরকার হ'লে মাচান বাঁধতে পারবে। লোকের বন্দোবস্ত করে তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে কারণ বিকেলে আমরা আবার বাঘের সন্ধানে বেরুব। তেত্‌রা চলে গেলে আমরা খাওয়া দাওয়া করে একটা লম্বা ঘুম দিলাম।

দুপুর দু'টো থেকে আবার আমাদের বাঘের সন্ধানে বেরুবার তোড়জোড় চলতে লাগল। আমরা তিনটের কাছাকাছি বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু তেত্‌রা তখনও ফেরেনি। গভীর জঙ্গল আর পাহাড়ের কোল দিয়ে আমরা সব দিক ঘুরে দেখতে লাগলাম। বন্যহাতী, বাইসন, বাঘ, নানারকমের হরিণ, বন্য শূয়োর, চিতাবাঘ ইত্যাদি সব কিছুই পাওয়া যায় ওই জঙ্গলে। আমরা কয়েকটা বাইসন দেখলাম, বন্যহাতীর পায়েব দাগও বহু জায়গাতে পেলাম। এইভাবে প্রথম দিনের সন্ধানী দৃষ্টিতে অনেক কিছু দেখে সন্ধ্যের পর আমরা বাংলোতে ফিরে এলাম।

ফিরে দেখি তেত্‌রা তাদের গ্রামের তিনটি লোক নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। লোক তিনটিকে বললাম—তোমরা কাল ভোরের দিকে এখানে চলে আসবে। তারা 'জী হাঁ' বলে আমাদের সেলাম করে চলে গেল। আমরা জামা কাপড় ছেড়ে, স্নান করে সন্ধ্যেতে একটা আসর জমালাম—তার সঙ্গে চা পর্ব চলতে লাগল। আমাদের অল্প বয়সের বন্ধু দু'টির, চ্যাটার্জি ও রেফিল্ডের প্রাণ কিন্তু ছট্‌ফট্ করতে লাগল, এত হরিণ দেখা সত্ত্বেও তাদের বন্দুক চালাতে দেওয়া হোল না বলে। এই দুজনের মধ্যে চ্যাটার্জির আবার আগামী কাল সকালে ফিরে যাবার কথা। তার বোধ হয় মনে হচ্ছে, এই বাঘ পাগলা কুট্‌স ও আমার জন্য শিকারে এসে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে। অস্বস্তিতে তারা দুজনে টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়ল। বাংলোর বাইরে গজ দশেকের মধ্যে ডানদিকে একটা ফাঁকা

মাঠের মত আছে যেখানে তারা ১০।১৫টা চিতল হরিণ দেখতে পায়। তারা দুজনেই বেশ খানিকক্ষণ ধরে হরিণগুলোকে দেখে পা পা করে বাংলোতে ফিরে খুব উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলল— 'বাংলোর বাইরে দশ গজের মধ্যে ১০।১৫টা চিতল হরিণ রয়েছে— আমরা একটা মারি ?' তাদের বোঝালাম—দেখ, আমরা বাঘ শিকারে বেরিয়েছি, হরিণ মারা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যদি আমাদের কপাল মন্দ হয়, যদি বাঘের দেখা একান্তই না পাই, তাহলে যাবার দিনে হরিণের দিকে নজর দেওয়া যাবে। তার আগে হরিণের উপরে একটা গুলি ও আমরা ছুঁড়তে দেব না। আমার কথা শুনে বন্ধুদ্বয়ের মুখ দুটি শুকিয়ে গেল কিন্তু উপায় নেই। যাই হোক, সেই সন্ধ্যেয় নানা রকম শিকারের গল্প করে রাতের খাওয়া সেরে আমরা যে যার শুয়ে পড়লাম। সারারাত বন্ধুকের আওয়াজ শুনে মনে মনে ভাবলাম, আমরা নিজেরা বন্দুক চালাচ্ছি না, পাছে বাঘ শিকারের ব্যাঘাত ঘটে কিন্তু ওদিকে আমাদের রেঞ্জার সাহেব তার বন্ধুদের নিয়ে খুব মনের আনন্দে আমাদের রিজার্ভ এলাকাতে শিকার করে বেড়াচ্ছেন। চ্যাটার্জির কথা ভেবে মনটা খুব খারাপ লাগতে লাগল; সে বেচারা কাল সকালের ট্রেণে চলে যাবে—তাকেও আমরা একটা হরিণ মারতে দিলাম না।

রাত কাটল। ভোরে উঠে সকলে বাংলোর বাইরে বেরিয়ে দেখি, আমাদের বারান্দার সামনের জমির ওপরে একটা বড় মদ্দা চিতাবাঘের পায়ের দাগ এবং দাগগুলি খুবই তাজা। মনে হয় ভোরের দিকেই ওই চিতাবাঘটা আমাদের বাংলোর সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেছে। আমরা পায়ের দাগ ধরে কিছুদূর যেতেই দেখলাম পায়ের দাগ কুঠির হাতা পার হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। জঙ্গলের কিনারায় একটু ঘোরাঘুরি করতে আমাদের নজরে পড়ল, গতরাত্রে কয়েকটা জংলী হাতীও আমাদের বাংলোর হাতার ঠিক বাইরে এসেছিল এবং তারা আশপাশের গাছগুলো থেকে কিছু ডাল

পালা ভেঙ্গে খেয়ে গেছে। তেত্‌রা খুব উত্তেজিত হয়ে বলল—'সাহাব জংলী হাতী রাতমে কোঠিকা পাশ আয়া থা।' সে উত্তেজিত হয়ে আরও যা বলল, তা থেকে বুঝলাম, জঙ্গলের মধ্যে যে সব ছোটখাট বস্তী আছে তাদের বাসিন্দাদের এই জংলী হাতীর অত্যাচারে প্রায় না খেয়ে মরার দাখিল। তাদের ক্ষেত খামারে তারা যা কিছু ফলায় এই হাতীগুলো তার সব কিছু খেয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দেয়। সবচেয়ে মর্মান্তিক হলো ধান বা গম চাষ করার পর, ঠিক পাকার মুখে অর্থাৎ ২।১ দিনের মধ্যে ওরা যখন ফসল ঘরে তুলে আনবে, ঠিক সেই সময় জংলী হাতীর দল এসে উজাড় করে খেয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দিয়ে যায়। আগে ক্ষেতের ধারে আগুন জ্বেলে রাখলে বা ঢাক ঢোল কি কেনেস্তারা বাজালে ওরা ভয়ে পালাত। কিন্তু এখন তার ঠিক উল্টো ফল হয়। ওরা আগেই এসে ক্ষেতের ধারের আগুন গুলো গোদা গোদা পা দিয়ে নিবিয়ে দেয়। আর ঢাক, ঢোল বা কেনেস্তারা বাজালে ওরা ছুটে এসে ঘর বাড়ী ভেঙ্গে, লোক মেরে নিশ্চিন্ত হয়ে ক্ষেতের ধান বা গম একেবারে শেষ করে দিয়ে যায়। তেত্‌রা বলল—'সাহেব, আমরা বন বিভাগে অনেক দরখাস্ত পাঠিয়েছি, পুলিশে খবর দিয়েছি, কিন্তু কেউই গরীবদের কথা শোনে না। আমাদের কপালে ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে মরাই লেখা আছে।' এই মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে তেত্‌রা ও তার তিন সঙ্গীর প্রায় চোখে জল এসে পড়ল। আমাদেরও শুনে খুব খারাপ লাগল।

সেদিন সকালে আমাদের তাড়াহুড়ো কিছু নেই। চ্যাটার্জি সকালের ট্রেণে চলে যাবে তাকে ন'টার সময় কুমাণ্ডি স্টেশনে পৌঁছে আমরা আবার বাঘের খোঁজে বার হব এই ইচ্ছা আছে। সওয়া আটটা নাগাদ আমরা স্টেশনের পথে রওনা হলাম। স্টেশনে পৌঁছে আমরা তুই স্টেশন মাষ্টারের সংগে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলাম রেঞ্জার সাহেবের সংগে তাঁদের দেখা হয়েছিল কি না?

তাঁরা দুজনেই শুনে বললেন—'কি জানি, তিনি তো প্রতিদিনই একবার স্টেশনে আসতেন কিন্তু সেদিন থেকে তিনি আর আসেন নি। হয়তো কোথাও গেছেন। তিনি এখানে এলেই আমরা তাঁকে আপনাদের কথা বলবো।' তখন আমরা প্রথম রাত্রের ঘটনা তাঁদের বললাম। আপনাদের দুজনকে পৌঁছে আমাদের দুই বন্ধু যখন ফিরছিলেন তখন জঙ্গলের অপরদিক থেকে একটা জীপে কয়েকজন বন্দুক নিয়ে এসে, জীপ থামিয়ে একজন, এই দুই বন্ধুকে খুব বকাবকি করেছেন। মনে হয় তিনিই রেঞ্জার সাহেব। তরপর এই দু'রাত বহুবার আমরা আমাদের এলাকার মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শুনেছি —প্রায় সারারাত ধরেই। এ এলাকা আমরা রিজার্ভ করেছি! এই ভাবে যদি সারারাত বন্দুক চলে তাহলে আমাদের আর বাঘের দেখা পাওয়ার কোন আশাই নেই। রেঞ্জার সাহেবের সংগে দেখা হলে তাঁকে আমরা সব জানব। আমাদের কথা শুনে দুই মাষ্টার মশাই একবার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন বলে মনে হলো। তাঁদেরকে বললাম—কই আপনারাও ত' আর এলেন না—সময় পেলেই আসবেন। আমরা খুশী হ'ব। ইতিমধ্যে ট্রেণ এসে পড়ায় আমরা চ্যাটার্জিকে ট্রেণে তুলে দিয়ে মাষ্টার মশাইদের সংগে হাত মিলিয়ে জঙ্গলের পথে রওনা হলাম।

যদিও তেত্‌রাই আমাদের একমাত্র ভরসা কিন্তু দু'দিনে আমরা এইটুকু বুঝলাম, তেত্‌রার জঙ্গলের পথ ঘাটগুলো জানা আছে ঠিকই কিন্তু কোথায় গেলে ঠিক বাঘের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে সেটা তার বিশেষ জানা নেই; সে শিকারের চাইতে লোহারের কাজের খবর বেশী রাখে। যাই হোক ওকে ভরসা করেই আমরা জঙ্গলে বাঘের সন্ধানে ঘুরতে লাগলাম। এই ঘোরাকালীন আমরা বহুবার সম্বর, চিতল ও কোট্‌রা হরিণের দেখা পেলাম। ইচ্ছে করলেই আমরা দু'একটা মারতে পারতাম। আর এই হরিণ দেখলেই তেত্‌রা ও তার তিন সঙ্গী প্রায় আমাদের পা ধরে অনুরোধ জানাতো একটাকে মারার

জন্য। তারা বলতো, সাহেব একটা মারুন, অনেকদিন আমরা পেট ভরে হরিণের মাংস খাইনি। আমরা শুনে বলতাম আগে আমাদের একটা বাঘ শিকার করিয়ে দাও তারপর একটা কেন, দরকার হলে দু'টো হরিণ তোমাদের মেরে দেব। প্রায় দেড়টায় আমরা বাংলোতে ফিরে এলাম—কিন্তু বাঘের সন্ধান পেলাম না।

স্নান করে খেয়ে ও বিশ্রাম করে আমরা আবার বের হলাম বাঘের সন্ধানে। প্রায় তিনটে থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অনেক ঘোরাঘুরি করে জঙ্গলে যাদের সংগে দেখা হলো তাদের নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং আশপাশের জঙ্গলের মধ্যে যা দু'একটা ছোটখাট বস্তী আছে, সেখানকার বাসিন্দাদের সবাইকে বলে এলাম যদি বাঘে তাদের গরু বা মোষ মারে তাহলে তারা যেন যত তাড়াতাড়ি পারে মারীকে না ছুঁয়ে আমাদের এসে খবর দেয়। খবর সত্যি এবং তাজা হলে যে খবর আনবে তাকে আমরা বকশিস দেব। জঙ্গলে কাঠ কাটতে বা অন্য কোন কাজে গিয়ে যদি তারা কোন সম্বর বা চিতল হরিণের মারীর খবর পায় তাহ'লে তাড়াতাড়ি আমাদের জানালেও তারা বকশিস পাবে। সন্ধ্যের পর বেশ মনমরা হয়ে আমরা বাংলোতে ফিরলাম। দতুকে চা করতে বলে, তেত্রাকে বললাম—তুমি কালকে জঙ্গলে যেখানে নদী, নালা বা জল আছে সেই সব জায়গাতে আমাদের নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে যে সব নালাগুলোতে গিয়েছি সেখানে বাঘের ছাপ বা চিহ্ন কিছুই পাইনি। তেত্রা শুনে বলল—'ঠিক আছে সাহেব কাল আপনাদের নূতন নূতন জায়গাতে নিয়ে যাব।' আমরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আমাদের সময় খুবই কম, আমরা মোটে সাত দিনের ছুটি নিয়ে শিকারে এসেছি তার মধ্যে দুদিন আমাদের এখানে পৌঁছাতেই লেগেছে আর এখানেও আমাদের দু'দিন পেরিয়ে গেল কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটা বাঘেরও সন্ধান পেলাম না। তেত্রা জানাল—'জী হাঁ, ইয়ে তো শের কা জায়গা হ্যায় হুজুর।

হাম লোগন কা গাই ভইসকা উপর কাফী জুলুম করতা। আভী না জানে কিধর ছি'প গিয়া। থোড়া দিন আগে এক আদমিখোর শের ভী থা। দশবিশ আদমি মার কে খা গিয়া। না জানে কোই উয়ো শের কো মারা কি আপনেসে মর গিয়া।" আমরা তিনবন্ধু এ খবর শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে তেত্রাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঠিক কতদিন আগে ক'টা লোক মেরেছিল, কোন কোন এলাকা থেকে লোক মারা পড়ে, সব শেষে কোথা থেকে লোক মারে ইত্যাদি। শুনলাম, সব শেষে যে লোকটি বাঘের পেটে যায়, সে একজন লাইন মেরামতির কুলি। বিকেল তিনটে কি সাড়ে তিনটের সময় তারা ৩।৪ জন মিলে কুমাণ্ডি স্টেশন থেকে এক মাইলের মধ্যে রেল লাইনে কাজ করছিল। সে সময় একটা মালগাড়ি আসতে দেখে তারা কাজ বন্ধ করে লাইন ছেড়ে লাইনের পাশে এসে দাঁড়ায়। এমন সময়ে বিদ্যুতের মতন একটা বাঘ এসে তাদের মধ্যে থেকে একটা লোককে নিয়ে চলে যায়। প্রথমে বাকী কুলিদের মুখে রা সরেনি কিছুক্ষণ। কিন্তু পরক্ষণেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তারা সকলে মিলে খুব চেঁচাতে থাকে। ইঞ্জিন ড্রাইভারও সমস্ত দেখে ওখানে গাড়া থামিয়ে খুব জোরে জোরে বাঁশি বাজাতে থাকে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। তাদের সবার চোখের সামনে দিয়ে হতভাগ্য লোকটাকে বাঘে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকে ওখানকার সব লোকের মনেই খুব ভয়। তারপর থেকে ওখানকার লোকেরা একলা জঙ্গলে যাওয়া একদম বন্ধ করে দেয়। অন্ততঃ ৪।৫ জন লোক না হলে এবং সংগে তীর, ধনুক, টাঙ্গী ইত্যাদি না থাকলে কেউ আর জঙ্গলে যেত না। তা ছাড়া বিকেল হতে না হতেই খাওয়া দাওয়া সেরে ঘর দুয়ার বন্ধ করে সবাই শুয়ে পড়তো। এই মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ শুনে আমাদের মনও খুব খারাপ হয়ে গেল। যাই হোক আমরা সে রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার মত

শুয়ে পড়লাম।

তৃতীয় দিন ভোরে আমরা আবার বাঘের খোঁজে বের হলাম। সেদিন তেত্‌রা আমাদের একটা নতুন জায়গায় নিয়ে গেল,—জায়গাটা আমাদের বাংলো থেকে প্রায় ৬।৭ মাইল হবে। দুদিকে পাহাড় আর গভীর জঙ্গল—মধ্যিখানের উপত্যকাটা বর্ষার সময় একটা পাহাড়ী নদীর মতন হয়ে যায়। সেই উপত্যকার মধ্য দিয়ে খানিক এগিয়ে যেতে জংলী হাতীর অনেক তাজা পায়ের দাগ ও নাদী দেখতে পেলাম। দেখে মনে হোল আমাদের পৌঁছাবার কিছু আগে হাতীগুলো ওখানে ছিল। আমি তেত্‌রাকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কি কোথাও জল আছে? সে বলল—'জী হাঁ। থোড়া দূর আগে এক কুদরুতি ঝরনা হ্যায়। সায়েদ হাতী ওই পানি পিনেকা বাস্তে ইধার আয়াথা'। আমরা আরো কিছুদূর এগিয়ে যেতে এক জায়গাতে একটু জল দেখতে পেলাম। সেখানে বালির ওপর দেখি একজোড়া মাঝারি মাপের বাঘের পায়ের দাগ। তারা ডানহাতি পাহাড় ও জঙ্গল থেকে নেমে ওইখান থেকে কিছুক্ষণ আগে জল খেয়ে গেছে। জলের ধারে দেহের ওজনে তাদের সামনের পাগুলো বালির মধ্যে গভীর ভাবে বসে গেছে এবং জল খেয়ে ফিরে যাবার সময় তাদেব মুখ ও দাড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল বালিতে পড়েছে। এই সব চিহ্নগুলো আমরা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝলাম বাঘ দুটো জল খাবার পর আবার যে পথে এসেছিল সেই পথেই ডানহাতি পাহাড়ে ফিরে গেছে। আমরা সেই জলের ধারে দাঁড়িয়ে ডানহাতি পাহাড়ে মাচা বাঁধার মতন কোন গাছ আছে কিনা লক্ষ্য করতে, ভাগ্যগুণে মাচা বাঁধার উপযোগী অনেকগুলো গাছ দেখতে পেলাম। কুদরুতি ঝরনাটা দেখবার জন্য আমরা আরও কিছুদূর গেলাম। দুই পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকাতে, বড় বড় চাতালের মধ্যে এক জায়গাতে অনেকখানি পরিষ্কার কাঁচের মতন জল দেখলাম। তেত্‌রা বললে—'এইটেই

সাহেব কুদরুতি ঝরনা। এখানে বার মাস জল থাকে। হাজার গরমেও এই জল শুকোয় না।' আমাদের মনে হোল হাতীর পাল ওইখান থেকেই জল খেয়ে গেছে। আর শুধু হাতী কেন, আশপাশের বালিতে অন্যান্য নানারকম জন্তু জানোয়ারের টাটকা এবং পুরোন পায়েরও দাগ দেখতে পেলাম। তেত্‌রার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে গরমের সময় যখন আশপাশের সব জায়গায় জল শুকিয়ে যায় তখন একমাত্র এই জলই এখানকার সব জন্তু জানোয়ারদের বাঁচিয়ে রাখে। জায়গাটি অতি মনোরম। তেত্‌রাকে জায়গার নাম কি জিজ্ঞেস করায় সে বলল—'নারী দান নালা।' নারী দান নালা কেন নাম হলো বুঝলাম না। দুই পাহাড়ের মাঝখান চিরে নালা হয়েছে বলা যেতে পারে কিন্তু নারী এবং দানের কি ইতিহাস সে সম্বন্ধে আমরা মাথা ঘামিয়ে এবং তেত্‌রাকে জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানতে পারলাম না। যাই হোক এবার আমরা একটা মাচান বাঁধার জন্য লেগে পড়লাম। ঝরনার চাতাল পাথরগুলো থেকে খানিক নিচের দিকে নেমে, বালির মধ্যে যেখানে বাঘ ও বাঘিনীর পায়ের ছাপ ছিল সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের ঢালে কয়েকটা মস্ত বড় বড় ঘন পাতাওয়ালা গাছ দেখতে পেয়ে, তার মধ্যে একটাকে পছন্দ করে মাচান বাঁধার কাজ শুরু করে দিলাম। তেত্‌রা এবং তার তিন সঙ্গীকে নালা থেকে বেশ কিছু নিচে গিয়ে মাচানের জন্য রোলা ও জঙ্গলের রশি (এক রকম গাছের ছাল বা লতানে গাছ থেকে লতা কেটে নিয়ে মাচান বাঁধার কাজে লাগান হয়, তাকে জঙ্গলের রশি বলে) আনার জন্য বললাম। বাঘেরা তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং বুদ্ধির জন্য সব সময় শিকারীদের বোকা বানিয়ে দেয়। তাদের নজর এতই তীক্ষ্ণ যে মাচানের আশপাশ থেকে গাছ কেটে রোলা বানালে ঠিক তাদের নজরে পড়ে যাবে—তারা ভাববে হঠাৎ জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন? তাদের প্রত্যেকটি ঝোপ ঝাড় জানা আছে। একটু এদিক ওদিক হলেই তারা ধরে ফেলে। তাই এই

সাবধানতা। ৪০।৪৫ মিনিটের মধ্যে তেত্রা তার সঙ্গীদের নিয়ে আন্দাজমত মাপ করে অনেকগুলি রোলা কেটে নিয়ে এল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমাদের মাচান বাঁধার কাজ শেষ করলে টোপ বা 'বেট' বাঁধার জায়গা ঠিক করে নিতে হল। এর জন্য একটা মজবুত খুঁটো বা গাছের গুড়ি বা শিকড় দরকার। জলের অপর পাড়ে কয়েকটা বড় ফুটবলের থেকেও বড় বড় নানা আকারের পাথর ও কাছে কিছু লম্বা লম্বা ঘাসও গজিয়েছে দেখে আমরা সেই ঘাস ও পাথরগুলোর মধ্যে হাত তিনেক লম্বা একটা মজবুত খুঁটো বালির মধ্যে প্রায় সবটাই পুঁতে দিলাম—যাতে বাইরে থেকে বাঘের নজরে না পড়ে। এইসব করতে প্রায় বেলা এগারটা বেজে গেল। কুট্স তখন একটা প্রশ্ন করে বসলেন, সব কিছু তো হলো, এখন মাচানে কে বসবে আজ রাত্রে? কথাটা একটু ভাববার মত। বলেই তিনি বললেন, তাঁর শরীর খারাপ তিনি মাচানে বসবেন না। তখন বাকী আমরা দুজন—তাই 'টস্' করতে হলো। 'টসে' রেফিল্ডের জয় হওয়ায় আমরা দুজনে খুব খুসী হয়ে রেফিল্ডের সংগে হাত মেলালাম এবং তার সাফল্য কামনা করলাম। তখন আমাদের সব চেয়ে জরুরী কাজ হলো একটা 'টোপ' কেনা। তেত্রাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার কোন জানাশোনা লোক আছে কিনা যে আমাদের একটা মাঝারি মাপের মোষ বেচবে? সে বললে—'চেষ্টা করে দেখবো সাহেব।' আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে ক্মাণ্ডির জঙ্গলে যে কয়েকটা ছোটখাট গ্রাম আছে তার প্রত্যেকটাতে গিয়ে খোঁজ করলাম মোষ বিক্রীর জন্যে আছে কি না কিন্তু তারা যখন শুনল আমরা শিকারের জন্য মোষ খুঁজছি তখন সবাই একবাক্যে না করে দিল। বলল শিকারে বাঁধার জন্য মোষ বেচি না। শেষ পর্যন্ত, তেত্রা অতিকষ্টে ৩৯ টাকায় একটা বুড়ী ছাগল জোগাড় করল। অগত্যা ছাগলই বাঘের টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। যাই হোক

একটা কিছু যে জোগাড় হয়েছে তাইতেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে বাংলোতে যখন ফিরলাম তখন বেলা দেড়টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে আমরা বিশ্রাম করতে গেলাম কারণ তিনটে সাড়ে তিনটের মধ্যে আমাদের আবার রওনা হতে হবে। রেফিল্ড রাত্রে মাচানে জাগবে বলে তাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলায় সে বলল—'আমার রাত জাগা খুব অভ্যেস আছে; না ঘুমুলেও কিছু হবে না। আমি এমনিই সারারাত জেগে থাকতে পারি।' বুঝলাম ছেলেমানুষ, এই প্রথম বাঘ শিকারে মাচানে বসবে তাই উত্তেজনাতে সে এখন ঘুমানো বা বিশ্রাম করার কথা ভাবতে পারছে না। আমি বহুবার একা একা রাতের পর রাত মাচানে কাটিয়েছি: বছরের পর বছর বাঘের সন্ধানে ঘুরতে গিয়ে বহু কষ্ট করে না ঘুমিয়ে না খেয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে, দিনের পর দিন গরুর গাড়ীতে, লরীতে, ট্রেনে কাটিয়ে প্রায় সারা দেশ ঘুরে একটাও বাঘের দেখা পাইনি। আমারও ঠিক ওই রকম হোত প্রথম প্রথম—উত্তেজনাতে আহার নিদ্রা সব ঘুচে যেত। কিন্তু এখন মাচানে বসার সাধনাটা সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছি। নিশ্চল নিথর হয়ে চোখের পাতাটি পর্যন্ত না ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর জঙ্গলে পাথরের মত মাচানে একলা বসে থেকেছি এবং প্রথম প্রথম, সত্যিকথা বলতে কি, খুব ভয় করতো। এমন হয়েছে যে ৬।৭ মাইলের মধ্যে একটা জনপ্রাণী নেই। নিঝুম রাতের অন্ধকারে নানান ধরনের ছায়া দেখে মনে হ'ত ওই বিশালকায় সব প্রেতাত্মা বা ভয়ঙ্কর অশরীরী সব কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিতে বড় বড় চোখ পাকিয়ে আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে আর মনগড়া ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। ভয়ে আতঙ্কে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে—হৃদকম্পও হয়েছে; তবুও নিজের মনোবল বা ধৈর্য হারাইনি। বিকেল ৩।৪টে থেকে পরের দিন সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত এক বিশাল গভীর জঙ্গলে নড়াচড়াবিহীন পাথরের মতন বসে থাকা

এক রকমের কঠিন সাধনা। একটু নড়লে চড়লেই বাঘ এত চালাক যে তার চোখে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য। তার যদি এতটুকু সন্দেহ হয় তাহলে সে বিদ্যুতের মতন সেখান থেকে উধাও হয়ে যাবে। প্রত্যেক শিকারীকে এই সাধনা করতেই হবে—তা না করতে পারলে তার পক্ষে বাঘের দেখা পাওয়া খুবই শক্ত। কিন্তু আমার এমনই বরাত যে, বছরের পর বছর এই সাধনা করে চলেছি কিন্তু আজ পর্যন্তও বাঘের দেখা পাইনি। হয়তো আমার সাধনার মধ্যে কিছু ত্রুটী আছে বা আমার কপালে পাথরচাপা আছে। মাচানে পাথরের পুতুলের মতন সারারাত বসে থাকা প্রথম সাধনা। দ্বিতীয় সাধনা নিজের হাতের নিশানার ওপর বিশ্বাস থাকা এবং বিনা উত্তেজনায় ধীরস্থির হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাঘের মোক্ষম জায়গাতে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করা; এই সব পরীক্ষার সম্মুখীন আমি তখনও পর্যন্ত হইনি। নিজের হাতের নিশানার ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে কিন্তু কথা হোল প্রথম বাঘের দেখা পেলে আমি কতখানি উত্তেজিত হব এবং সেই উত্তেজনাতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে কিনা? তবে দীর্ঘকাল ধরে বনেজঙ্গলে ঘুরে ও শিকার করে আমি অনেক কিছু শিখেছি এবং অনেক সাহস সঞ্চয় করেছি। নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের পায়ের ছাপ দেখে তাদের সনাক্ত করা এবং বাঘ বা বাঘিনীর পায়ের ছাপ দেখে তাদের বয়স ও পরিমাপ মোটামুটি পাকা আন্দাজ করতে শিখেছি, কিন্তু শিক্ষানবীশির পরও দীর্ঘকাল হয়ে গেল বাঘ এখনও জোটেনি।

রেফিল্ডকে নিয়ে দুপুর সাড়ে তিনটের কাছাকাছি আমি রওনা হলাম নারীদান নালার দিকে তেত্‌রা, তার তিন সঙ্গী ও ছাগলটাকে নিয়ে। কুট্‌সের শরীর খারাপ থাকায় তিনি ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে আমাদের সংগে এলেন না। পথে যেতে যেতে আমি রেফিল্ডকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কি একলা সারারাত মাচানে বসতে

পারবে? শুনেই সে বললে—'খুব পারবো।' আমি জানি এই তার প্রথম মাচানে বসা। তাই আবার বললাম—ভেবে দেখ। গভীর জঙ্গলে একলা সারারাত মাচানে বসতে প্রচুর মনের জোর ও সাহস দরকার। সে শুনে বলল—'না, না, আমি একাই মাচানে বসব আমার সংগে কারুর মাচানে বসতে হবে না।' আমি আর কথা বাড়ালাম না। খানিকক্ষণের মধ্যেই আমরা নারীদান নালার এক মাইলের কাছাকাছি এসে গাড়ী থামালাম। জঙ্গলের মধ্যে তেত্‌রার তিনসঙ্গীর একজনকে গাড়ী ও ছাগল পাহারায় রেখে আমরা খুব সাবধানে মাচানের নীচে এসে আমি আবার রেফিল্ডকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভেব দেখ তুমি একলা সারারাত মাচানে থাকতে পারবে কি না? গভীর জঙ্গলে, রাতের অন্ধকারে ছায়ার খেলাতে অনেক কিছুই কিন্তু মনে হবে। প্রথম প্রথম আমারও ভয় করত —তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। হয়তো তার নিজের মনেও এই সন্দেহ ছিল। এবার বলতেই সে এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বলল—'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, তখন একজন লোক আমার সংগে থাকুক।' তার সম্মতি জেনে তেত্‌রাকে বললাম—তুমি সাহেবের সংগে আজ রাত্রে মাচানে থাকবে। তেত্‌রা শুনে বলল —'সাহেব, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার গলাটা আজ ভাল নেই—মধ্যে মধ্যে কাশি হচ্ছে।' তখন তেত্‌রার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলাম তাদের মধ্যে কেউ রাত্রে মাচানে থাকতে রাজী কিনা? তাদের মধ্যে একজন রাজী হোল। আমি তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কাশি টাসি হয়না তো? প্রতিবারই সে মাথা নেড়ে বলল—'না।' আবার জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার গায়ের চাদর টাদর আছে?—ঠাণ্ডা লাগবে না তো? যদিও তখন ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কিন্তু তখনও এইসব অঞ্চল বেশ ঠাণ্ডা। লোকটা তার গায়ের চাদর দেখিয়ে বলল—'এই চাদর আছে— এতেই হবে।' আমি তখন তাদের মাচানে চড়ার জন্য বলে

সাবধান করে দিলাম যেন কোন রকম নড়াচড়া বা আওয়াজ না হয় এবং তারা মাচানে চড়লে পর আমরা টোপ বাঁধার খুঁটির কাছে দাঁড়াব। রেফিল্ডকে বললাম, তুমি ভাল করে দেখে নিও মাচান থেকে টোপের জয়গাটা ঠিকমত দেখা যায় কিনা। যদি কোন ডাল বা পাতা আড়াল মনে হয় তাহলে এখনই তা সাবধানে ভেঙ্গে ঠিক করে নাও কারন পরে আর ঠিক করা যাবে না। ওরা দুজনে মাচানে ওঠার পর আমরা খুঁটোর কাছে যেতে রেফিল্ড ইশারায় জানাল, সব ঠিক আছে। সব ব্যবস্থা ঠিক হতে তেত্‌রাকে ছাগলাটিকে আনার জন্য লোক পাঠাতে বললাম। বাঘের টোপ হিসেবে ছাগল বা মোষ যা কিছু ব্যবহার করা হোক না কেন টোপের কাছে কিন্তু শিকারীকে কখনও মাচানে চড়তে নেই। তার প্রধান কারণ টোপ যদি দেখে ফেলে, তার সামনে একজন লোক গাছে চড়ল আর তারপর তাকে গভীর জঙ্গলে একলা বেঁধে সকলে চলে গেল তখন তার যত ভয় পেতে থাকবে ততই সে বারবার গাছের দিকে তাকাবে। বাঘ টোপের কাছাকাছি এসে দূর থেকে টোপটাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে। টোপটা বার বার গাছের দিকে চাইতে থাকলে, মুহূর্তের মধ্যে তার নজরে পড়ে যায় মাচানের কারসাজি। তখন সে শিকারীর সব ফাঁকি ও চালাকি বুঝতে পেরে কর্পূরের মতন উধাও হয়ে যায়। আর একটা কারন টোপ যদি দেখে, শিকারী তার সামনে গাছে চড়ছে আর বাকী লোক তাকে ফেলে চলে গেল তখন সে তার মনকে বোঝায়—যাই হোক অন্ততঃ একটা লোক তো তার সামনে গাছেই আছে—তার আর ভয় কি? তখন নিশ্চিন্ত হয়ে খুঁটির কাছে বসে জাবর কাটতে থাকে এবং ঘুমিয়ে পড়ে—ফলে তার গলার ঘণ্টা আর বাজে না। সে অবস্থায় বাঘ যদি টোপ দেখতে না পায় তাহলে টোপের কাছ দিয়েও লে যেতে পারে। কিন্তু টোপ যদি সব সময় একলা থাকার ভয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে তাহলে তার গলার ঘণ্টা বাজতে থাকবে এবং

বাঘ অনেক দূর থেকেও সে ঘণ্টার আওয়াজ শুনে দেখতে আসবে—ভাববে ব্যাপার কি? এই গভীর জঙ্গলে একটা মোষ বা ছাগল কি করে এ'ল? সে টোপের কিছু দূরেই লুকিয়ে বহুক্ষণ—এমন কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা টোপ এবং আশপাশের সব কিছু লক্ষ্য করবে। যদি তার সন্দেহ করাব মত তেমন কিছু সে না পায় তবেই সে আড়াল থেকে এসে বিদ্যুতের মতন টোপের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। টোপের ঘাড় কামড়ে মাটিতে ফেলে তার বজ্রকামড় ঘাড়ে লাগান অবস্থাতেই সে লক্ষ্য করতে থাকবে টোপের সব স্পন্দন বন্ধ হলো কিনা। টোপ একদম নিশ্চল, নিস্পন্দ হলে সে উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে দেখবে কোন রকম সন্দেহের কিছু আছে কিনা। যদি সে একেবারেই নিঃসন্দেহ হয়, তবেই সে মারী খেতে আরম্ভ করবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাগলটা নিয়ে তেত্‌রা এসে পৌঁছাল। ছাগলটাকে খুঁটোতে বেঁধে তার গলায় ঘণ্টা বাঁধা হ'লে আমরা আবার ইসারায় জিজ্ঞাসা করে নিলাম, সব ঠিক আছে কিনা? সব ঠিক আছে জেনে নারীদান নালা থেকে গাড়ীর দিকে যখন রওনা হলাম তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ জঙ্গলের চারদিকে চক্‌চক্ করছে। রামুকে খুব আস্তে গাড়ী চালাতে বললাম। জঙ্গলের আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ী এগুতে লাগল। আমার হাতে আমার বহুদিন আগের কেনা মাঝারি মাপের রাইফেল, এফ. এন. ব্রাউনির ·৩০-০৬ যেটা কোনদিন ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। রেফিল্ডের হাতে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে অল্পদিন আগে কেনা ·২৭০ ওয়েদারবি রাইফেল। এই হাল্কা মাপের রাইফেল দিয়ে বাঘ শিকারে আসার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। রেফিল্ডের হরিণ শূয়োর শিকারের হাত খুব ভাল—বাঘের শিকারে আসা তার এই প্রথম, তাই বাঘ শিকারের উপযোগী রাইফেল তার নেই। আমার মনটা কিন্তু একটু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল—রেফিল্ডের রাইফেল খুব হাল্‌কা বলে।

আর ওখানে বাঘ বা বাঘিনীর যা পায়ের দাগ দেখলাম তাতে মনে হোল তাদের বয়স অল্প, তাদের বুদ্ধি হয়তো খুব পাকেনি তাই তারা হয়তো বোকার মতন ছাগলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; আর তাই দেখে রেফিল্ড গুলিও চালিয়ে দিতে পারে। তবে গুলিটা যদি ঘাড়ে বা কাঁধে বসাতে পারে তাহলে আশা করি কোন ভয়ের কারণ নেই। এই হাল্‌কা ধরণের রাইফেলে আমার কোন অভিজ্ঞতা বা আস্থা নেই। এই সব নানা রকম ভাবছি আর আমাদের গাড়ী আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। পড়ন্ত বেলার ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লেগে বেশ আরাম বোধ হচ্ছিল। এমন সময় একটা চিতল হরিণ ডানহাতি পাহাড় ও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মুহূর্তকাল আমাদের গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকাল। তারপর একলাফে রাস্তা পেরিয়ে বাঁহাতি জঙ্গলে খানিক গিয়ে আবার আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়াল। এই দেখে তেত্‌রা ও তার সঙ্গীরা প্রায় আমার হাতে পায়ে ধরতে লাগল, সাহেব হরিণটাকে মারুন। তারা নাকি অনেকদিন হরিণের মাংস খায়নি। আমি হরিণ মারা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি। হরিণটা মাঝারি মাপের সিংওয়ালা চিতল। তার সুন্দর চেহারার দিকে চেয়ে তার বড় বড় কাজল কাল চোখদুটি দেখে আমার হাতের বন্দুক হাতেই থেকে গেল। হরিণটা বেশ কিছুক্ষণ আমাদের দাঁড়িয়ে দেখল। তেত্‌রাদের মধ্যে কেউ একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে বোধ হয় একটু জোরে কথা বলে ফেলেছিল, তাই শুনে হরিণটা এক ছুটে জঙ্গলে পালিয়ে গেল! তেত্‌রা বোধ হয় মনে মনে আমার ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবে। কিছুদূর যেতে একটা কোট্‌রা হরিণকে পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সেটা দেখেই তেত্‌রারা আবার সবাই মিলে মারার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। বেচারা হরিণ আমাদের দিকে করুণচোখ করে তাকাতে থাকায় আমার হাতের রাইফেল আর উঠল না—আমি শুধু হরিটাকে

দেখতে থাকলাম—কী সুন্দর এক জিজ্ঞাসু ভঙ্গিমায় দাঁড়ানটি তার। একটু বাদেই হরিণটার কি মনে হোল কে জানে, সে দু'লাফে গভীর জঙ্গলে চলে গেল। তখনও কিছু কিছু দিনের আলো রয়েছে। চলার পথে এবার হঠাৎ একটা মাঝারি মাপের সম্বর হরিণ ডানহাতি পাহাড় থেকে বেরিয়ে আমাদের গাড়ী দেখে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল অল্পক্ষণের জন্য। দেখি তার বাঁদিকের শিংটা মানুষের হাতের চেটো ও কয়েকটা আঙ্গুলের মতন ফাঁকড়া ফাঁকড়া হয়ে আছে—ডানদিকের শিংটা স্বাভাবিক মাঝারি মাপের। কিন্তু তার বাঁ কানের নিচের থেকে গালের উপর দিয়ে একটা মাংসের থলি—প্রায় হাত খানেক লম্বা এবং তার নীচে ৫।৬ ইঞ্চি ব্যাসের শক্ত কাল মতন কি একটা ঝুলছে। সম্বরটা মাঝে মাঝে মাথা নাড়াচ্ছে এবং তার ফলে শক্ত কাল জিনিষটা দুলে দুলে উঠছে। মনে হল ঐ শক্ত কাল ধরণের জিনিষটা তার একটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ সম্বরটা কি মনে করে এক ছুটে ৪০।৫০ গজ দূরে গিয়ে আবার আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়াল, আর এদিকে মাংসলোভী সঙ্গীর দল প্রায় আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে—'সাহেবজী, মারিয়ে, মারিয়ে।' আমি তখনও পর্যন্ত মন ঠিক করিনি। মনের মধ্যে একবার উকি মারল, এই অস্বাভাবিক সম্বরের ঔরসে তাদের বাচ্চাগুলোরও এই ধরণের গলগণ্ড হতে পারে—একে বোধহয় মেরে ফেলাই উচিত হবে। অনেকদিন হরিণমারা ছেড়ে দেওয়ায়—মারতে আর মন চাইছে না। তেত্‌রাদের নিরুৎসাহের জন্য বললাম, তোমরা ত মোটে তিনজন আছ, এই সম্বর মারলে তোমরা গাড়ীতে তুলবে কি করে? তারা দমবার পাত্র নয়। তেত্‌রা বলে উঠল—'সাহেব অপনি মারুন—আমি এখনি গ্রাম থেকে লোক নিয়ে আসব।' শেষ পর্যন্ত বুঝলাম, ওরা আমাকে দিয়ে সম্বরটাকে মারাবেই। সম্বরটারও বোধ হয় আমার হাতেই মৃত্যু লেখা ছিল। কেন যে সে পালালো না বুঝলাম না। আমিও নিজের মনকে বোঝালাম, এই রোগগ্রস্ত

সম্বরটাকে মেরে হয়তো বনবিভাগের উপকারই করবো। আরেকটা বাসনা আমার মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগলো—শুয়োর মারার জন্য যে রাইফেলটা নতুন কিনেছি সেটাকে প্রথম এই রোগগ্রস্ত সম্বরটার ওপর ব্যবহার করে দেখবার জন্য। শেষ পর্যন্ত আমি সম্বরটার বাঁ কাঁধ লক্ষ্য করে গুলি চালাতেই সম্বরটা গুলি খেয়ে সেইখানে পড়ে গেল। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তেত্‌রাকে বললাম—যাও, এবার লোকজন কোথা থেকে পাবে তার ব্যবস্থা কর। এতবড় জানোয়ারকে গাড়ীতে তোলা খুব ঝামেলার ব্যাপার—এই জন্য আমি সম্বর মারতেই চাইনি। কিন্তু তোমরা একটা হরিণ মেরে দেবার জন্য আমাকে প্রায় খেয়েই ফেলছিলে। তেত্‌রাদের কিন্তু দারুণ উৎসাহ। তারা একলাফে গাড়ী থেকে নেমে লোক ডাকার জন্য জঙ্গলের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমি আর রামু গাড়ীর মধ্যে খানিক বসে থাকলাম। রামু বলল, —'সাহেব, সম্বরটার গলা থেকে কি একটা ঝুলছে লক্ষ্য করেছেন?' শুনে বললাম,—হাঁ, ওই দেখেই তো সম্বরটাকে মারলাম। চল ওটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা যাক। আমরা দুজনে সম্বরটার কাছে গিয়ে দেখলাম, একটা মাংসের থলি প্রায় এক হাতের মত লম্বা এবং তার নীচে একটা মাঝারি মাপের বেলের মতন, কাল শক্ত পাথরের মত জিনিষ ঝুলছে। জানোয়ারদের মধ্যে এই ধরণের অস্বাভাবিক গলগণ্ড আমার জীবনে আমি এই প্রথম দেখলাম। আমি আর রামু এই নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে চলেছি, এদিকে ধীরে ধীরে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে এল।

শিকারে বহুবারই লক্ষ্য করেছি—দিনের শেষ প্রহরটি যখন ধীরে ধীরে আসতে আরম্ভ করে, পড়ন্ত রোদে উঁচু নীচু বনভূমির গভীর জঙ্গলে আলোছায়ার নানা রূপের ধারা বয়ে যায় তখন যেন এক অদৃশ্য ইসারায় একটা সূক্ষ্ম নিথরতার আমেজ আস্তে আস্তে চারদিকে ঘনিয়ে আসতে থাকে। সারাদিনের ক্লান্তি ধুয়ে যেন

রাতের জন্য তৈরী হতে আরম্ভ করে দেয় এই বনজগত নিস্তব্ধতার পর্দা টেনে। জন্তুজানোয়ারেরা দিনের আলো ভরসা করে যে স্বস্তিটুকু বোধ করছিল—রাতের আগমনে তাদের সেই স্বস্তি শেষ হয়ে সজাগ ও সচকিত হবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যার এই স্তব্ধতার প্রকাশ যেন আশঙ্কাময় আগামী কোন পরিচ্ছদের সূচনা করে দেয়। সন্ধ্যাপূর্বের এই শান্ত ভাবটি অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

আমরা সম্বরটার কাছ থেকে ধীরে ধীরে গাড়ীতে ফিরে এসে বসলাম। তেত্‌রাদের দেরী দেখে মনে মনে বিরক্ত হলাম কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর থেকে লোকজনের আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম তারা আসছে। তেত্‌রা প্রায় ৭।৮ জন লোক নিয়ে এসে সম্বরটাকে গাড়ীতে তোলার জন্য লেগে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পর সম্বরটাকে কোনরকমে গাড়ীতে তুলল; তারপর ওই ৭।৮ জন লোকও গাড়ীতে চেপে বসল। আমি তেত্‌রাকে জিজ্ঞাসা করলাম—এরা গাড়ীতে চেপে বসল কেন? এদেরকে নেমে যেতে বল, এরা কাল সকালে এসে মাংস নিয়ে যাবে। ওরা কিন্তু নামতে চাইল না। আমি তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, রাত্রে সম্বরটা কাটা হবে না—পরের দিন সকালে এস। কিন্তু আমার সব বলাই বৃথা হল। তারা সকলেই বলতে লাগল—'আজ রাত্রে আমরা বাংলোতে শুয়ে থাকবো। কাল মাংস নিয়ে তারপর যাব।' আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমাদের গাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। একেই এত বড় সম্বর আর তার ওপরে তোমরাও যদি গাড়ীতে চাপো তাহলে গাড়ী আর চলবে না। শেষে অনেক কষ্টে ওই ৭।৮ জনকে নামিয়ে দিয়ে আমরা সাতটার মধ্যে কুমাণ্ডির বাংলোতে এসে পেঁছিলাম। গাড়ী থেকে নেমেই এক ছুটে গেলাম কুট্‌সকে ডাকতে। ঘরে গিয়ে দেখি ভর সন্ধ্যেবেলায় তিনি কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। তাঁকে জাগিয়ে বললাম—

তাড়াতাড়ি বাইরে আসুন—একটা সম্বর মেরেছি, দেখবেন আসুন এই ধরনের সম্বর আপনি কখনও দেখেছেন কি? কুট্স তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে এলেন। আমি রামু আর তেত্‌রাকে বলেছিলাম, বাবুর্চিখানার পাশে যে খালি ঘরটা আছে, সম্বরটা নামিয়ে সেই ঘরে রেখে দিতে। এসে দেখলাম, ওরা সবাই মিলে সম্বরটাকে নামাবার চেষ্টা করছে। কুট্স টর্চ্চ ও হ্যারিকেনের আলোতে অনেকরকম পরীক্ষা করে দেখলেন এবং স্বীকার করলেন ওই ধরনের গলগণ্ড তিনি কোন জন্তু জানোয়ারের মধ্যে দেখেননি। পরীক্ষার পর সম্বরটাকে কি করে বাবুর্চিখানার পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া যায় তা একটা সমস্যা হয়ে উঠল। তেত্‌রা, তার দুই সঙ্গী, রামু ও দতু এই ক'জনে মিলে খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারছিল না। বুড়ো চৌকিদার বেচারা জ্বর নিয়ে বাবুর্চিখানার বারান্দাতে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে সব দেখছে—হয়তো কোন সাহায্যে আসতে পারছে না বলে মনে মনে আপশোষ করছে। এমন সময় দেখি আমরা যে ক'জন লোককে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়েছিলাম তারা আসছে মাংসের লোভে। তারা হয়তো ভেবে থাকবে সে রাত্রেই মাংস কাটা হয়ে যাবে, ফলে তারা মাংসের ভাগই পাবে না। যাই হোক তারা চলে আসায় আমাদের সুবিধে হয়ে গেল। ওদের সাহায্য নিয়ে সম্বরটাকে বাবুর্চিখানার ঘরের মধ্যে রেখে দরজায় শিকল লাগিয়ে দেওয়া হোল। আমরা দতুকে চা বানাতে বলে ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করে চায়ের মাধ্যমে সন্ধ্যেটা বেশ গল্প করে কাটালাম, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের মাচানে বসা বন্ধু রেফিল্ডের কথা উঠল। আমি বললাম—দেখা যাক কি আছে ওর বরাতে'। হয়তো আজ রাত্তিরে ও বাঘ পেয়ে যেতে পারে। প্রথম মাচানে বসা হয়ত ভাগ্য এনে দিতে পারে। কিন্তু আমার ভয় রেফিল্ডের রাইফেল খুব হাল্‌কা বোরের বলে—ঠিক জায়গাতে না মারতে পারলে বাঘ মরার থেকে জখম হবার

সম্ভবনাই বেশী। কুট্‌স শুনে বললেন—'২২ বোরের রাইফেল দিয়ে বাঘ মারার খবরও আমি জানি।' আমি হেসে বললাম—"আলপিনে খুন" সস্তার ডিটেক্‌টিভ নভেলে পাওয়া যায়, ও সবের ওপর আমার মোটেই ভরসা নেই। তবে রেফিল্ডের হাত বেশ ভাল, এই যা ভরসা।

রাত সাড়ে ন'টায় আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার বিছানায় গেলাম। নানা রকম ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বলতে পারি না। রাত বারটা নাগাদ মনে হলো মাথার দিকের জানালাতে কে যেন জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে এবং 'সাহেব' 'সাহেব' বলে ডাকছে। আমার ঘুম খুবই পাতলা। সংগে সংগে উঠেই মনে হলো একটা জীপ আমাদের বাংলো থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। জানালাটা খুলে দাঁড়াতেই দেখি, আমাদের বুড়ো চৌকিদার হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠল। তার কান্না শুনে প্রথমে মনে করলাম বুড়োর বোধ হয় জ্বর বা কোন কষ্ট বেড়েছে—তাই আমাকে ডেকেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে? আমাকে ভাল করে বল, তা না হলে আমি কি করে বুঝব? সে কান্নার বেগটা খানিক কমিয়ে আমাকে যা বলল তা শুনে আমার সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠল। ব্যাপারটা হলো, আমরা যেদিন থেকে কুমাণ্ডিতে শিকারে এসেছি, আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা রেঞ্জার সাহেবকে সেলাম করে আসিনি বলে তাঁর যত রাগ আমাদের ওপর, এবং তাঁর যত রকম কূটবুদ্ধি জানা আছে সবগুলোই তিনি আমাদের ওপর প্রয়োগ করবেন বলে মনে হচ্ছিল। উপস্থিত তাঁর নির্যাতনের ফল ভোগ করছে আমাদের বুড়ো চৌকিদার। একেই সে বেচারা ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছে—তার শরীর খুবই দুর্বল—তাকে আমি ওষুধ ও পথ্য সব কিছু দিয়ে ভাল করার চেষ্টা করছি অথচ, তারই ওপর নির্যাতন। রেঞ্জার সাহেব রাত্রে বন্ধুদের নিয়ে আমাদের এলাকাতে শিকার করতে এসে খবর

পান যে বিকেলে আমরা একটা সম্বর মেরেছি। সে খবরে তাঁর মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যায়। আমাদের বিকেলের মারা সম্বরটি রাত্রে স্পটলাইটের সাহায্যেই মারা হয়েছে এবং ফলে আমরা আইন বিরুদ্ধ কাজ করেছি—এই সাক্ষী দেবার জন্য রেঞ্জার সাহেব বাংলোর চৌকিদারকে বলেন—'তুই সাক্ষী দিবি—সাহেবরা রাত বারটার সময় ওই সম্বর মেরে বাংলোতে ফিরেছে।' বুড়ো বেচারা তো শুনেই অবাক। সে বার বার বলে—'সাহেবরা সন্ধ্যের রেলগাড়ী যাবার অনেক আগে বাংলোতে এসেছেন। আমি এই মিথ্যে কথা বলতে পারবো না। তা ছাড়া জ্বরে আমি মরে যচ্ছিলাম, সাহেবরা আমাকে দাওয়াই দিচ্ছেন, খেতে দিচ্ছেন, আমি এত বেইমান নই যে তাঁদের নামে মিথ্যে মিথ্যে এইসব কথা বলবো।' এই শুনে রেঞ্জার সাহেবের খুব রাগ হয়ে যায়। তখন তিনি ঐ অসুস্থ চৌকিদারকে উত্তম মধ্যম দেন এবং শাসান যে, যদি সে তাঁর কথামত সাক্ষী না দেয় তাহলে তার চাকরী খেয়ে দেবেন। বুড়ো তার দুর্বল শরীর নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এতগুলো কথা বলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমারও এই অত্যাচারের কথা শুনে মনমেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। মনে হোল লোকটাকে হাতের কাছে পেলে তাকে আমি উচিত শিক্ষা দিতাম। উপস্থিত কিছুই করবার নেই। বুড়ো চৌকিদারকে বললাম—তুমি মন খারাপ কোরো না। একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর গিয়ে। কাল সকালে দেখা যাবে কি করা যায়।

চৌকিদার তো বাবুর্চিখানার দিকে অন্ধকারে শুতে চলে গেল এবং আমিও বিছানায় ফিরে এলাম কিন্তু সারারাত আর চোখে ঘুম এল না। যতবার রেঞ্জারের অত্যাচারের কথা মনে পড়ে ততবারই ঘুম মাথায় চড়ে যায়। ভোর হতেই বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। খানিক পরেই কুট্স উঠে আমায় সুপ্রভাত জানালেন। আমি তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। তাঁকে গতরাত্রের সব ঘটনা বলতে তিনি তো শুনেই খুব রাগ করতে লাগলেন। চৌকিদারের কাছ

থেকে সব ঘটনাটা আবার শুনতে চাইলে বলতে বলতে বুড়োর চোখ দিয়ে আবার জল পড়তে লাগল। সে বারবার বলতে লাগল—'আমি বুড়ো হয়েছি, আমি কি করে এত বেইমানির কথা বলবো হুজুর? আপনারা আমার কত উপকার করেছেন, আমাকে দাওয়া দিয়েছেন, খেতে দিচ্ছেন, আমার জান বাঁচিয়ে দিলেন, আর আমি মিথ্যে সাক্ষী দেব আপনাদের নামে? রেঞ্জার সাহেব আমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দেবেন বলেছেন,—করুন বরখাস্ত—ভগবান মালিক, তিনিই আমাকে দেখবেন—বেইমানি করতে পারবো না হুজুর।' কুট্‌স সব কিছু নিজের কানে শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে বললেন—'আমি ফিরে গিয়েই আমার বন্ধু চীফ কনসারভেটার অব ফরেষ্টস-কে এইসব অত্যাচারের কথা লিখে জানাব। এই ধরনের অসৎ ব্যবহার চলতে থাকলে যারা সত্যি-কারের শিকারী তারা কি করে জঙ্গলে আসবে? আমাদের রিসার্ভ করা এলাকায় রেঞ্জার হয়ে সে যে কি করে বন্ধুদের নিয়ে সারারাত শিকার করে আমাদের শিকার নষ্ট করতে পারে, তা আমার ধারনার অতীত। তাকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।' আমি তেত্‌রাকে বললাম—সব লোক নিয়ে সম্বরটাকে বাইরে এনে, ছাল ছাড়িয়ে, মাংস কাটতে লাগিয়ে দাও—আমরা আবার আটটার মধ্যে বেরিয়ে যাব, সাহেবকে মাচান থেকে আনবার জন্য। সে শুনে বলল—'জী হাঁ। আমি সব ব্যবস্থা করছি।' আমরা দুই বন্ধু দতুকে চা দেবার কথা বলে হাত মুখ ধুতে চলে গেলাম। আমরা চা খেতে বসেছি এমন সময় খাকি পোষাক পরা একজন লোক আমাদের সামনে এসে একটা সেলাম করে দাঁড়াল। সে বললে—'আমি জঙ্গলের পাহারাদার—হুজুর। আমাকে রেঞ্জার সাহেব আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন কারণ গতরাত্রে অপনারা যে সম্বরটা মেরেছেন সেটা রেঞ্জার সাহেব জপ্‌ত করার হুকুম দিয়ে আপনাদের জানাবার জন্য বললেন।' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—জপ্‌ত

করার হুকুম যে তিনি দিয়েছেন, তা কি তিনি কিছু লিখে দিয়েছেন? সে বললে—'না হুজুর। তিনি আমাকে মু-জবানি আপনাদের জানাবার জন্য বলেছেন।' কুট্স তো এই কথা শুনে রেগেই আগুন। তিনি বললেন—'আমরা তো বেআইনি করে সম্বর মারিনি। আমাদের পারমিটে আছে, আমরা একটা সম্বর মারতে পারি। আমরা মাদি সম্বরও মারিনি যে তিনি বলবেন আমরা বেআইনি কাজ করেছি। চল তুমি নিজে দেখে যাও, আমরা একটা সিংওয়ালা নর সম্বর মেরেছি। তাহলে কোথায় আমরা বনবিভাগেব আইন অমান্য করেছি যে তোমাদের রেঞ্জার সাহেব আমাদের মারা সম্বরটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য তোমাকে পাঠিয়েছেন?' তখন লোকটা হাতজোড় করে বললে—'হুজুর আমি আপনাদের কাছে এসেছি রেঞ্জার সাহেবের হুকুমে। আমি এসব কিছুই জানি না। দেখুন না রাত থাকতে উঠে, হাতমুখ না ধুয়ে, নাস্তাপানি না করেই, এতখানি পথ ভোরের অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে আসছি রেঞ্জার সাহেবের হুকুম তামিল করার জন্য।' আমরা তাকে গতরাত্রে চৌকিদারকে মারার কথাটাও জানালাম এবং বাবুর্চি-খানার কাছে যেখানে সম্বরটা কাটা হচ্ছিল সেখানে নিয়ে গেলাম। তাকে বললাম—তুমি নিজে দেখে গিয়ে রেঞ্জার সাহেবকে বোলো যে আমরা মাদি সম্বর মারিনি। আর তিনি যে কোত্থেকে খবর পেলেন জানি না—আমরা রাত বারোটার সময় মারিনি। আমরা দিনের আলোতে সন্ধ্যের মুখে আমাদের এলাকার মধ্যেই সম্বরটাকে মেরেছি। আমরা বাংলোতে পৌঁছবার অনেক পরে সন্ধ্যের ট্রেণগাড়ীটা গেছে। ট্রেণটা সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ ওখান দিয়ে যায়। রেঞ্জার সাহেব আমাদের সংগে এই ধরনের ব্যবহার কেন করছেন আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা যদি কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে তিনি নিজে এসে আমাদের বলতে পারতেন। এই বুড়ো চৌকিদারকে গতরাত্রে অনেক

মারধোর করেছেন—তুমি এই বুড়োর কাছ থেকে নিজের কানে সব শুনে যাও। বেচারা সব কিছু দেখে শুনে বোধহয় একটু লজ্জা পেল। সে বারবার বলল—'হুজুর আমি কি করবো? হুকুম তামিল করার জন্য নাস্তাপানি না করেই এতখানি পথ ছুটে এসেছি।' এই শুনে আমি দতুকে বললাম ওকে চা ও কিছু খাবার দিতে। চা ও খাবার খাওয়া হয়ে গেলে পাহারাদারটা আবার আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—'হুজুর তাহলে আমি রেঞ্জার সাহেবকে গিয়ে কি বলবো?' তাকে বললাম—তুমি যা যা দেখে গেলে ঠিক তাই বলবে। আর মাল জপ্‌ত করা সম্বন্ধে বলবে রেঞ্জার সাহেব তোমাকে মু-জবানি বলেছেন—তিনি লিখিতভাবে কিছু জানান নি। আমরা কি করে বুঝবো তুমি ঠিক বলছো কিনা? তিনি যদি চান তাহলে এখন এসে নিজে দেখে যেতে পারেন—আমরা নর সম্বর মেরেছি এবং রাত বারোটার সময় স্পটলাইট জ্বেলে সম্বর যে মারিনি তার অনেক প্রমাণ আমাদের আছে। মাংস কাটাকাটি করতে আমাদের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। তাঁকে এখনই চলে আসতে বলবে। বেশী দেরী হলে আমরা সব মাংস গ্রামের লোকেদের দিয়ে দেব। সে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা সেলাম করে চলে গেল।

পাহারাদার চলে যাবার পর কুট্টসের কি রাগ আমার ওপর। —কেন আমি ঠাণ্ডা মেজাজে ওই লোকটার সংগে এতক্ষণ কথা বললাম। কেন বললাম না রেঞ্জার নিজে এসে আমাদের সংগে দেখা করে বলে যাক—যদি তার সাহস থাকে? তিনি সব কথা একটি একটি করে তাঁর বন্ধু চীফ কনসারভেটার অব ফরেষ্টস-কে জানাবেন। আমি আর কিছু না বলে তাঁকে বললাম—চলুন এবার আমরা মাচানের খবর নিয়ে আসি—দেখা যাক আমাদের বন্ধুটির কপালে কি ঘটেছে। আমরা আটটার কিছু পরে নারীদান নালার কাছাকাছি গাড়ীটা জঙ্গলের মধ্যে রেখে, খুব সাবধানে

মাচানের দিকে এগিয়ে গেলাম। আড়াল থেকে লক্ষ্য করে দেখলাম ছাগলটা সশরীরে বালির ওপর বসে মনের আনন্দে জাবর কাট্‌ছে! আরেকটু আড়াল দিয়ে এগুতেই দেখি রেফিল্ড আর তেত্‌রার দেওয়া লোকটি মাচানের নীচে দাঁড়িয়ে আছে! আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম এবং খুব নীচু গলায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার? বাঘ কি রাত্রে এসেছিল? রেফিল্ড খুব রাগ করে বলে উঠল—'আসেনি আবার! তিন তিনবার বাঘটা ছাগলটার খুব কাছে এসেছিল—কিন্তু আমার এই রাতের সঙ্গীটির জন্য সব কিছু মাটি হয়ে গেল। যতবার বাঘ এসেছে ততবারই এই লোকটা ধড়ফড় করে উঠে খক্ খক্ করে কেশেছে। তোমরা চলে যাবার পর লোকটা চাদর মুড়ি দিয়ে পুঁটলির মতন শুয়ে ঘুমোতে থাকে। বাঘটা প্রথম আসে সন্ধ্যের পর। ছাগলটা বাঘের উপস্থিতি টের পেয়ে একটু ছট্‌ফট্ করতেই লোকটা ধড়ফড় করে উঠে কাশতে সুরু করে। আর কাশির শব্দে তখনই বাঘটা সরে যায়। এইভাবে সারা রাত্রের মধ্যে তিন তিনবার বাঘটা ছাগলটার খুব কাছে আসে এবং কাশির শব্দে পালিয়ে যায়—চল তোমাদের দেখাই বাঘ ছাগলটার কত কাছে এসেছিল, একটা লাফেই ছাগলটাকে ধরতো কিন্তু আমার এমনই বরাত যে এই লোকটা আমার সব পণ্ড করে দিল।' সব শুনে আমার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হতে লাগল। আমার কথা শুনেই রেফিল্ড লোকটাকে মাচানে রাখে। যাই হোক আমরা তার সংগে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে গেলাম। সত্যিই বাঘটা কতকগুলো পাথরের আড়াল থেকে ছাগলটার খুব কাছ পর্যন্ত এসেছিল এবং লাফ দেবার জন্য সামনের পায়ে ভরও দিয়েছিল। বালিতে তার চিহ্ন দেখলাম—আর এক লাফেই সে ছাগলটার ঘাড়ে গিয়ে পড়তো। আমরা সব দেখে শুনে লোকটাকে খুব বকাবকি করলাম।

কী ভাগ্যবান চারবন্ধুই না বেরিয়েছিলাম এই শিকারে! কত

আপশোষেই না লিখে রেখেছিলাম আমার দিন ঘটনার পঞ্জিতে সেই শুভদিনের নির্ঘণ্টের কথা। বাড়ী থেকে দশ মাইল যেতে না যেতেই গাড়ীর ব্রেক ফস্‌কাল, তারপর মাইথনে ঘণ্টা দুই আড়াই তা সারাবার জন্য গলদঘর্ম ধস্তাধস্তি করেও কোন ফল হল না—সেই অবস্থাতেই চলতে হল। তারপর কুমাণ্ডির পথে লাতেহারের নদী পার হতে গিয়ে গাড়ী হ'ল বন্ধ—শেষ পর্যন্ত সবাই হাঁটু জলে নেমে গাড়ী ঠেলে নিয়ে চড়াইয়েতে উঠতে গিয়ে সকলের সারা হাতে পায়ে ব্যথা—এমন কি গাড়ীর লেজটিকেও ঠেলে তুলতে হ'ল। হায়রে—এরপর হল বনবিভাগের কর্তাদের নানা মনগড়া অভিযোগ অত্যাচার, সম্বরটাকে বাজেয়াপ্ত করার হুমকি এবং সর্বোপরি বারবার কাশির দাপটে বাঘই পালিয়ে গেল! বেচারা রেফিল্‌ডের হাতে পাওয়া একটা নিশ্চিত শিকার—তার প্রথম বাঘ মারার মহাসুযোগ গেল বিফল হয়ে! এমনি করেই পঞ্চমাঙ্ক নাটকের পঞ্চম পর্ব শেষ—এখন কি করা যায়? মনে হতে লাগল সেই পুরানো আপ্তবাক্য—"আরে বিপদ কি আর একা আসে—যখন আসে তখন তারা দল ভারী করেই আসে।"

যাই হোক কথাবার্তায় ঠিক হ'ল বাঘ যখন একবার ওই মাচান দেখেছে তখন আর ওখানে বসার কোন মানে হয় না। আবার চলল আমাদের শিকারের উদ্যোগ। আমরা নারীদান নালা থেকে দুতিন'শ গজ নেমে এসে যেখানে নালাটা ঘুরেছে সেইখানে একটা বেশ বড় ঝাঁকড়া গাছ পেলাম পাহাড়ের ঢালে, কাছে গিয়ে দেখি মূল গাছটা পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়েছে। তার ঝাঁকড়া মোটা ডালগুলো নালাটার দিকে ঝুলে মাচান বাঁধার পক্ষে খুব সুবিধে করে দিয়েছে। খালি একটা অসুবিধে যে পাহাড়ের ঢাল থেকে যদি বাঘ নামে তাহলে সে গাছের মূল গুঁড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে সোজা আমাদের মাচানের উপরে চলে আসতে পারে। কারণ গাছের মূল গুঁড়িটা পাহাড়ের ঢাল থেকে সোজা একটা পথ

করে রেখেছে। গাছের ডালপালাগুলিও মাটি থেকে ৬।৭ ফুটের বেশী হবে না। উপস্থিত যখন ওই এলাকাতে মানুষখেকো বাঘের কোন খবর নেই তখন ওই সামান্য অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা ওই গাছেই মাচান বেঁধে ফেললাম। একটা সুবিধে হল নালার উল্টোদিকে একটা ছোট শাল গাছ গজিয়েছে এবং গাছের তলাটা বেশ ফাঁকা এবং ঐ গাছটা ছাগল বাঁধার পক্ষেও খুব সুবিধাজনক হবে—আর আলাদা খুঁটো লাগবে না। মাচান বাঁধার কাজ শেষ হলে আমরা গাছের কাছে এসে নজর করলাম গাছটা থেকে ৬।৭ হাত দূরে দুপাশে বড় বড় পাথরের চাঙড় রয়েছে এবং সেই পাথরগুলো একটা গলিপথের সৃষ্টি করেছে। যদি ওই গাছে ছাগল বাঁধি, তাহলে বাঘ ওই পাথরের আড়াল থেকেই ছাগলটাকে মারবে কিন্তু যদি খুব ছোট দড়ি দিয়ে ছাগল বাঁধা যায় তাহলে বাঘের ছাগল মারার সময় ফাঁকা জায়গায় আসতেই হবে। তাই তেত্‌রা ও তার তিন সঙ্গীকে বারবার বুঝিয়ে বললাম, ছাগল বাঁধার সময় খুব সাবধান, দড়ি যত ছোট করে বাঁধতে পার তত ছোট করে বাঁধবে; দড়ি লম্বা হলেই ছাগলটা ভয়ে পাথরগুলোর আড়ালে গিয়ে বসবে। আর ছাগল যদি আড়ালে থাকে তাহলে বাঘের খুব সুবিধে হয়ে যাবে। সে অবস্থায় বাঘ ছাগল মারলে আমরা গুলি চালাতে পারবো না—পাথরগুলো আড়াল হয়ে যাবে। তেত্‌রারা জানাল তারা সব বুঝেছে। আমরা তখন রওনা দিলাম বাংলোর পথে।

বাংলোতে আমরা যখন এসে পেঁছিলাম তখন বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেছে। রেফিল্ড সারারাত মাচানে ছিল তাকে তাড়াতাড়ি চা ও জলখাবার দেবার জন্য বললাম এবং সেইসঙ্গে আমাদেরও চা দিতে বললাম। রেফিল্ড বেচারা বার বার গতরাত্রের ঘটনা বলে আফশোষ করতে লাগল। আমরা যখন চা খাচ্ছি এবং গল্প করছি তখন বুড়ো চৌকিদার একজন অল্পবয়সের ভদ্রলোককে

নিয়ে ঘরে এল। আমাদের সে বলল—'হুজুর ইনি একজন বন-বিভাগের অফিসার। ইনি এখানে কয়েকদিন থাকবেন। এঁকে আপনারা দয়া করে একটা ঘর ছেড়ে দিন।' শুনে বললাম—ঠিক আছে, আমরা সব ব্যবস্থা করছি। ভদ্রলোকটিকে বসতে দিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করে পরিচয়ে জানলাম উনি একজন সরকারী বনবিভাগীয় অফিসার এবং আপাততঃ ট্রেনিং-এ আছেন, লোকটি কথাবার্তায় খুব ভদ্র। অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের সংগে খুব ভাব হয়ে গেল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার খাবার দাবার কি ব্যবস্থা? তিনি বললেন—'চৌকিদার কিছু বানিয়ে দেবে।' শুনে আমরা বললাম—আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আপনি আমাদের সংগে খেতে পারেন—চৌকিদারের ক'দিন থেকে খুব জ্বর তাকে আমরাই ওষুধ পথ্য দিচ্ছি। সে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে তার পক্ষে রান্না করা খুব অসুবিধে। প্রসঙ্গক্রমে গতরাত্রের ঘটনা তাঁকে জানালাম এবং গত কয়েকরাত্রে আমাদের সংরক্ষিত এলাকাতে রেঞ্জার সাহেব তাঁর বন্ধুদের নিয়ে সারারাত গুলি ছুঁড়ে শিকার করেছেন সে ব্যাপারও বললাম। এমন সময় দতু এসে খবর দিল মাংস কাটা শেষ হয়ে গেছে। আমরা সকলেই বাবুর্চিখানার দিকে রওনা হলাম এবং ওই ভদ্রলোকটিকেও বললাম—'আপনি নিজে এসে একবার দেখে যান সম্বরটা নর কিনা, বিশেষ করে তার গলার কাছে ওই গলগণ্ডটা অস্বাভাবিক দেখেই আমি ওই সম্বরটাকে মেরেছি। বুড়ো চৌকিদারকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন আমরা কখন সম্বরটা মেরে ফিরেছি। আমার কথা শুনে ভদ্রলোকটি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললেন—'না না, আপনারা শুধু শুধু মিথ্যে বানিয়ে বলবেন কেন? এই ধরনের ব্যবহার, বনবিভাগের কোন পদস্থ লোকের পক্ষে করা অত্যন্ত লজ্জার কথা।' ভদ্রলোকটি সম্বরের সিং এবং গলার মাংসের থলিটা পরীক্ষা করে দেখে

বললেন—'আমি এটা রেকর্ড করে রাখব; এই ধরনের গলগণ্ড সচরাচর দেখা যায় না বলেই মনে হয়।' তেত্‌রাকে বললাম, আমাদের রান্নার জন্য অল্প মাংস রেখে বাকীটা সবার মধ্যে ভাগ করে দিতে এবং ছালটায় ভাল করে নুন মাখিয়ে রাখতে। ছাল ও সিংটার তদারকি তেতরার ওপর দিয়ে আমরা ফিরে এলাম ঘরে চান খাওয়া সারতে। সেদিন মাচানে বসার পালা আমার। কুট্‌স তখনও অসুস্থ বোধ করছেন।

আমরা ঠিক তিনটের সময় রওনা হলাম। আমাদের গাড়ী যখন নারীদান নালার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে তখন মনে হোল, দূরে একটি লোক আমাদের গাড়ীর আওয়াজ শুনে, যেন চলা বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। গাড়ী কাছে আসতেই লোকটা হাত তুলে গাড়ী থামাবার জন্য ইশারা করে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—আমরা শিকার করতে এসছি কিনা? উত্তরে বললাম, 'হ্যাঁ'। সে তখন তার হাত দুটো ঠিক মাথার ওপর সোজা করে তুলে বলল,—'সূরজ যখন আশমানের এইখানে, বেলা ১২টা কি ১টা হবে, তখন একটা বড় শের আবদুল মিঞার ১৫ সের দুধ দিত এমন একটা বড় মোষকে মেরে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেছে। হুজুর আপনারা দয়া করে ওই শেরটাকে মেরে দিন। অনেকদিন থেকে ওই শেরটা বহুত জুলুম করছে। আবদুল মিঞা এখান থেকে ২।৩ মাইলের মধ্যেই থাকে, তাকে এখানকার সকলেই চেনে। তার গরুমোষের কারবার—দুধ থেকে ঘি করে শহরে বিক্রী করে। তার প্রায় ৬০।৭০টা গরু মোষ আছে এবং সে এখানকার বেশ রইশ লোক। হুজুর আপনারা দয়া করে ওই শেরটাকে মেরে দিন।' যে লোকটি বলছিল—বেশ লম্বা, বয়স হয়েছে, সাদা পায়জামা ও কুর্তা পরা, সাদা দাড়ি এবং মাথায় একটা মুসলমানি সাদা টুপি—মনে হোল আবদুল মিঞারই লোক। সব কিছু শুনে আমাদের মন আনন্দে নেচে উঠল। বাঘের নিজের

মারা মোষ যদি হয় তাহলে বাঘ নিশ্চয়ই তার মারী খাবার লোভে আসবেই আসবে—অবশ্য যদি তার কোনরকম সন্দেহ না হয়। বাঘের কাছে ছাগলের টোপের চাইতে নিজের মারা বড় মোষ, কি বলদ, কি সম্বর, অনেক বেশী লোভনীয়। তেত্‌রাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে আবদুল মিঞার গ্রাম বা বাড়ী জানে কিনা? সে শুনে বলল—'জী হাঁ। এই তো এখান থেকে ৩।৪ মাইল হবে।' বুড়ো মুসলমানটি সংগে সংগে হাত দেখিয়ে বলল—'এই তো সাহেব, এই দিকে আপনারা গাড়ী ঘুরিয়ে চলে যান—এখন তাকে ডেরাতে পাবেন। আমি তো এখনই ওখান থেকে আসছি।' তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে রামুকে গাড়ী ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে বললাম আবদুল মিঞার ডেরার দিকে এবং অল্লক্ষণের মধ্যেই আমরা আবদুল মিঞার ডেরায় এসে পৌঁছলাম। জঙ্গলের মধ্যে একখানা বেশ বড় ঘর—ডানহাতি মস্ত বড় গরুমোষ রাখার খাটাল; সামনে অনেকগুলি খুঁটো পোঁতা আছে, গরু ও মোষ বাঁধার জন্য। সামনে অনেকগুলো বেশ বড় বড় বিচালির গাদা। আমরা গিয়ে আবদুল মিঞার খোঁজ করতেই একটি বেঁটে মতন লোক বেরিয়ে এল। লোকটির বয়স হয়েছে। তার পরিচয়ে জানলাম, সেই-ই আবদুল মিঞা। আমরা তার সংগে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আজ নাকি বেলা ১২।১টার সময় আপনার একটা বড় মোষ বাঘে মেরেছে? আমরা এখানে শিকার করতে এসেছি এবং কুমাণ্ডির বাংলোতে আছি। আপনি যদি দয়া করে আমাদের সব খবরাখবর দেন তাহলে আমরা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি বাঘটাকে মারা যায় কিনা। তিনি বললেন—'হাঁ আজ আমার একটা খুব বড় ১৫ সের দুধেল মোষকে শের মেরে নিয়ে গেছে।' কিন্তু তাঁর ভাব দেখে মনে হোল এটা একটা খুব বড় খবর নয়। যেন জঙ্গলে থাকতে হ'লে শের গরু মোষ মেরেই থাকে। তাঁকে অনুরোধ করলাম যে লোকটা গরু মোষ চরাতে গিয়েছিল তাকে

একবার ডাকবার জন্য তাহলে তার কাছ থেকে আমরা সব খবর জানতে পারব। তাঁর ডাকে একটি লোক এ'ল, তাকে আমরা সব জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। বলল, বেলা ১২টা কি ১টার সময়, সূরজ যখন ঠিক মাথার ওপর, তখন শেরটা বিদ্যুতের মতন এসে তাদের চোখের সামনে মোষটাকে মেরে নিয়ে চলে গেল। আমি বললাম—তুমি একটু আমাদের সংগে এসে জায়গাটা দেখিয়ে দাও। আবদুল মিঞা সাহেব সামনেই ছিলেন—তিনিও হুকুম দিলেন লোকটাকে। আমরা তাকে গাড়ীতে বসিয়ে রওনা হলাম। জঙ্গলের মধ্যে ২।৩ মাইল গাড়ী চালানর পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছে দেখলাম—চারদিকে গভীর জঙ্গল, তারমধ্যে ৩০০।৪০০ গজ লম্বা এবং সমান চওড়া একটা ফাঁকা মাঠের মত—ওটাই গরুমোষ চরাবার মাঠ। মাঠটার মাঝামাঝি আসতে লোকটা গাড়ী থামাতে বলল। আমরা গাড়ী থেকে নামতে লোকটা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জমিটা দেখাল—যেখানে শের প্রথম মোষটাকে মারে। জমি পরীক্ষা করে দেখলাম বাঘ যখন মোষটার ঘাড় কামড়ে মাটিতে ফেলেছিল তখনকার মোষ ও বাঘের ধ্বস্তাধ্বস্তির সব চিহ্ন বর্তমান এবং বেশ কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ আছে। তারপরেই বাঘ সেই ভারী মোষটাকে মাঠের মাঝখান থেকে টেনে ঘসড়াতে ঘসড়াতে জঙ্গলে নিয়ে গেছে—সেখান থেকে জঙ্গল কমপক্ষে প্রায় এক'শ গজ দূরে। যখন এই সব পরীক্ষাতে ব্যস্ত তখন দিনের আলো প্রায় ডুবুডুবু। আমরা টানার দাগ (ড্র্যাগ মার্ক) ধরে এগুতে লাগলাম। খোলা জায়গা পেরিয়ে খুব সাবধানে ক্রমশঃ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দেখি বাঘটা মোষটাকে একটা নালার মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। নালাটার দু'ধারে ঘন জংলী কুল কাঁটার ঝোপ দুধার থেকে এসে নালাটাকে ঘিরে একটা সুড়ঙ্গ পথের মতন সৃষ্টি করেছে। নালাটা বেশ চওড়া, এক এক জায়গাতে ৮।১০ হাত আর প্রায় ৩।৪ হাত

গভীর। আমরা গুঁড়ি মেরে কাঁটা বাঁচিয়ে খুব সাবধানে নালা দিয়ে এগুতে লাগলাম। খানিকটা এগুবার পর মনে হোল যেন একটা জানোয়ার আমাদের সাড়া পেয়ে নিঃশব্দে সরে গেল! আরেকটু যেতেই নালাটার একটা বাঁকের মুখে মোষটাকে পেয়ে গেলাম। একটা বিরাট দুধওয়ালা মোষ—নধর কান্তি, গা চক্‌চক্ করছে। এমন তার নিটোল গড়ন যে গায়ে মাছি বসলে যেন পিছলে যাবে। মোষটাকে দেখে খুবই দুঃখ হল। আমরা খুব সাবধানে টর্চ জ্বেলে তার মুখে রুমাল চেপে দেখতে লাগলাম—দেখি বিরাট ঐ মোষটার ঘাড়ে বাঘের চারটে দাঁত বসানর গভীর চিহ্ন—যার এক একটার মধ্যে আমাদের হাতের বুড়ো আঙ্গুল অনায়াসে ঢুকে যাবে! নালাটার মধ্যে বালি এবং ধুলো মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আমাদের সকলের চক্ষু ছানাবড়া—এতবড় বাঘের পায়ের ছাপ সচরাচর দেখা যায় না। মারীটা যে একটা বিরাট বড় মদ্দা বাঘের তা পায়ের ছাপ দেখে স্পষ্টই মনে হোল। কিন্তু তখন কিছু করার নেই আমি খুব নিচু গলাতে সকলকে বললাম—এখন আমাদের খুব সাবধানে এখান থেকে সরে পড়াই ভাল। এই অন্ধকারে আমরা কিছুই করতে পারবো না। কাল সকালে আটটার পর এখানে আসা যাবে। আজ রাত্রে বাঘটা যতটা মারী খেতে পারে খাক—কাল সকালে এসে দেখে শুনে মাচান বাঁধা যাবে। সকলে রাজী হওয়াতে আমরা খুব সাবধানে গুঁড়ি মেরে নালা থেকে যখন বেরিয়ে এসেছি তখন সন্ধ্যে ৭টা। গাড়ী ছাড়বার আগে কুট্‌স আমায় জিজ্ঞেস করলেন—'বাংলোতে ফিরে যাবে না অন্য কিছু করবে? আমিও ঠিক ওই কথাই ভাবছিলাম—বাংলোতে ফিরে যাবো না মাচানে বসবো। ওদিকে মাচান তো নারীদান নালাতে বাঁধাই আছে। হঠাৎ মন ঠিক করে ফেললাম; বললাম—আমার জন্য মাচান যখন বাঁধাই আছে তখন আজ রাতটা মাচানেই কাটাই।' শিকারে এ'সে বাংলোতে শুয়ে রাত কাটিয়ে লাভ কি?

তখন গাড়ী ঘোরান হোল নারীদান নালার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মাচান থেকে প্রায় এক মাইলের মধ্যে গাড়ী থামালাম। কুট্স আগেই বললেন—'আমি আর এই অন্ধকারে মাচান পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবো না। আমার শরীরটা ভাল নেই। আমি গাড়ীতে ছাগল পাহারাতে থাকলাম।' রেফিল্ড বলল, সে আমাকে মাচান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমি শুনে বললাম—কারুরই আসার দরকার নেই—আমি একাই মাচানে চলে যেতে পারবো—খানিক পরে তেত্রা যেন ছাগলটাকে নিয়ে এসে খুব ছোট দড়ি দিয়ে গাছের সংগে বেঁধে দিয়ে যায়। রেফিল্ড বলল—'না না, আমি তোমাকে মাচানে পৌঁছাব চল।' শেষ পর্যন্ত আমরা দুই বন্ধু, তেত্রা ও তার দুই সংগী, এই ক'জনে মিলে অন্ধকারে খুব সাবধানে মাচানের দিকে এগুতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাচানের কাছে পৌঁছে আমি রেফিল্ডের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খুব নিচু গলায় বললাম—তুমি আমার রাইফেলটা ধর—আমি মাচানে উঠলে আমাকে দিও। তখন রেফিল্ড খুব মিনতি করে আমাকে বলল—'তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে আমি আজ রাত্রে তোমার সংগে মাচানে বসি।' শুনে বললাম—আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু তুমি কাল সারারাত জেগেছো আবার আজও কি সারারাত জাগতে পারবে? সে শুনে বললো—'খুব পারবো।' আমি বললাম বেশ, তাহলে তুমি আগে মাচানে ওঠ, তোমার রাইফেল আমাকে দাও। আমার সম্মতি জেনে সে খুব আনন্দে মাচানে উঠে পড়ল এবং হাত বাড়িয়ে আমার ও তার রাইফেল নিল। তেত্রাকে বললাম—সাহেব আজ রাত্রে আমার সংগে মাচানে বসবে। তোমরা খুব সাবধানে ছাগল নিয়ে এসে ছোট্ট দড়ি দিয়ে ওই গাছে বাঁধবে। আমার কথা শুনে তেত্রার মুখ শুকিয়ে গেল। বলল—'সাহেব বিনা হাতিয়ারে আমরা কি করে গাড়ী পর্যন্ত যাব?—আবার

ছাগলটাকে নিয়ে এসে বাঁধব এবং ফিরে যাব?' শুনে আমার খুব রাগ হোল। তাকে নিচু গলায় যতখানি রাগ দেখান যায় সেইভাবে ধমকে বললাম—তোমাদের লজ্জা করে না? তোমরা না জঙ্গলে থাক? এইটুকু পথ তোমরা ৩।৪ জনে যাতায়াত করতে পারবে না? কিসের ভয় তোমাদের? যাও আর সময় নষ্ট করো না। এমনিতেই মাচানে বসার পক্ষে অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে মাচানে উঠে গেলাম এবং ওরা আমাকে মাচানে উঠতে দেখে অন্ধকারে ছায়ার মতন মিলিয়ে গেল।

সারারাত হাঁটু মুড়ে মাচানে রোলার ওপর বসে থাকা যে কি কষ্ট তা যে একবার মাচানে বসেছে সেই-ই জানে। তাই বহুকাল আগে দু'টি ভাঁজ করা পোর্টেবল মাচান আমি বানিয়েছিলাম, একটাতে দু'জন ও আরেকটাতে একজন বসার জন্য। খুব হাল্‌কা পাইপ ও জাল দিয়ে বানান এবং ঐ মাচান খুব অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটা রোলার ওপর বাঁধা যায়। আরেকটা সুবিধে, এতে হাঁটুমুড়ে বসতে হয় না এবং পিঠে হেলান দিয়ে বসা যায়। বসার জন্য ডানলোপিলোর গদিও আছে। এবারকার যাত্রায় আমি এনেছিলাম দুজনে বসার মত মাচানটা। মাচানে বসেই আমাদের রাইফেলের সংগে টর্চ বাতি জুড়ে দিলাম। সেদিন বাংলো থেকে বেরুবার সময় কি মনে করে জানিনা ·৪৫০ বোরের ভারী রাইফেলটা নিয়ে এসেছিলাম সেটা ১৪ পাউণ্ডের ওপর ভারী এবং ওটা হাতী ও গণ্ডার মারাব উপযোগী। এর আগে এই ভারী রাইফেল নিয়ে আমি কখনও মাচানে বসিনি যদিও রাত্রে ব্যবহার করার জন্য এতেও টর্চ্চ লাগাবার ব্যবস্থা করা ছিল। আমাদের দুজনের টর্চ্চ লাগানো হয়ে গেলে পর, টর্চ্চের মুখে মোটা করে রুমাল চাপা দিয়ে জ্বেলে দেখলাম ঠিক জ্বলছে কিনা। ইত্যবসরে তেত্‌রা কখন অন্ধকারে ছাগল বেঁধে দিয়ে গেছে, আমরা টের পাইনি। হঠাৎ ছাগলটা ম্যা ম্যা করাতে একটু গলার ঘণ্টার শব্দ

হওয়ায় বুঝলাম ছাগলটা বাঁধা হয়েছে। ঘন অন্ধকারে অনেকক্ষণ গাছটার নীচের দিকে তাকিয়ে থাকার পর, কালো ছায়ারমতন কি যেন একটা নড়ছে বলে মনে হোল। অন্ধকারের মধ্যে ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না ছাগলটা ঠিক কতদূরে বাঁধা হয়েছে এবং দড়িটাকে ছোট করবে বেঁধেছে কিনা। ছাগলটা প্রথমেই যা দুএকবার ম্যা ম্যা করছিল, তারপর আর কোন সাড়া শব্দ করেনি। আমরা দুজনে সামনের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতন বসে থাকলাম। আশপাশের সমস্ত জঙ্গল খুবই নিস্তব্ধ হয়ে আছে একটা গাছের পাতাও নড়ছে না, আর এমনি নিস্তব্ধ যে গাছের একটা পাতা পড়লেও শোনা যায়। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা খানেক বসে থাকার পর হঠাৎ একটা যেন ভারী জিনিষ খুব জোরে মাটিতে ধপাস করে আছড়ে পড়ার মতন আওয়াজে আমরা দুজনে চমকে উঠলাম! সংগে সংগে রেফিল্ড আমার হাতটা শক্ত করে ধরে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল—'বাঘ—বাঘ ছাগলটাকে ধরেছে।' আমি সংগে সংগে হাত চাপা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিলাম। সাংঘাতিক উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যে কে যেন হাজার হাতুড়ী এক সংগে মারতে লাগল। আমাদের দেশের খুব নামকরা বাঘ প্রধান জঙ্গলে বহুরাত আমি মাচানে কাটিয়েছি—কিন্তু বাঘের দেখা পাইনি। এই বুঝি প্রথম বাঘের সাক্ষাৎ পেতে চলেছি! রেফিল্ডও খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে! কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগল—'তাড়াতাড়ি বাতি ফেল, না হলে বাঘ ছাগলটাকে মুখে নিয়ে চলে যাবে।' রেফিল্ড বাতি ফেলার কথা বলতেই আমি যেন প্রায় ঘাবড়ে গিয়ে টর্চ্চের সুইচের বোতামটা টিপলাম। অন্ধকারে রাইফেলটা আন্দাজে ছাগলটার দিকে রাখায় আমার দু'সেলের শিকার টর্চ্চের বাতি জমাট অন্ধকার ভেদ করে নালার অপরপাড়ে যেখানে ছাগলটা থাকার কথা, সেখানে গিয়ে আছড়ে পড়ল। কিন্তু কই কোথায় বাঘ? আর ছাগলটাই বা

কোথায়? সামনে তো কিছুই নেই! প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। টর্চ্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নালার অপর পাড়টা ভাল করে দেখতে দেখতে নালার পাড়ে প্রত্যেকটা জিনিষ আমার নজরে পড়ল। বড় থেকে ছোট ছোট পাথরের চাঙ্‌ড় যেখানে যা ছিল সবই দেখতে পেলাম—কিন্তু অবাক কাণ্ড, বাঘ আর ছাগলের দেখা নেই! এইভাবে রাইফেল সমেত বাতি কয়েকবার এপাশ ওপাশ করতে করতে হঠাৎ দুটো বড় পাথরের মধ্যে বিরাট এক বাঘের চোখ দু'টো জ্বল জ্বল করে উঠল। আমি তখন বাতিটা সোজা বাঘটার চোখের ওপর ফেলে রাখলাম। বড় পাথরের চাঙড়দুটোর মাঝখানে জ্বল জ্বল করা দুটো চোখ ছাড়া আমি তখন বাঘের শরীরের আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সংগে সংগে বুঝতে পারলাম বাঘ ছাগলের ঘাড় কামড়ে মাটির সংগে চেপে বসে আছে এবং তার জ্বলজ্বলে চোখ দুটো আমার টর্চ্চ বাতির দিকে রয়েছে; এরপর সে যে কোনও মুহূর্তে ছাগলটাকে মুখে করে পাথরের চাঙড়গুলোর আড়াল দিয়ে চলে যাবে—আর আমি বোকার মত বসে থাকব। আমি যতই কিছু করতে পারছিনা ততই ঘাবড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ মনে হোল মুহূর্ত মধ্যে কিছু করতে না পারলে বাঘ ছাগলটাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। এই কথা মনে হওয়া মাত্রই আমি ঠিক করলাম দুই চোখের মাঝখানে গুলি করবো—সংগে সংগে আমি দু'চোখের মাঝখানে নিশানা নিয়ে গুলি চালালাম। আমার '৪৫০ বোরের দোনলা রাইফেল সমস্ত পাহাড় ও জঙ্গল কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল। আমার গুলি বাঘের মাথার ২।৩ ইঞ্চি ওপরে দিয়ে গিয়ে সামনের পাহাড়ের গায়ে লেগে একটা মস্ত চাঙড় খসিয়ে ফেলল। আর অল্প বয়সের জোয়ান বাঘটা সম্ভবতঃ তার জীবনে প্রথম, মাথার খুলির এত কাছ দিয়ে গুলি যাওয়াতে, ভীষণ ভয় পেয়ে, কুঁই কুঁই কাব আওয়াজ করতে করতে তীরের মতন ছুটে আমাদের মাচানের তলা দিয়ে পাহাড়ের

ঢাল বেয়ে উধাও হয়ে গেল। আমি সংগে সংগে আমার নিজের ভুল বুঝে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। নিজের ভুলের ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝলাম কি হয়েছে, সে কথা পরে বলছি। যে গাছে আমাদের ছাগল বাঁধার কথা ছিল তেত্‌রা ভয়ে অন্ধকারে সে গাছ পর্যন্ত না গিয়ে পাথরগুলোর কাছে যে অন্য একটা গাছ ছিল সেইটাতে কোনরকমে ছাগলটাকে বেঁধে পালিয়েছে এবং ভয়ে তাড়াতাড়িতে দড়ি ছোট করে বাঁধার কথা তার নিশ্চয়ই মনে ছিল না। ছাগলটা লম্বা দড়ি পেয়ে ভয়ে পাথরগুলোর আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল, ফলে পাথরগুলোর আড়ালে ছাগলটাকে মারতে বাঘের খুব সুবিধে হয়েছে।

ওদিকে মাচানের তলা দিয়ে বাঘটাকে পাহাড়ের ঢালে উঠে যেতে দেখে রেফিল্ড ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিল। একেই মাচানটা ছিল খুব নীচুতে তার ওপর গাছটা পাহাড়ের ঢাল থেকে এমনভাবে হেলে নালার দিকে ঝুলেছিল যেন পাহাড় থেকে একটা সোজা পথ একেবারে মাচানে চলে এসেছে। রেফিল্ড যতবার পেছনের পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছিল ততবারই সে যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ছিল। অল্পক্ষণ পরে সে আর থাকতে না পেরে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলল—'বাঘটা জখম হয়েছে তাই কুঁই কুঁই করে আওয়াজ করতে করতে পাহাড়ের ঢালে উঠে গেল। গুলি খাওয়া বাঘ যদি প্রতিশোধ নেবার জন্য অন্ধকারে পাহাড়ের ঢাল থেকে নেমে আমাদের মাচানে এসে আমাদের দুজনের ঘাড় মটকে দেয় তাহলে কি হবে!' তখন আমার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়—বাঘের সন্ধানে বছরের পর বছর নানান দেশ আর জঙ্গল ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর যখন জীবনে এই প্রথম বাঘের দেখা পেলাম তখন কিনা নিজের সামান্য ভুলের জন্য বাঘটাকে মারতে পারলাম না। আফশোষে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছিল! রেফিল্ডকে

বললাম—বাঘের গায়ে গুলি লাগেনি; বাঘ অক্ষত শরীরে ভয়ে আমাদের মাচানের নিচে দিয়ে দৌড়ে পাহাড়ে উঠে জঙ্গলে মিলিয়ে গেছে। রেফিল্ড বলল—'আমি নিজে দেখলাম বাঘটা কুঁই কুঁই করে আওয়াজ করতে করতে মাচানের নিচে দিয়ে যাচ্ছে—তার পিঠ ও মাথা আমাদের গাছের ডালপালার সংগে লেগে যায় আর কি! ওটা নিশ্চয়ই জখম হয়েছে। এখন আমার খালি ভয় করছে বাঘটা যদি প্রতিশোধ নেবার জন্য মাচানে চলে আসে তাহলে কি হবে! তোমার হাতের নিশানা আমার জানা আছে—তোমার গুলি লাগবে না এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।' শুনে বললাম—শুধু নিজের ভুলের জন্য, বহু বছর পর প্রথম বাঘের দেখা পেয়েও আমি মারতে পারলুম না। ভুলটা অতি সামান্য, কিন্তু দেখ, বছরের পর বছর জঙ্গলে ঘুরে বহুরাত মাচানে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত এই সামান্য ভুলের জন্য বাঘটাকে হারালাম। আমি কি ভুল করেছি যদি তুমি শোন তাহলে তুমিও আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। এতবছর ধরে এত বন্দুক রাইফেল চালাবার পর মানুষে যে এই ধরনের ভুল করতে পারে তা ধারনার অতীত। জান আমি কি ভুল করেছি? শুনলে তুমি হাসবে। আমি যে আজ '৪৫০ দোনলা রাইফেলটা নিয়ে এসেছি সে কথা উত্তেজনায় আমার মনেই ছিল না। ছাগল মারার আওয়াজ পেয়ে যখন আমি বাতি ফেললাম তখন প্রথমে বাঘ বা ছাগল কিছুই দেখতে পাইনি। কিন্তু পরক্ষণেই দুটো বড় বড় পাথরের মাঝে দেখলাম জ্বল জ্বল করে উঠা বাঘের চোখ দুটো, দেখে মনে হোল এক্ষুনি বাঘটা পাথরগুলোর আড়াল দিয়ে ছাগলটাকে নিয়ে পালাবে। যেই একথা ভাবা, অমনি আমি গুলি চালাই; কিন্তু নিশানা নেবার সময় সামনের 'মাছি' পেছনের 'সাইটের' সংগে না মিলিয়েই, বাঘের দু'চোখের মাঝখান লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছি। আমি

স্পষ্ট দেখলাম বাঘের মাথার ২।৩ ইঞ্চি ওপর দিয়ে গুলি চলে গেল। গুলিটা গিয়ে ওপাশের পাহাড়ের গায়ে লেগে একটা মস্ত বড় চাঙড় খসিয়ে ফেলেছে। বাঘটার কপালের এত কাছ দিয়ে গুলি গেছে যে সে বেচারা ভীষণ ভয় পেয়ে—এত ভয় সে জীবনে কখনও পেয়েছে বলে মনে হয় না—ভয়ের চোটে এ ত্রিসীমানা ছেড়ে পালিয়েছে। তোমার কোন ভয় নেই—তুমি সারারাত নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে পার। পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলাম, রাত মাত্র ন'টা বেজেছে—আর সকাল আটটার আগে আমাদের গাড়ী আসবে না। গাড়ীটা কাছাকাছি থাকলে না হয় নেমে গিয়ে বাংলোতে ফিরে সারারাত আরাম করে ঘুমাতে পারতাম। এখানে আজ সারারাত আর কোনও জন্তু জানোয়ার আসবে বলে মনে হয় না। তার কারণ এতক্ষণ ধরে বাতি জ্বালান হয়েছে তার ওপরে গুলিও চালান হয়েছে। আমার এত কথা বলার পরেও রেফিল্ডের ভয় কিছু কমল বলে মনে হোল না। সে সারারাত ধরে ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে কেবল বার বার পাহাড়ের ঢালের দিকে তাকাতে লাগল। আমার অবস্থা ত বুঝতেই পারছেন—সারারাত নিজের ওপর ভীষণ রাগ হতে লাগল। আমার সাময়িক উত্তেজনাই আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে—তা না হলে আমি হলপ করে বলতে পারি আমি কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতাম না। বহুকাল রাইফেল আর বন্দুক চালিয়ে নিজের হাতের ওপর একটা আস্থা জন্মেছে—আমি যদি সেই মুহূর্তে উত্তেজিত না হতাম তাহলে বাঘের দুই চোখের মাঝখানে আমি গুলি বিঁধিয়ে দিতে পারতাম। ওটা আমার পক্ষে মোটেই শক্ত ব্যাপার ছিল না। আমি বহুবার লক্ষ্য করে দেখেছি আমি যেখানে নিশানা নিয়ে গুলি চালিয়েছি তার এক চুলও এদিক ওদিক হয়নি। অথচ বহুকাল পরে যখন প্রথম বাঘের দেখা পেলাম, তখন দেখলাম, আমার সকল সাধনাই ব্যর্থ হয়ে গেল—আমি নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিলাম না।

নিজের ভুল ত্রুটির বিচার করতে করতে রাত কেটে গেল।

সকাল সাতটা নাগাদ হুজনে মাচান থেকে নামলাম। রেফিল্ডকে বললাম—চল তোমাকে দেখাই আমার গুলি কোনখানে গিয়ে লেগেছে। দেখলেই বুঝবে, গতরাত্রের আমার নিশানার সামান্য ভুলের জন্য বাঘের মাথার কত কাছ দিয়ে গুলিটা চলে গেছে। যদি ঘাবড়ে না গিয়ে রাইফেলের পেছনের 'সইটের' সংগে সামনের মাছিটা মিলিয়ে গুলি চালাতাম তাহলে বাঘের মাথাটা ডিমের মত ফেটে যেত। যদিও সব অভিজ্ঞ শিকারী বাঘের মাথাতে গুলি চালাতে মানা করেন কারণ বাঘের কপালের মসৃণ ঢালে গুলি চালালে প্রায়ই দেখা গেছে গুলি পিছলে যাবার সম্ভাবনা থাকে; সেকথা মুহূর্তের জন্য গতরাত্রে আমার মনেও হয়েছিল কিন্তু আমি ভাবলাম আমার এই ভারী রাইফেলের গুলিতে সে ভয় করার দরকার হবে না। আমার প্রথম ভুল পেছনের 'সাইটের' সংগে সামনের মাছি না মিলিয়ে গুলি ছোড়া। দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল, বাঘ যখন মারী কামড়ে মাটির সংগে মিলিয়ে বসে থাকে তখন গুলি চালাতে নেই। তার কারণ সেই অবস্থাতে বাঘকে গুলি করার সব মোক্ষম জায়গাগুলো মারীর সংগে জড়িয়ে এমন আড়াল হয়ে থাকে যে একটাও সঠিক জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অবস্থাতে গুলি চালালেই হয় গুলি মারীতে লেগে ঘুরে যেতে পারে নয়তো বাঘের লাগলেও বাঘ জখম হয়ে পালিয়ে যেতে পারে। তাই সব অভিজ্ঞ শিকারী এই অবস্থাতে গুলি করতে মানা করেন। বাঘ যখন বোঝে যে তার মারীর আর কোন প্রাণের স্পন্দন নেই তখন সে বীরদর্পে তার বজ্রকামড় ছেড়ে দাঁড়ায় এবং দাঁড়িয়ে সে জঙ্গলের সব আশপাশ পরীক্ষা করে দেখে যে সন্দেহ করার মতন আর কিছু আছে কি না। এই উঠে দাঁড়াবার সময় শিকারীদের প্রশস্ত সময়। সেই মুহূর্তেই শিকারীদের বাঘের মোক্ষম জায়গাতে লক্ষ্য স্থির করে গুলি চালান উচিত। এ সব আমার বহুদিন ধরে জানা—কিন্তু মুহূর্তের উত্তেজনাতে আমি সব বানচাল করে ফেললাম।

যাক্ আমার বোধ হয় এ শিক্ষা পাওয়া উচিত ছিল। তুমি দেখে নিও এই ধরনের ভুল আমি জীবনে করবো না। কথায় কথায় দুজনে নালার ওপারে গিয়ে সমস্ত জায়গাটা ভাল করে দেখলাম এবং আমি যা যা বলেছিলাম তা সম্পূর্ণ মিলে যেতে রেফিল্ডের বিশ্বাস হোল যে আমার গুলি বাঘের মাথার খুব কাছ দিয়ে গেছে এবং বাঘটি অক্ষত শরীরে জঙ্গলে পালিয়েছে। ঠিক আটটার সময় আমাদের গাড়ী কুট্‌স ও তেত্‌রাদের নিয়ে হাজির হোল। কুট্‌স ছাগল বাঁধার জায়গাটায় এসে মরা ছাগলটার দিকে তাকিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন— 'ব্যাপার কি ?' আমি তখন গতরাত্রের লজ্জাকর ঘটনাটা সব তাঁকে বললাম। তিনি সব শুনে আমার উপর ভীষণ রাগ করতে লাগলেন এবং বার বার শোনাতে লাগলেন—'কাবীরচবুত্রার শিকারে আমার প্রাণ বাঁচানর ঋণ পরিশোধ করার জন্য আমি দাঁড়িয়ে থেকে তোমার জন্য ভাল করে মাচান বাঁধালাম কারণ জানতুমই বাঘ আসবে, আর তুমি কিনা আনাড়ীর মতন গুলি চালিয়ে দিলে। ছি, ছি, ছি,— আমার সব শ্রম কষ্ট ব্যর্থ হয়ে গেল।' আমি মাথা হেঁট করে বকুনি শুনতে লাগলাম। নিজের লজ্জায় নিজে তো মরছিই তার উপর আবার এসব উপরি পাওনা। যাই হোক, অনেকক্ষণ বকাবকি করার পর তিনি কিছুটা ঠাণ্ডা হলেন। বললেন—'চল, আর এখানে বোকার মতন দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে ? গতরাত্রের মোষটার কি হোল দেখা যাক। এখানে যা হ'বার তা'ত হয়েই গেছে'—এখন একমাত্র ভরসা আবদুল মিঞার মোষ। আমরা সকলে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠলে রামু খুব জোর গাড়ী হাঁকিয়ে সেই মোষমারা খোলা জায়গাটার কাছে গিয়ে থামালো। আমরা সকলে খুব সাবধানে নালার মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগলাম। গিয়ে দেখি গত সন্ধ্যেতে মারীটা যেখানে দেখেছিলাম সেখানে নেই এবং নালাতে একজোড়া বড় বাঘের পায়ের দাগ—নর ও মাদীন। বিশেষ করে বাঘটার পায়ের ছাপ খুবই বড়—এত বড় বাঘের পায়ের ছাপ আমি আর আগে

দেখিনি। যদিও বালিতে পায়ের ছাপ একটু বড়ই দেখায়। বাঘিনীর পায়ের ছাপও যথেষ্ট বড়। আমরা বাঘ ও বাঘিনীর পায়ের ছাপ ধরে খুব সাবধানে হেঁট হয়ে এগুতে লাগলাম আশপাশের কুল কাঁটা থেকে নিজেদের কোনরকমে বাঁচিয়ে। এইভাবে ৩০।৪০ গজ এগুতেই মারীটাকে পেয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি এক রাত্তিরেই অতবড় মোষটার অর্ধেকটা খেয়ে গেছে! পেছনের দিক থেকে খেতে খেতে প্রায় পাঁজরার হাড় পর্যন্ত পেঁীছে গেছে। মারীটা নালার বাঁকের মুখের কাছে রয়েছে—আর নালাটা ডানহাতি ঘুরে গেছে। মোষটার মাথা ও ঘাড়ের কাছাকাছি নালার ডানধারে নিচে থেকে একটা জংলী খেজুরের গাছ গজিয়েছে। গাছটা ৩।৪ হাত লম্বা হবে। আমি সব পরীক্ষা করে দেখে রামুকে বললাম—তুমি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে আমার তারের দড়িটা নিয়ে এস। মারীটাকে এই ছোট খেজুর গাছটার সংগে বাঁধতে হবে—তা না হলে বাঘ অন্ধকারে এসে একটানে মারীটাকে নালার বাঁকে নিয়ে চলে যাবে। কারণ নালাটা ওই জায়গায় এমনভাবে বেঁকে গেছে যে মারীটা একটু টেনে নিয়ে গেলেই নালার আড়াল হয়ে যাবে। মারীটাকে এখানে বাঁধার খুবই দরকার। এতক্ষণ কুট্‌স খুব বিজ্ঞের মত জায়গাটা পরীক্ষা করছিলেন। আমি রামুকে দড়ি আনার কথা বলতেই তিনি খুব জোরে মাথা নেড়ে বললেন—'খবরদার মারীকে ছুঁয়ো না। দেখছ না বাঘ আর বাঘিনী দুজনে মিলে মারীটাকে খেয়েছে—এখানে কিছু একটা করতে গেলেই তাদের দুজনের মধ্যে কারুর না কারুর নজরে পড়ে যাবে। তখন তারা কর্পূরের মতন উপে যাবে। মারী বাঁধা হবে না শুনে আমি তাঁকে বোঝালাম প্রত্যেক অভিজ্ঞ শিকারী লিখেছেন মারীকে বাঁধা একান্তই জরুরী। যে জায়গাতে বাঘ একবার মারী খেয়ে গেছে, সে কখনও আর সে জায়গাতে মারী খায় না। অতি অবশ্যই আরেকটা পরিষ্কার জায়গাতে মারীটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে খেয়ে থাকে। এই নিয়ে

আমাদের মধ্যে ,বেশ একটু তর্ক বিতর্ক হতে লাগল। এমন কি আমাদের ড্রাইভার রামু পর্যন্ত বলতে লাগল, সাহেব মারী বাঁধা উচিত—তা না হলে বাঘ কখন অন্ধকারে মারী টেনে নিয়ে যাবে শিকারী তার কিছুই বুঝতে পারবে না। এই কথা শুনে কুট্‌স রামুকে এক ধমক মারলেন এবং বললেন—'তুমি শিকারের কি বোঝ যে কথা বলতে এসেছ ?' তিনি জোর করে বলতে লাগলেন—'তোমরা কেউ আজ পর্যন্ত বাঘ মারনি ; আমি যা বলছি শোন। আমার অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে। তোমাদের আমি কখনও খারাপ উপদেশ দেব না। আমি ভালর জন্যই বলছি—মারীকে ছুঁয়ো না।' আমি আবার বললাম—অন্ধকারে কি করে বুঝবো বাঘ কখন আসছে ? আর নালাটা এখানে এমনভাবে ঘুরেছে যে মারীটা একটু টানলেই নালার আড়াল হয়ে যাবে। শুনে কুট্‌স বললেন—'ওই টানের মুহূর্তে তুমি যদি বাঘ মারতে না পার তাহলে আর তোমার বরাতে বাঘ মারা নেই বুঝতে হবে।' আমি আর তর্ক না করে বললাম—ঠিক আছে এখন মাচান কোথায় বাঁধা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা সমস্ত জায়গাটা লক্ষ্য করে দেখলাম, নালার ধারে কাছে কোথাও একটা বড় গাছ নেই যাতে আমরা মাচান বাঁধতে পারি। দূরে আশপাশে অনেক বড় বড় গাছ আছে কিন্তু সেখান থেকে মারী দেখা যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মারী থেকে ২০।২৫ হাত দূরে নালার বাঁহাতি পাড়ের উপর একটা ছোট শালগাছ নজরে পড়ল। তার ঘন ডালপালাগুলো আমার মাথা পর্যন্ত উঠেই শেষ হয়ে গেছে, গাছটার গোড়াটা ২।৩ ইঞ্চির বেশী মোটা হবে না। বললাম—এই গাছটার আড়ালে ৪টে রোলা পুঁতে একটা ছোট নীচু মাচান করা যাক্। সকলেই বলে উঠল—'এখানে মাচান বাঁধলে খুব নীচু মাচান হবে—মাটি থেকে ৪।৫ ফুটের বেশী হবে না, এত নীচু মাচান থেকে এক জোড়া বাঘের চোখে ধুলো দেওয়া খুবই শক্ত। তাছাড়া বিপদে পড়ারও সম্ভাবনা আছে।' উত্তরে বলতে হল—

উপায় কি? এ ছাড়া তো অন্য গাছ কোথাও পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত ওই শালগাছটাকে ভরসা করে মাচান বাঁধাই সাব্যস্ত হোল। তেত্রাকে দূর থেকে চারটে রোলা এনে, একটা রোলা গাছটার পাশেই, আর বাকী তিনটে কাছাকাছি পুঁতে তাড়াতাড়ি একটা ছোট মাচান বাঁধতে বললাম। এমন সময় রেফিল্ড বলে উঠল—'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। দু'রাত মাচানে জেগে আর ঠায় বসে থেকে আমি বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তেত্রারা মাচান বাঁধুক, চল আমরা বাংলোয় ফিরে যাই। ওরা দু'দুবার মাচান বেঁধেছে—এ মাচানটাও ওরা ঠিক মত বাঁধতে পারবে। পরে রামু এসে ওদের নিয়ে যাবে।' মারীটাকে বাঁধতে না দেওয়ার জন্য আমার মন এমনিতেই খারাপ হয়েছিল। মনে মনে ভাবলাম, যা হবার হবে, তেত্রাই মাচান বাঁধুক। আমি যাবার আগে তেত্রাকে বলে গেলাম—মাচান খুব নীচু হবে—আর সেগুনগাছের বড় বড় পাতা দিয়ে চার পাশের পর্দা খুব ভাল করে এমনভাবে লাগাবে যাতে বাঘ বা বাঘিনী আমাকে দেখতে না পায়। মারীর দিকে একটা ফাঁক, যাতে বন্দুক চালাতে অসুবিধা না হয় এবং সামনে আর ডানহাতি দুটো ফাঁক রেখ, যাতে দরকার পড়লে সেই দুটোও ব্যবহার করা যায়। সে শুনে বলল—'ঠিক আছে সাহেব, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি খুব ভাল করে মাচান বাঁধব, আপনার কোনও অসুবিধা হবে না।' আমি আবার তাকে বললাম—এখানে কোন রকম আওয়াজ করবে না আর অনেক দূর থেকে মাচানের জন্য রোলা ও পাতা কেটে আনবে। আমরা বাংলোয় ফিরে যাচ্ছি, কিছুক্ষণ পরে গাড়ী পাঠিয়ে দেব তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য। আমরা খুব সাবধানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

বাংলোয় ফিরে এসে দতুকে চা ও খাবার দেবার কথা বলে হাতমুখ ধুয়ে চায়ের টেবিলে বসে ক্লুটসের অনেক বক্তৃতা শুনলাম কেন গতরাত্রে বাঘ পেয়েও আমি মারতে পারিনি। আজ আবার

সেই চেষ্টা—আজও যদি না মারতে পারি তাহলে আমার বাঘ শিকার ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই সব নানা কথার ফাঁকে আমি তাঁকে বললাম—মারীটাকে কিন্তু আমাদের বাঁধা উচিত ছিল। প্রত্যেক অভিজ্ঞ শিকারী তাঁদের বইএ লিখে গেছেন যে, বাঘের স্বভাবই হোল সে বাসি মারী টেনে পরিষ্কার জায়গায় নিয়ে গিয়ে মারী খায়। কারণ বাসি মারীর উপর নানারকম পোকামাকড়, পিঁপড়ে লাগে। তাছাড়া মারীর পেট ফেঁড়ে তার মলমূত্র বের করে দেওয়াতে জায়গাটা বেশ নোংরা হয়ে যায়; অপরিষ্কার নোংরা মারী বাঘ খেতে চায় না।

রেফিল্ডও বলে উঠল—'আমারও মনে হয় মারী বাঁধা একান্তই দরকার।' শুনে কুট্স খুব জোরে মাথা নেড়ে বলে উঠলেন—'না-না-না। তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউই এখনও বাঘ শিকার করনি। আমি যা বলছি শোন—তোমাদের ভালর জন্যই বলছি।' আমি আর এ বিষয়ে তর্ক না করে চুপ করে গেলাম। চা খাওয়া শেষ হলে রামুর খোঁজে বাবুর্চিখানার দিকে গিয়ে শুনলাম রামু চা ও খাবার খেয়ে তেত্‌রাদের আনতে গেছে।

বেলা সাড়ে বারোটার সময় আমাদের খাবার ডাক পড়ল। আমরা খাওয়া প্রায় শেষ করে এনেছি এমন সময় তেত্‌রা ফিরে এসে জানাল, মাচান বাঁধা হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—যেমনভাবে তাকে মাচান বাঁধতে বলেছিলাম, সেইভাবে বেঁধেছে। সে বলল—'লেকিন আপকো মাচান পর বহুত জলদী বৈঠনা হ্যায়। জায়গা বহুত সন্নাটা (নির্জন) হ্যায়। শের মারীপর বহুত জলদী পৌঁছনেকো উমেদ হ্যায়।' শুনে বললাম—আমি তো তৈরী আছি। যখন বলবে তখনই মাচানে বসতে পারি। সে বলল—'দো বাজে কা অন্দর মাচান মে বৈঠ যানা চাহিয়ে।' বললাম—ঠিক হ্যায়। হাম তৈয়ার হোতা। তুমলোক জলদী খানা খাকর তৈয়ার হো যাও। তেত্‌রারা চলে যেতেই আমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে

আমরা দুটোর কিছু আগে বাংলো থেকে রওনা হলাম। আমার দু' বন্ধুর একজনও সংগে এ'ল না। একজন তো দু'রাত মাচানে থেকে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর একজনের আসা অবধি শরীর খারাপ। রামু ও তেত্রাদের সংগে নিয়ে খুব সাবধানে নিঃশব্দে মাচানের কাছে গিয়ে মাচান পরীক্ষা করেই বুঝলাম তেত্রা দারুণ ভুল করেছে। সে কেবল মারীর দিকে একটা মাত্র ফাঁক রেখেছে আর বাকী তিনদিকে কঞ্চির বাঁধনে বড় বড় সেগুন পাতা দিয়ে পর্দা লাগিয়েছে; অন্ততঃ আরও দুটো ফাঁক রাখা একান্তই উচিত ছিল। সামনে ঘন জঙ্গল আর পাহাড়—বাঘ সেই সামনের জঙ্গল দিয়ে আসতে পারে অথবা মাচানের ডানহাতি ঘন জঙ্গল ও পাহাড় থেকে যে নালাটা নেমে এসেছে বাঘের সেদিক দিয়েও আসার সম্ভাবনা আছে। আমি সব কিছু পরীক্ষা করে তেত্রার কানের কাছে মুখ এনে খুব নীচু গলাতে তাকে বললাম—তুমি ত' একটি মাত্র ফাঁক কেবল মারীর দিকে রেখেছ। যদি শের সামনের জঙ্গল আর পাহাড় থেকে আসে তাহলে আমি কি করে দেখব? আর ডানহাতি নালা দিয়েও শেরের আসার সম্ভাবনা—তাহলেই বা আমি কি করে দেখব, গুলিই বা চালাব কি করে? সে মুখ কালো করে মাথা হেঁট করে বললো—'সাহেবজী গলতি হো গিয়া।' আমি আর কথা না বাড়িয়ে মাচানে ওঠা ঠিক করলাম। ভাবলাম সবেতেই দেখছি আমার কপালদোষে বাধা পড়ছে। যা হ'বার হ'বে ভেবে আমি যখন মাচানে উঠতে যাচ্ছি তেত্রা হাত জোড় করে আমাকে অনুরোধ করল সেও আমার সংগে মাচানে থাকতে চায়। আমি শুনে বললাম—আমার সংগে কাউকে মাচানে চাই না, আমি বরাবর একলা মাচানে বসি। গতরাত্রে ছোটসাহেব বসতে চাইলে, আমি না করতে পারিনি—কিন্তু তোমার বসবার দরকার নেই। সে শুনল না, বলল—'না সাহেব, আজ আমাকে দয়া

করে মাচানে বসতে দিন। আমি কথা দিচ্ছি আপনার কোনরকম অসুবিধা করবো না। আমি চুপ করে আপনার পাশে বসে থেকে আজ রাত্রে আপনার বাঘ শিকার দেখবো।' তাকে বললাম—বাঘ পাব কিনা তার কি কিছু ঠিক আছে? তাছাড়া তোমার দেখছি গরম জামা কাপড় কিছুই নেই। রাত্রে দারুণ ঠাণ্ডা পড়ে, তুমি ঠাণ্ডাতে থাকতে পারবে না। সে বলল—'না সাহেব, আমরা জঙ্গলের মানুষ।' তার গায়ের একখানা চাদর দেখিয়ে বলল—'এই তো আমার চাদর রয়েছে, আমার ঠাণ্ডা লাগবে না। আপনি দয়া করে আমায় আজ রাত্রে মাচানে বসতে দিন। বললাম—একটা চাদরে তোমার কিছুই হবে না। ঠাণ্ডাতে একেবারে জমে যাবে। এ'ত জামা কাপড় পরেও গতরাত্রে আমার বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। সে আবার হাত জোড় করে আমায় অনুরোধ করল সংগে বসার অনুমতি দেবার জন্য। যখন দেখলাম তেত্‌রা একদম নাছোড়বান্দা তখন আর সময় নষ্ট না করে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—ঠিক আছে, মাচানে বসতে পার কিন্তু কোনরকম নড়াচড়া, কথা বলা বা ইশারা করা কোন কিছুই তুমি করতে পারবে না—তাতে আমি বাঘ মারতে পারি ভাল, না পারি সো ভি আচ্ছা। সে খুসী হয়ে বলল—'জী হাঁ।' তখন তাকে আমার '৪৫০ বোরের দোনলা রাইফেলটা ধরতে বলে মাচানে ওঠার জন্য একটা গাঁটওয়ালা হেলান রোলা বেয়ে কোন রকমে উঠে পড়লাম। মাচানটা খুবই নীচু—নালার পাড় থেকে খুব বেশী হ'লে মাত্র ৫।৬ ফুট উঁচু হবে। আমি উঠে হাত বাড়িয়ে আমার রাইফেলটা নিয়ে বসলে পর তেত্‌রাও উঠে পড়ল! রামুকে আগেই বলা ছিল পরের দিন সকালে আটটা নাগাদ গাড়ী আনার জন্য। রামুদের চলে যাবার জন্য ইশারা করতেই তারা নিঃশব্দে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি রাইফেলে দুটো গুলি ভরে, টর্চ বাতি ঠিকমত লাগিয়ে, মাচানের পর্দার ফাঁকের মুখে রাইফেলটা রেখে, তেত্‌রাকে আরেক

বার মনে করিয়ে দিলাম, কোনরকম নড়াচড়া, কথা বলা বা ইশারা যেন না করে চুপ করে পাথরের পুতুলের মতন যেন বসে থাকে। সে মাথা নেড়ে জানাল—'ঠিক আছে।' কোমরের পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলাম, ২-৪৫ মিঃ। মাচানে সোজা হয়ে বসলে পর্দার ফাঁক দিয়ে মারীটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি হেলান দিয়ে বসে বাঘের অপেক্ষায় রইলাম। সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—সেগুন গাছের পাতা দিয়ে মাচানের চারিদিক এমনভাবে ঢাকা যে একটা ছুঁচ পর্যন্ত গলান যায় না। চারপাশে শাল আর সেগুনের জঙ্গল। নানারকম বড় বড় নাম না জানা গাছও আছে। গাছের গুঁড়িগুলো আবার অনেক রকম জংলী আগাছা দিয়ে ঘন ভাবে ঢাকা। চারপাশে পাহাড় আর ঘন জঙ্গল—ত্রিসীমানাতে কোন লোকালয় নেই। কুমাণ্ডি ফরেষ্ট বাংলো ওখান থেকে ৬।৭ মাইল দূরে, সেখানে বুড়ো চৌকিদার আর আমাদের কয়েকজন ছাড়া আর কোনও লোক নেই। সারা জঙ্গল এতই নিস্তব্ধ যে একটা ছুঁচ বা পাতা পড়লে শোনা যায়। পড়ন্ত অপরাহ্ন হলেও ঐ নিস্তব্ধতায় যেন গায়ে কাঁটা দেয়, রাত্রির কথা ত ভাবাই যায় না। আমরা তুজনে পাথরের মতন নিশ্চল ও নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি। আমি বহু বার গভীর রাতে জঙ্গলে মাচানে একলা বসে কাটিয়েছি এবং মাচানে পাথরের মতন বসে থাকা আমার সহজ অভ্যেস হয়ে গেছে। জানিনা তেত্‌রা কি করবে শেষ পর্যন্ত। অজানা লোক নিয়ে মাচানে বসার ফলে হয়তো আমার আজকের শিকারটাই মাটি হয়ে যাবে। আমার এমনই কপাল যে গতরাত্রে বাঘ পেয়েও নিজের বোকামীর জন্য মারতে পারলাম না—আর আজ তো সব কিছুতেই বাধা পড়ছে—মারী না বাঁধা, মাচান ঠিকমত না হওয়া ইত্যাদি। এইসব নানা চিন্তায় আমি যখন অস্থির, তখন হঠাৎ সামনের পাহাড় ও জঙ্গল থেকে একটা ভারী জানোয়ারের পায়ের গম্ভীর আওয়াজ আমাদের দিকে আসতে শুনলাম। আওয়াজটা শুনেই উত্তেজনাতে আমার

বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আমরা মাচানে বসার ৩০।৪০ মিনিটের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটতে দেখে ভাবলাম, তেত্‌রা ঠিকই বলেছে—'শের মারীপর বহুত জলদী আ স্যাকতা। জায়গা বহুত সন্নাটা হ্যায়।' আওয়াজটা শোনার সংগে সংগেই আমি খুব সাবধানে মাচানে সোজা হয়ে বসে মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম—ভগবান, বাঘটা যেন দিনের আলো থাকতে থাকতেই মারীর কাছে যায়। বাঘকে যদি দিনের আলোতে দেখতে পাই তাহলে এক গুলিতে আমি ধরাশায়ী করে দেব। রাত্রে গুলি করার অনেক অস্সুবিধা এবং সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। এমন অনেক সময় হয়েছে জোরাল শিকার টর্চের বোতাম টেপার সংগে সংগে উজ্জ্বল আলো অন্ধকার চিরে লক্ষ্যবস্তুর ওপর পড়ার আগে একটা চক্‌চকে পাতার ওপর পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে এবং সেই অবসরে শিকার ফস্‌কে গেছে। আওয়াজটা যতই কাছে আসতে লাগল ততই বুঝলাম সেটা একটা বাঘের পায়ের আওয়াজ। আগের অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে বাঘ যদি চায় তাহলে সে এমন নিঃশব্দে ছায়ার মতন আসতে পারে যে কাছে থেকেও তার আসা যাওয়ার খবর কেউ কিচ্ছু টের পাবে না। সে কথা সময়ান্তরে বলার ইচ্ছে রইল। আবার কখনও কখনও বাঘ ইচ্ছে করেই খুব আওয়াজ করে আসে।

আগেই বলেছি যে আমাদের মাচানের চারপাশে ঘন সেগুন আর শালপাতা দিয়ে পরদা করা ছিল। বাঘের পায়ের আওয়াজ সামনের পাহাড় আর জঙ্গলের দিক থেকে ক্রমশঃ আমাদের মাচানের দিকে এগিয়ে আসতে শুনছি, কিন্তু পাতার আড়ালের জন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তখন তেত্‌রাকেও তার বাপান্ত করার জন্য পৃথিবীর সব শব্দ মুখে এলো—কিন্তু, সে থাক্‌। বাঘটা ফচ্‌ ফচ্‌ খস্‌ খস্‌ আওয়াজ করে আমাদের মাচানের দিকে এগিয়ে আসছে! অথচ দেখতে পাবার কোনই সুযোগ নেই। উত্তেজনাতে আমার

বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডের শব্দ এত জোরে এত স্পষ্ট হচ্ছে যে আমি নিজের কানে সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছি! ক্রমশঃ আওয়াজটা এগুতে এগুতে মনে হোল যেন মাচান থেকে মাত্র ১০।১২ হাত দূরে এসে থেমে গেল! আর কোনও রকম আওয়াজ পাচ্ছিলাম না। তখনকার উত্তেজনা ও ঔৎসুক্য-কাতরতার তুলনা দেওয়া বা বোঝান অসম্ভব—একমাত্র শিকারে যারা এ অবস্থায় পড়েছে তারাই বুঝতে পারবে রক্তচাপের 'পারা' কত শতকে গিয়ে ওঠে! আমি চোখের বাঁদিকের কোণ দিয়ে আড়চোখে মারীটার দিকে লক্ষ্য রেখে পাথরের মতন আশঙ্কায় অস্থিত হয়ে বসে আছি আর ভগবানকে ডাকছি—বাঘটা যেন দিনের আলো থাকতে থাকতেই মারীর কাছে চলে আসে। আমি যেন এক গুলিতে বাঘটাকে মারতে পারি। এমন সুযোগ সচরাচর আসে না—মনে হচ্ছে এতদিনে ভগবান হয়তো আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে দিনের আলোতে আমাকে বাঘ পাইয়ে দিচ্ছেন। এইভাবে যতই সময় যাচ্ছে আমার স্নায়ুগুলো ততই শক্ত হয়ে উঠ্ছে! ক্রমশঃ আমার সব উত্তেজনা কমে গিয়ে আমি ধনুকের ছিলার মতন টান হয়ে উঠলাম; আমি তখন বাঘের সংগে যে কোন পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করতে পারি। বেশ অনুভব করলাম আমার কোনরকম উত্তেজনা নেই—শক্ত পাথরের মতন বসে আছি আর ভগবানকে ডেকে যাচ্ছি। এইভাবে বসে থাকতে থাকতে হু হু করে সময় কেটে যেতে লাগল, ক্রমশঃ ৩টে বাজল, ৪টে বাজল কিন্তু সেই যে আওয়াজ মাচানের ১০।১২ হাতের কাছে এসে থেমেছে তারপর আর কোন সাড়া শব্দ নেই! এভাবে যতই সময় যেতে লাগল আমার ভাবনা চিন্তা ততই বাড়তে লাগল। ৫টা বাজল ৬টা বাজল কিন্তু বাঘের নড়াচাড়ার কোনও আওয়াজ পাচ্ছি না! একবার মনে হোল বাঘটা বোধহয় আমাদের দেখে ফেলেছে তাই হয়তো পালিয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আমরা পাথরের মতন বসতে পারিনি, আমাদের কোনও রকম নড়াচড়া নিশ্চয়ই বাঘের নজরে

পড়েছে ! আমার তরফ থেকে আমি হলপ করে বলতে পারি আমি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলিনি—তবে কি তেত্‌রা অসাবধানে তার শরীরের কোনও অংশ নড়িয়েছে ? মনের মধ্যে নানা ভাবনা তোলপাড় করতে লাগল। হঠাৎ আমাদের ডানহাতি নালাটা যেটা পেছনের বড় পাহাড় থেকে এঁকে বেঁকে নেমে এসেছে, সেই নালাটা থেকে আগের আওয়াজের চেয়ে ভারী একটা বড় বাঘের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম ! তক্ষুনি আমার কাছে সমস্ত জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মারীটা বাঘ ও বাঘিনী দুজনে মিলে গতরাত্রে খেয়েছে। প্রথম পায়ের আওয়াজটা ছিল বাঘিনীর। সে বেলা ৩টে নাগাৎ মারীর কাছে এসে মারী পাহারা দিচ্ছিল এবং ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৬টার পর পর্যন্ত একভাবে এক জায়গাতে বসেছিল তার সখাটির অপেক্ষায়। এ যেন অনেকটা বাড়ীর কর্তার জন্য গৃহিণীর ভাত বেড়ে বসে থাকার মত। যখন বাঘের ভারী পায়ের আওয়াজটা মাচান থেকে ১০।১২ হাতের কাছাকাছি এসে পৌঁছল তখন শুনলাম আবার ঐ বাঘিনীর পায়ের আওয়াজ। বাঘিনীটা তাড়াতাড়ি আওয়াজ করে গিয়ে নালাতে বাঘটার সংগে মিললো। তারপর বাঘ ও বাঘিনীর মধ্যে তাদের ভাব ভালবাসার আদান প্রদান শুরু হল—নানা উপায় ও শব্দে যা তাদের প্রেমালাপ হলেও ভয়ঙ্কর আতঙ্ক জাগায়। জুটি দু'টী গর্জন করতে করতে পা পা করে মারীর দিকে এগুতে লাগল। মাচান থেকে মারীটা পর্যন্ত নালাটা প্রায় সোজা—তারপর নালাটা হঠাৎ ডানহাতি ঘুরে গিয়েছে। বাঘটা বাঘিনীর ভালবাসা নিতে নিতে পা পা করে মারীর দিকে এগুচ্ছিল। নালার বাঁক পেরিয়ে বাঘ ও বাঘিনী যখন আমাদের মাচানের নীচে এসে পৌঁছেছে তখন বাঘের মারীর দিকে নজর পড়তেই সে বাঘিনীর ভালবাসার মতলব বুঝতে পেরে গেল যে বাঘিনী ভালবাসা দিয়ে ভুলিয়ে একসঙ্গে মারী খেতে চায়। বাঘিনীর মতলব বুঝেই বাঘ মহাশয়ের মেজাজ বিগড়ে গেল। বাঘ ভীষণ

চটে গিয়ে মনে হ'ল বাঘিনীকে বেশ ছুচার থাপ্পড় বসিয়ে দিল। এদিকে তাদের এই প্রেমের যুদ্ধে আর হুঙ্কারে গর্জ্জনে সেখানকার মাটি এবং আমাদের মাচান প্রায় কাঁপতে লাগলো। অথচ কিছুই ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। আমি বছরের পর বছর বাঘের দেখা পাইনি—কিন্তু যখন দেখা পেলাম তখন একসংগে বাঘ ও বাঘিনীর এবং তাদের পিঠ ও মাথা থেকে আমি মাত্র ৪।৫ ফুট উঁচুতে মাচানে বসে! আমি হলপ করে বলতে পারি এ অভিজ্ঞতা খুব অল্প শিকারীর কপালে জোটে। একদিকে মাচানের নীচে বাঘ ও বাঘিনীর মল্লযুদ্ধ আর উপরে আমি আর এক যুদ্ধে ব্যস্ত। মনের মধ্যে ভাবনাচিন্তাগুলো তোলপাড় করছে ঝড়ের বেগে। মাচানের পর্দায় মারীর দিকের ফাঁকে ভারী রাইফেলটার মুখ খানিক গলিয়ে বাঁটটা মাচানের জমিতে ঠেকিয়ে রাখা আছে। রাইফেলটা হাতে তোলার সময় মাচানে যদি একটু আওয়াজ হয় তাহলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে! আমার হাত ছুটো হাঁটুর ওপরে রাখা আছে। আমি কি করে নিঃশব্দে ভারী রাইফেলটা হাতে তুলবো, সেটাই একটা মস্তবড় ভাবনা হয়ে উঠল! কি করা যায় ভেবে পাচ্ছি না—এমন সময় মনে হ'ল, বাঘিনীটা বাঘের মার খেয়ে আবার নালার ওপর উঠে পড়লো। বাঘটা তখন খুব বড় বড় করে হুঁ-য় হুঁ-য় করে আওয়াজ করছে ঠিক মাচানের নীচেই! আমি হাত বাড়ালে হয়তো তার মাথা ছুঁতে পারি এতই কাছে! জানোয়ারটা খুবই অল্পক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে বড় বড় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার মতন হুঁ-য়—হুঁ-য় করে আওয়াজ করতে করতে ভারী শরীর ও বড় বড় থাবাগুলো ফেলে বালির ওপর ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে আওয়াজ করে, গম্ভীর চালে মারীর দিকে এগুতে লাগল! সেই আওয়াজের তালে তালে আমিও খুব সাবধানে রাইফেলটা ধরবার জন্য হাঁটুর ওপর থেকে হাত ছুটো বাড়াতে লাগলাম—আর সেই সংগে কোমর থেকে শরীরটা অল্প একটু ঝুঁকিয়ে পরদার ফাঁক দিয়ে মারীর

দিকে লক্ষ্য রাখলাম। আমার বাঁহাত তখনও রাইফেলের বাঁট ছোঁয়নি—ডান হাত তখনও রাইফেল থেকে বেশ কিছুটা দূরে!

আজও আমার ·৪৫০ ভারী দোনলা রাইফেলটা নিয়ে এসেছি—যেটা নিয়ে আমি গতরাত্রে সাংঘাতিক উত্তেজনায় ধোঁকা পেয়েছিলাম সামনের ও পেছনের 'মাছি' (Rear sight) মিলিয়ে ট্রিগার টানতে পারিনি বলে; কিন্তু আজ এনেছি—যে ভুল করেছিলাম প্রথমবার শিকারের উত্তেজনার প্রথম মুহূর্তে সে ভুল শুধরে নিজেকে তৈরী করে নেবার জন্য। ভাগ্যের লিখন এমনই—আজ যেন অবস্থার বিপাক হয়ে উঠতে লাগল আমার সমস্ত একাগ্রতা ও ক্ষণ উপযোগী গুলি চালানর মানসিক স্থিরতা সত্ত্বেও। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ—ভাগ্যের লড়াইয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারি—কিন্তু ফল? সেটি তাঁরই হাতে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখলাম, একটা বিরাট বড় কাল হাঁড়ীর মতন মাথা এবং খানিক শরীর, যা আস্তে আস্তে ছায়ার মতন মারীর কাছে পৌঁছলো। আমি ভগবানকে ডেকে চলেছি—ভগবান! তুনিয়ার সব নিয়ম ভেঙ্গে, আজ বাঘ মারীটাকে যেন ঐখানেই খায়। ইতিমধ্যে অন্ধকারে হাফুঁস-হাফুঁস করে আওয়াজ শুনলাম, যাকে ইংরাজীতে বলে 'ব্লোইং'। বাঘ যখন মারী আধখাওয়া অবস্থায় রেখে যায়, তখন তাতে পিঁপড়ে বা অন্যান্য পোকা-মাকড় লাগে। পরের দিন খাওয়া শুরু করার আগে মারীর যেখানটা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যাবে, সে জায়গাটা ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করে নেয়। যেমন একটা বাতাসা কি সন্দেশে পিঁপড়ে লাগলে ফুঁ দিয়ে পিঁপড়েগুলোকে ফেলে দিই—তেমনি। আমার হাত তুটো তখনও রাইফেল ছোঁয়নি সেই সময় এই আওয়াজ পেলাম। ভগবানকে ডেকে চলেছি—ভগবান! আমাকে মুহূর্তকাল সময় দাও, বিনা আওয়াজে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে গুলি চালাবার জন্য—আর বাঘ যেন ততক্ষণ পর্যন্ত মারীটা না টেনে ওইখানেই থাকে। পরমুহূর্তে একটা মোটা হাড় ভাঙ্গার আওয়াজ পেলাম!

মনটা নেচে উঠল—ভগবান আজ হয়ত আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। বাঘটা হয়তো বা সব নিয়ম ভঙ্গ করে ওইখানেই খাচ্ছে! অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমার বাঁ হাত রাইফেলটা ছুঁয়েছে—ডান হাত তখনও রাইফেল ছোঁয়নি—এমন সময় একটা ভারা জিনিষ টানার আওয়াজ পেলাম! শুনেই আমার অন্তরাত্মা চমকে উঠল! সংগে সংগে আমি রাইফেলটা তুলেই টর্চের বোতাম টিপলাম। নালার বুকে আমার ছ'সেলের টর্চের আলো অন্ধকার চিরে আছড়ে পড়লো, কিন্তু কোথায় বাঘ!! কোথায় মারী! যা ভয় করেছিলাম তাই হ'লো। আমার এতক্ষণের এত আশা সব এক ফুৎকারে ঘুচে গেল! কত বৎসর ধরে বাঘ বাঘ করে কত জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কত কষ্ট করেছি, না খেয়ে না ঘুমিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটেছি, পাহাড়ের পর পাহাড় চড়েছি, নেমেছি কিন্তু ভগবান তবুও কি তোমার দয়া হ'লো না! এক জোড়া বাঘ মাচানের এত কাছে পেয়েও মারতে পারলাম না! এ তোমার কি পরীক্ষা তুমিই জান। আমি রাইফেল ঘুরিয়ে বাতি জ্বেলে আশ-পাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু কোথায় বাঘ! একটানে নিশ্চয়ই মারীটাকে নালার বাঁকের আড়ালে নিয়ে গেছে বা আমার বাতি ফেলার সংগে সংগে ওরা কোথায় যেন ঘাপটি মেরে বসে পড়েছে! আমি বাতি ফেলে কিছুই দেখতে না পেয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিলাম—ভাবলাম, বাতি জ্বালানো মানে মাচানটা তাদের আরও ভাল করে দেখিয়ে দেওয়া। মদ্দা বাঘটা আসার কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল! আমি মনে মনে নিজের পাথর চাপা কপালটা চাপড়াচ্ছি আর ভাবছি, বহু বৎসর পর এই প্রথম পরপর দু'রাত্রি বাঘের দেখা পেলাম; প্রথম রাত্রে নিজের দোষেই গুলি চালিয়ে বাঘটাকে মারতে পারিনি, আর আজকে কাকে দুষব? নিজের কপালকে না নিজের দুর্বুদ্ধিকে? যে কোন লোক শুনলেই বলবে

মারী বাঁধা একান্তই দরকার ছিল, তার জন্য শিকারী হতে হবে না—সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই বলবে। মারী না বাঁধলে অন্ধকারে ছায়ার মতন কখন বাঘ এসে মারী টেনে নিয়ে চলে যাবে, তা শিকারী কি করে বুঝবে? কুট্সের কথা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়াই আমার ভুল হয়েছে; কেন আমি এই ভুল করলাম? বার বার মনে হতে লাগল এই জন্য দায়ী আমি নিজেই—আমি কাউকে দোষ দিতে পারি না। কপালে পাথরচাপা আছে—কবে যে সে পাথর সরবে জানি না। মনের মধ্যে তখন ঝড়ো হাওয়ার মতো ভাবনা চিন্তাগুলো ছুটোছুটি করছে। হঠাৎ মাচানের পেছনে ১০।১২ হাত দূরে একটা পাতলা শুকনো কাঠি যেন কোন ভারী জিনিষের চাপে ভেঙ্গে যাওয়ার 'পুট্' করে একটা আওয়াজ পেলাম! বুঝলাম, শ্রীমান বাঘটি আমার মাচানের পেছনে এসে তার শ্যেন দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখছে! 'ম্যান ইটার' বা মানুষখেকো জানোয়ার হলে কখন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় মটকে দিত। তাদের এই সান্ধ্য ভোজনে বাধা দেওয়ার জন্য মনে মনে হয়তো আমার উপর খুব বিরক্ত হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম বাঘ যেমন মাচানের পেছনে বসে আমার উপরে লক্ষ্য রাখছে, বাঘিনীটাও তেমনি নালার ওপারে কোথাও বসে আমার উপর নজর রেখেছে এবং তারা খুব কাছাকাছিই আছে। কিন্তু আগের মটাস্ করে মোটা হাড় ভাঙ্গার আওয়াজটা কি ছিল? খুব সম্ভব বাঘটা হাফুঁস-হাফুঁস করে ফুঁ দিয়ে, মারীটার পাঁজরার কাছে পিঁপড়ে-গুলোকে সরিয়ে পাঁজরের ওপর কামড়ে মারীটাকে টানবার চেষ্টা করার সময় পাঁজরের একটা মোটা হাড় ভেঙ্গে যায়—তার থেকেই মোটা হাড় ভাঙ্গার আওয়াজ পেয়েছিলাম। এই সব নানা চিন্তার মধ্যে দিয়ে হু হু করে সময় কাটতে লাগলো। মনে হোল, সারারাত বাঘ ও বাঘিনীর শ্যেনদৃষ্টির মাঝে ঠুঁটো জগন্নাথের মতন বসে কাটাতে হবে, এজন্য খুবই খারাপও লাগতে লাগলো। আমার

অনুভূতি দিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে বাঘ ও বাঘিনী মাচানের খুব কাছেই আছে এবং তারা সারারাত একই জায়গায় বসে তাদের শত্রু পাহারা দেবে। এই ভাবে প্রায় ঘণ্টা দুই সময় কেটে গেল—হাতে ভারী রাইফেলটা ধরাই আছে এবং ক্রমশঃ আমার হাত দুটো অবশ হয়ে আসছে দেখে মনে হতে লাগল আর কিসের জন্য রাইফেল ধরে বসে থাকা? বাঘ ও বাঘিনী যখন আমাকে দেখে ফেলেছে—বুদ্ধির খেলায় আমি হেরে গেছি, আমার সমস্ত জারিজুরিই তাদের কাছে ধরা পড়ে গেছে। রাইফেলটা নামিয়ে ভাবলাম একটু আরাম করে বসি—এই ভাবেই তো সারারাত কাটাতে হবে। মাচানের পিঠের হেলানে পিঠ রেখে কোমরের পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলাম সাড়ে আটটা বেজেছে—তার মানে প্রায় সারা রাতটাই বাকী। পরের দিন সকাল আটটা সাড়ে আটটার আগে তো আমাদের গাড়ী আসবে না। ভাবলাম কপালে অনেক দুঃখ আছে।

ওদিকে সন্ধ্যের পর থেকেই বেশ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে সুরু করেছে। রাত বাড়ার সংগে সংগে দুপাশের পাহাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে আসা হাওয়ার তেজ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। আমি খুব ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারি কিন্তু রাত ন'টা নাগাদ আমারও একটু শীত করছে বলে মনে হতে লাগল। এতক্ষণ তেত্‌রার কথা আমার মনেই ছিল না। সে যে আমার পাশে আছে একবার মাত্র বুঝেছিলাম—আমি যখন মারীটানার আওয়াজ শুনেই বাতি মারলাম এবং পরক্ষণেই বাঘ বা মারী কিছু দেখতে না পেয়ে বাতি নিবিয়ে নিজের মনেই কপাল চাপড়াচ্ছিলাম, সেই সময় তেত্‌রা আমার উরুতে সামান্য চাপ দিয়ে তার হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা তার কপালের কাছে নিয়ে নাড়তে লাগল,—তার মানে আমার কপালে বাঘ নেই। তার এই ইশারাটা যেন কাটা ঘায়ে নুনের কাজ করছিলো। যাই হোক তখন কে কি করলো না করলো দেখবার মন ছিল

না। তারপর বহুক্ষণ কেটে গেছে তেত্‌রার কথা আমার মনেই ছিল না। হঠাৎ সে যে আমার পাশে বসে আছে সেটা জানান দিলো, শীতে তার দাঁত কট্‌কটানির আওয়াজে। তার নীচের পাটির দাঁতগুলো উপরের পাটিতে গিয়ে খট্‌ খট্‌ করে লাগছে! আমি বজ্রমুষ্ঠি দিয়ে তার উরু চেপে ইশারাতে জানালাম, কোন রকম আওয়াজ কোরো না। কিন্তু শীত বড় সাংঘাতিক জিনিষ—সে যতই চেষ্টা করছে—খানিকক্ষণ পর পর তার সব চেষ্টাকে বিফল করে দাঁত জোড়া খট্‌ খট্‌ করে আওয়াজ করে উঠ্‌ছে। এইভাবে খুব জোর রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত চলার পর বেচারা আবার আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল—'সাহাব ঠাণ্ডা বরদাস্ত নেহী হোগা।' তার কানের কাছে মুখ এনে বললাম—তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে। এখন আর কোন উপায় নেই আমার কাছেও বাড়তি জামা বা চাদর নেই যে তোমাকে দেব। ঠাণ্ডা বরদাস্ত করে থাকতেই হবে। আমার কথা শুনে সে ঠাণ্ডা বরদাস্ত করার চেষ্টা করতে লাগল—কিন্তু অসম্ভব; ৫।১০ মিনিট পর পর তার দাঁত জোড়া যে ভাবে খট্‌ খট্‌ করতে লাগল তাতে মনে হোল যে, যে কোন মুহূর্তে তার দাঁতগুলো ভেঙ্গে পড়ে যাবে। বেচারা আবার আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল—'হুজুর মর যায়গা, ঠাণ্ডা বরদাস্ত নেহী হোতা।' আমি মহা ভাবনায় পড়লাম—এখন কি করা যায় একে নিয়ে? রাগও হতে লাগল আবার দুঃখও হতে লাগল। বেচারা গরীব মানুষ—আমাদের মত গরম জামা কাপড় কোথায় পাবে। সে হঠাৎ ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে উঠল—'চলিয়ে হাম দোনো মাচানসে উতারকে পায়দল বাংলা চলা যায়—আউর শের মিলনেকা উমেদ নেহী হ্যায়।' আমি ত শুনেই মুখে আঙ্গুল দিয়ে তাকে চুপ করার জন্য ইশারা করলাম সেও চুপ করলো কিন্তু তার দাঁত কট্‌কটানি কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না। এদিকে মাচান থেকে নেমে যাবার কথাটা শোনা

পর্যন্ত আমার মাথার মধ্যে ওই কথাই ঘুরতে লাগলো। জানি যে বাঘ যদি মারীর কাছে এসে কোনরকমে শিকারীর মাচানে লুকিয়ে বসে থাকা বুঝে যায় তাহলে হয় সে সেখান থেকে সরে যাবে নয়তো সে সারারাত লুকিয়ে শিকারীর উপর নজর রেখে বসে থাকবে। মানুষখেকো না হ'লে অনেক সময় শিকারী মাচান থেকে নেমে চলে যাবার সময় বাঘ তার পেছন পেছন অনেকখানি গিয়ে দেখে শিকারী সত্যিই চলে গিয়েছে কিনা। তারপর সে আবার মারীর কাছে ফিরে আসে। আবার এও জানি বাঘ ভোর পর্যন্ত শিকারীকে মাচানে বসে থাকতে দেখলে সেই মারীর আশা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, আর সে মারীর কাছে আসে না। এই শেষের কথাটাই আমার মাথার মধ্যে বেশী করে ঘুরতে লাগল। আমি যদি সারারাত মাচানে বসে থাকি তাহলে বাঘ ও বাঘিনী শেষ পর্যন্ত মারীটা ছেড়ে চলে যেতে পারে। তখনও মারীটা আধখানার মত পড়ে আছে—খেতে আরম্ভ করলে আধখানা মারী ওরা দুজনে সে রাত্রে শেষ করতে পারবে না; কারণ গতরাত্রে ওরা পেটভরে মাংস খেয়েছে। আর রাত দশটার সময় যদি আমরা মাচান থেকে নেমে যাই তাহলে কাছেপিঠে থাকলে ওরা আমাদের জঙ্গল পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পেছন পেছন আসবে, তারপর ফিরে গিয়ে সব দিক দেখে শুনে যদি রাত ১১।১২টার সময় খাওয়া আরম্ভ করে, তাহলে পরের দিন খানিকটা মারী পড়ে থাকার খুবই সম্ভাবনা আছে। কাজেই ঠাণ্ডাতে মাচানে আর সারারাত বসে থাকার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া তেত্‌রা বেচারা ঠাণ্ডাতে প্রায় মারা যাবার দাখিল—ওর জন্য একটা কিছু করতেই হয়। তেত্‌রা ফের বলে উঠল—'হুজুর মর যায়গা, ঠাণ্ডা বরদাস্ত নেহী হোতা।' ইতিমধ্যে আমি প্রায় ঠিক করে ফেলেছি মাচান থেকে নেমে বাংলোতে ফিরে যাব। কিন্তু এ ভাবনা যে কত বড় ভুল তা ভাবতেও পারি নি! আমি তেত্‌রার কানের কাছে মুখ এনে

বললাম—ঠিক আছে, তুমি আমার তিন সেলের টর্চটা নাও—আমরা দুজনে মাচানে উঠে দাঁড়িয়ে আগে চারিদিকে বাতি ফেলি, কারণ মনে হয় বাঘ ও বাঘিনী আমাদের মাচানের খুব কাছেই আছে। বাতি জ্বেলে যদি দেখতে পাই ভালই—তা না হলে ওরা আমাদের বাতি দেখে খানিক সরে যেতে পারে বা পালিয়ে কিছু দূরে চলে যেতে পারে। তেত্‌রা ঘাড় নেড়ে জানালো সে সব বুঝেছে।

এই সব ভেবে চিন্তে আমি রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে তেত্‌রাকে দাঁড়াবার জন্য ইশারা করলাম। সে ও আমি সাবধানে মাচানের উপর দাঁড়িয়ে একসংগে বাতি জ্বেলে মারীর আশেপাশে ফেলতে লাগলাম। আমাদের বাতি দুটো অন্ধকার চিরে নালা ও আশপাশের সমস্ত জঙ্গল আলো করে ফেললো। আমরা বাতি ঘুরিয়ে নালার পাড়ে যেখানে বাঘিনীর আওয়াজ পেয়েছিলাম সেই জায়গাতে ফেললাম কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। না বাঘিনীর চোখ জ্বলা, না কোন কিছুর নড়াচড়া দেখতে পেয়ে আমরা বাতি ঘুরিয়ে মাচানের পেছন দিকে ফেলে বাঘটার সন্ধান করতে লাগলাম—কিন্তু সেখানেও কিছুই নজরে পড়লো না। আমার যেন মনে হতে লাগল বাঘ ও বাঘিনী দুজনেই মাচানের কাছাকাছি কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। যাই হোক, এবার আমাদের মাচান থেকে নামার পালা। ভয়াবহ প্রাণান্তকর ঝুঁকি যে কেন নিলাম জানি না—একটা সাংঘাতিক অবস্থার চাপে পড়ে তেত্‌রার জন্য সহানুভূতিতেই হয়ত ঠিক করেছিলাম—তা না হলে কোন শিকারীই এই অবস্থায় মাচান থেকে নামবার কল্পনাও করতে পারে না। এক জোড়া বাঘের সামনে রাত্রে নেমে আসা কোন বুদ্ধিতেই চলে না। আমি খুব নীচু গলাতে তেত্‌রাকে বললাম—তুমি আগে মাচান থেকে নেমে আমার রাইফেলটা ধর, তারপর আমি নামবো। সে শুনে বললো—'না

সাহেব আমি খালি হাতে আগে মাচান থেকে নামতে পারবো না। আপনিই আগে নামুন।' আমি মনে মনে ভাবলাম বেচারা ঠিকই বলেছে—বাঘ শিকারের উৎকট সখ আমারই। সে বেচারা কয়েকটা টাকার লোভে আমাদের সংগে এসেছে মাত্র। কেনই বা সে বিপদের মুখে যেতে যাবে? বললাম—ঠিক আছে, আমি আগে নামছি তুমি আমার রাইফেলটা ধর। আমি তার হাতে আমার রাইফেলটা দিয়ে এক লাফে মাচান থেকে নেমে পড়লাম। রাইফেলটা এগিয়ে দিয়ে সেও এক লাফে নেমে পড়লো। তেত্‌রার হাতে তিন সেলের টর্চটা জ্বালা অবস্থাতেই ছিল। তাকে নীচু গলায় বললাম—তুমি টর্চ জ্বেলে পথ দেখিয়ে আগে আগে চল। সে 'জী হাঁ' বলে পা বাড়াল আর আমি চললুম তার পেছনে পেছনে। জায়গাটার চারপাশে ঘন জঙ্গল—প্রচুর জংলী কুল কাঁটার গাছ, নালা, বড় বড় এবং ছোট ছোট পাথর, খুব সাবধানে পা ফেলতে না পারলে পা ভাঙ্গার বা পড়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা। আমি তেত্‌রার পেছনে পেছনে মাটিতে কোনখানে পা ফেলবো সেইদিকে চেয়ে খুবই সাবধানে পা পা করে এগুচ্ছি—ডানহাতে ধরা আছে ভারী রাইফেলটা। তেত্‌রাও ঠিক আমার সংগে সংগেই পা পা করে সামনে এগুচ্ছে। নিঃসীম অন্ধকার, নিঝুম রাত্রি, নিজেদের পায়ের শব্দই খুব জোরাল মনে হচ্ছে—কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক থমথমে ভাব! মনে ষষ্ঠানুভূতির অস্বস্তিকর উপলব্ধি। ঠাণ্ডা বাতাসের সংগে বিপর্যয়ের কী একটা আভাষ যেন। রাত্রে জঙ্গলে ত বহুবার একাই হেঁটেছি দৃঢ় স্থির মনে বিশ্বাস নিয়ে কিন্তু এ যাত্রায় যেন কী একটা বেসুর ভাব লাগছিল—ঠিক বোঝাতে পারবো না।

আমরা খুব জোর ৫।৬ পা মাচান থেকে এগিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ আমার ডানদিকে জঙ্গল থেকে মদ্দা বাঘটা জঙ্গল কাটিয়ে প্রাণ কাঁপানো গর্জন করে বিদ্যুতের মত আমাদের দিকে

ঝাঁপিয়ে পড়লো। এক পলকে কী যে ঘটে যাচ্ছে তার কোন আন্দাজ করে নেবাব আগেই—তেত্‌রা লাট্টুব মত ঘুরে সাংঘাতিক ভয়ে—"সাহাব জান গিয়া" চিৎকারে আমাকে সজোরে জাপ্‌টে ধরে ফেল্‌ল—তার বজ্র আঁটুনির মধ্যে আমিও প্রায় সম্বিত হারা হয়ে আটকা পড়লাম, ফলে বাঘের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমার রাইফেলটা আমার ডান কব্জিতে শক্ত হয়ে না উঠে ডান হাতেই ঝুলতে থাকল আর বাঁ হাতটাও নিশ্চল ঝোলা অবস্থায় রইল। তেত্‌রা আমার বুকে মুখ রেখে ভীষণ আতংকে আমাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, আমার আর কিছুই করবার ছিল না। শিকারীর ত বটেই যে কোন মানুষের পক্ষে এমন অসহায় এবং অস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় এমন দুর্বিপাকে পড়ার মত দুর্ভাগ্য আর নাই। অন্তিমের ইসারায় পথ চলতে থাকলে একমাত্র ভগবান ছাড়া বাঁচাবার ত কেউ থাকে না। কী ভাগ্য—তেত্‌রার ডান হাতে তিন সেলের টর্চটা বোতাম আটকান অবস্থায়ই জ্বালান ছিল, তার ডান হাতটা আমাকে জড়িয়ে আমার ডান পিঠের পিছনে টর্চটাকে মুঠিবদ্ধ করেই ধরা ছিল। আমি বাঘের গর্জনের সংগে সংগে ডানহাতির জঙ্গলের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখি, বাঘটা মরণ-বিভীষিকার মত এক মুহূর্তে এসে পড়ল! আমার মুখ তার মুখ থেকে তখন মাত্র সামান্যই তফাতে! তার বিরাট হাঁড়ির মত মাথাটা!! চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে রাগে জ্বলছে—ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলি বার করে সে আমাকে আক্রমণে উদ্যোগী! আমার অবস্থা যে কী তা আমার নিজেরই বোধগম্যের বাইরে। তেত্‌রার হাতে ধরা তিন সেলের টর্চের আলো সোজা বাঘের মুখের উপর গিয়ে পড়েছে—আর তেত্‌রা এই বিভীষিকা দেখেই তার যত শক্তি ছিল তার সবটা দিয়ে আমাকে ওর দু'হাত দিয়ে আরও কঠিন করে আঁকড়ে ধরেছে। আমার আর নড়বার চড়বার কোন উপায় নেই! অবশ্য আমার ডানহাত খালি থাকলেও আমি কিছু করতে

পারতাম বলে মনে হয় না। কারণ বাঘটা বিদ্যুতের মত তীব্র গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই মুহূর্তে আমার বীরের মতন দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তখন আমার মুখের কাছ থেকে সাক্ষাৎ যমের মুখ মাত্র হাতখানেক তফাতে !! কী ঘটে গেল জানি না, হঠাৎ যমরাজ তার বিভীষিকাময় মুখখানা ঘুরিয়ে গাঁক গাঁক করে আওয়াজ করতে করতে বিদ্যুৎবেগে আবার ডানহাতি জঙ্গলেই মিলিয়ে গেল! তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল কে যেন আমাকে কানে কানে বলে দিল, বাঘ যদি বিন্দুমাত্র টের পায় যে আমি ভয় পেয়েছি, তাহলে সে আবার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আমার মৃত্যু অনিবার্য। এই কথা আমার মনে হওয়া মাত্র আমি উন্মত্তের মত বীরদর্পে একটা বিকট চীৎকার করে উঠলাম, "এই কেয়া করতা—ছোড়, ছোড় দেও" বলেই এক ঝটকাতে তেত্‌রার হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নিয়ে রাইফেল বাগিয়ে টর্চের বোতাম টিপে ডানহাতি জঙ্গলের দিকে চেয়ে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ক্ষ্যাপামিতে ইংরাজীতে যত রকম গালি-গালাজ শিখেছিলাম, সবই বাঘটার উপর প্রয়োগ করতে লাগলাম। এ অবস্থাটা মানুষের একটা অস্বাভাবিক স্নায়ুর ক্রিয়া; মস্তিষ্কের কতকগুলি কোষ অতি বিপদ, অশান্তি, শোকে বা মর্মান্তিক কোন ঘটনায় বন্ধ বা নিশ্চল হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় মানুষ অনেক সময় বদ্ধ পাগলের মত ব্যবহার করতে থাকে। আমার রাইফেলে লাগান ছ'সেলের টর্চ বাতিটা ঘন অন্ধকার চিরে ডানহাতি জঙ্গলে যত ঝোপঝাড় ছিল সব আলোয় আলো করে তুলেছে, আর আমি এক অদৃশ্য শক্তিতে বীরদর্পে সেখানে দাঁড়িয়ে বাঘের প্রতি-আক্রমণের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি! কিন্তু কই? আশ্চর্য বাঘের তো দেখা নেই। আমি সামনের সব ঝোপঝাড়গুলো এবং যতদূর আমার বাতি গিয়েছে সব তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু আর কিছু দেখা গেল না। তখন ঝোপঝাড়ের দিকে

দৃষ্টি রেখে আমি চিৎকার করে তেত্‌রাকে বললাম—ক্যা তোম ডরতা হ্যায়। তোম জঙ্গল কা আদমী হো কর শেরসে এতনা ডরতা? ডরো মত। হাম শেরকো সামালেগা। তোম আস্তে আস্তে আগে বাড়কে হামকো রাস্তা বাতাও। তেত্‌রা ভয়ে জড়সড় হয়ে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিল। সে তখন আমার সংগে সেঁটে সেঁটে পা পা করে এগুতে লাগল আর আমি থেকে থেকে একটা পাগলের মত ইংরাজীতে যতরকম গালিগালাজ শিখেছিলাম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সেই সব গালিগালাজ করতে লাগলাম। কেন জানিনা আমার মনে হয়েছিল বাঘ যদি ঘুণাক্ষরে টের পায় আমরা ভয় পেয়েছি, তাহলে সে আবার আমাদের আক্রমণ করবে। বাঘ তার বাঘিনীর সামনে বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা করবেই, কারণ কোন পুরুষ জাতি স্ত্রীজাতির সামনে নিজেকে ছোট করতে চায় না। বাতির আলোতে আমি যদিও বাঘ বা বাঘিনী কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমি জানি তারা দুজনে আমাদের খুব কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে! যে কোনও মুহূর্তে আবার আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া কিছুই আশ্চর্য নয়। এই ভীষণ পরিস্থিতির মধ্যে মৃত্যুর খেলাতে আমি তখন দারুণ মেতে উঠেছি; আমার কোন অনুভূতিই তখন কাজ করছে না—ভয় নেই, ডর নেই—অনিবার্য মৃত্যুকে আমি তখন যেন হাসিমুখে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। বারবার বদ্ধ উন্মাদের মত ভীষণ চেঁচিয়ে বাঘকে আহ্বান করছি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য—বলছি 'আমি প্রস্তুত মৃত্যুযুদ্ধের জন্য, হয় আজ তোমার মৃত্যু, নয়তো আমার। সাহস থাকে তো বেরিয়ে এস'—এমনি করে ছ'সেলের টর্চটা সমেত ভারী রাইফেলটা সামনে ধরে, টর্চ জ্বেলে, কাঁটা পাথর নালা বাঁচিয়ে তেত্‌রাকে নিয়ে একটু একটু করে ওখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলাম। এইভাবে যে কতক্ষণ কেটেছে জানিনা, মনে হয় যেন এক যুগ ধরে আমি সাক্ষাৎ যমের সংগে লড়াই করে চলেছি। যাই হোক এক অবর্ণনীয় উত্তেজনায় পরিশ্রান্ত

হয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা দুজনেই অক্ষত শরীরে সেই গভীর জঙ্গল ও সাক্ষাৎ যমের মুখ থেকে কোনরকমে বেঁচে সেই ফাঁকা মাঠটার ধারে এসে পেঁছিলাম, যেখান থেকে বাঘটা মোষটাকে মেরে নালার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ওখান থেকে আমাদের বাংলো তখনও ৬।৭ মাইল পথ! সমস্ত পথটাই গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে! তেত্‌রার হাতের তিন সেলের টর্চটার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে আসছে—বাতির আর তেজ নেই বললেই হয়, লাল হয়ে সামান্য একটা প্রদীপের মত জ্বলছে। এদিকে আমার হাতের সাড়ে চৌদ্দ পাউণ্ডের ভারী রাইফেল উঁচু করে ধরে পথ দেখে চলাও খুবই কষ্টকর ব্যাপার। অল্পক্ষণের মধ্যেই তেত্‌রার টর্চটা জবাব দিল আর সে জ্বলবে না। ঘন চাপ অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাক্‌দণ্ডি (জঙ্গলের পায়ে চলা পথ) ধরে আমরা খুব সাবধানে বাংলোর দিকে এগুতে লাগলাম। এক একটা বাঁকে ঐ ঘন চাপ অন্ধকারের মধ্যে মনে হতে লাগলো যেন এক একটা জংলী হাতীর পাল দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে ভাবলাম বাঘের হাত থেকে কোনরকমে পৈতৃক প্রাণটাতো বাঁচালাম এবার বুঝি জংলী হাতীর পায়ের তলায় চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে প্রাণটা যাবে! এক একবার রাইফেলটা তুলে টর্চের বোতাম টিপে 'সার্চলাইটের' মত বাতি ঘুরিয়ে সামনে ও আশপাশ দেখে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম আর বাংলোর দিকে এগুতে লাগলাম। সেই বিপদসঙ্কুল রাত্রিতে ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে এইভাবে আমরা যখন বাংলোতে এসে পেঁছিলাম, তখন রাত দু'টো বেজে গেছে। আমার দুই বন্ধু তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি জাগালো—ভাবলাম এদেরকে না জানিয়ে যদি ঘরে গিয়ে ঘুমাতে পারি তাহলে সকালে উঠে ওরা আমায় ঘরে দেখে খুবই অবাক হবে। আমি সেই চেষ্টায় বাবুর্চিখানা থেকে একটা বড় ছুরি ও একটা লোহার শিক নিয়ে এসে তার সাহায্যে কোনরকমে

সামনের খাবার ঘরের দরজা খুললাম—ওরা দুজনে কিছু টের পেল না। ঘরে গিয়ে রাইফেল টর্চ ও শিকারের জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ে বিভীষিকাময় সমস্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাটা ভাবতে লাগলাম কেন বাঘটা আমাকে কিছুই না করে ফিরে গেল! আর আমিই বা ওই সময় সাক্ষাৎ যমরাজকে দেখেও এতটুকু ভয় না পেয়ে, একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে ওই পরিস্থিতিতে ঠিক ঠিক যা করার দরকার ছিল তাই বা করলাম কি করে! একি আমি নিজে করলাম! আমার কি সত্যিই এতখানি সাহস ছিল? না কোন ঐশ্বরিক শক্তি আমাকে দিয়ে এত সব করালো আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। যেভাবে প্রত্যেকটি ঘটনা পলকে পলকে একটার পর একটা ঘটে গেল তাতে স্বাভাবিক অবস্থায় আমার শত সাহস ও শত বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ঠিক সে সময়ে হয়তো আমি কিছুই করতে পারতাম না। বাঘ এক পলকে আমার মৃতদেহটা টেনে নিয়ে যেতে পারতো। তেত্‌রার টর্চই যদি আমার অবধারিত মৃত্যু থেকে বাঁচাবার সত্যিকারের কারণ হয়, তাহলে তেত্‌রাকেই বা কে সাহায্য করলো টর্চের বোতামটা আটকে রাখার জন্য? ভয়ে সে যে রকম ঘাবড়ে গিয়েছিল তাতে তার পক্ষে তখন টর্চটা নিবিয়ে ফেলা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তেত্‌রা ঘাবড়ে গিয়ে আমার বুকে বুক দিয়ে সাপের মতন জড়িয়ে ধরেছিল বলেই তার ডান হাতের টর্চটা আমার ডান পিঠের পেছনে গিয়ে পৌঁছেছিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘও তার শত্রুকে চরম শিক্ষা দেবার জন্য বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থায়ই টর্চের তীক্ষ্ণ আলো তার চোখে মুখে গিয়ে পড়ে আর তাইতেই সে ধাঁধিয়ে যায়। এটা অত্যন্ত সত্যকথা ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক অবস্থায় যে ঘটনাগুলো ঘটলো, তাতে আমার বা তেত্‌রার কোন কৃতিত্ব নেই। এ সবই আমরা যন্ত্রের মত করে গেছি—নিশ্চয়ই কোন ঐশ্বরিক শক্তি আমাদের দিয়ে করিয়েছেন। ঠিক এই ধরনের শক্তির

সাহায্য শিকারী জীবনে আমি বহুবার অনুভব করেছি—ভীষণ ভীষণ বিপদের সময়; কিন্তু আজও জানি না তাঁর এই করুণা আমি কেন পেয়েছি বার বার। এই সব ভাবতে ভাবতে ক্লান্তিতে আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

সকালে আমার তুই বন্ধু নাকি আমার নাক-ডাকার শব্দ শুনে অবাক হয়ে ছুটে এসেছিল আমার ঘরে। ওরা তুজনে আমাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলো—'ব্যাপার কি? তুমি কখন ফিরে এলে? বাঘ কি মারীতে আসেনি?' আমি শুনে একটা মস্ত বড় হাই তুলে বললাম—সব বলছি, আগে দতুকে চা দিতে বল, আমি ততক্ষণে হাতমুখ ধুয়ে আসছি। ওরা তো সব শোনবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে এসে চায়ের টেবিলে গত-রাত্রের ইতিবৃত্তান্ত সব বললাম। সব শুনে কুট্‌সের মুখ একটু কালো হয়ে গেল। আমি বললাম—মারী যদি বাঁধা থাকতো তাহলে গতরাত্রে আমি বাঘটাকে তো মারতামই, হয়তো কিছুক্ষণ পর বাঘিনীটাকেও মারতে পারতাম। যাই হোক আমাদের চা পর্ব শেষ হবার পর আমি কুট্‌স ও রেফিল্ডকে বললাম—আটটা বেজে গেছে, চলো একবার মারীটা দেখে আসি, কিছু পড়ে আছে কি না। যদি কিছু পড়ে থাকে তাহলে আজ একবাব শেষ চেষ্টা করে দেখা যাবে—কাল পরশুর মধ্যে তো আমাদের আবার ফিরতে হবে। কথা হতে হতে জামা কাপড় পরে আমরা সবাই রওনা হলাম। সেই খোলা মাঠটার মধ্যে গাড়ী রেখে খুব সাবধানে নিঃশব্দে আমরা মারীর দিকে গিয়ে দেখি বাঘ আর বাঘিনীতে মিলে মারীটার সবটাই খেয়ে ফেলেছে। আমি আন্দাজ করেছিলাম মারীর খানিকটা অংশ হয়তো পড়ে থাকতে পারে কিন্তু অবাক হলাম দেখে যে মারীটার কিছুই পড়ে নেই খালি শিং ও সামনের পায়ের খুর ছাড়া। 'তুটো বাঘে যে অতবড় মোষটাকে তুবারেই খেয়ে ফেলবে এ আমার ধারণার অতীত!

আমি সমস্ত জায়গাটা তন্ন তন্ন পরীক্ষা করে দেখলাম যে মদ্দা বাঘটা আমাদের পেছনে পেছনে মাঠের ধার পর্যন্ত এসে ফিরে গিয়ে মনের আনন্দে মারী খেয়েছে। তেত্‌রা আমার দুই বন্ধুকে সমস্ত জায়গাটা ভাল করে দেখালো—বাঘ যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন আমরা ঠিক কোনখানে ছিলাম, কেমন করে বাঘটা বিদ্যুতের মতন আমাদের দিকে তেড়ে এসেছিলো, সমস্ত ঘটনা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল সে কি রকম ভয় পেয়েছিল। বলছিল—আমি তো ভেবে-ছিলাম আজ নির্ঘাত আমরা দুজনেই বাঘের হাতে প্রাণ দেব। শেষ পর্যন্ত কি যে হোল কি করে যে আমাদের প্রাণ বাঁচলো সে একমাত্র ভগবানই বলতে পারেন। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সাহেব, আমরা জঙ্গলের লোক, কিন্তু এইরকম বিপদে আমাদের বাপঠাকুর্দাও কখনও পড়েছে বলে শুনিনি। ভগবান আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। সে বার বার হাত তুলে ভগবানকে প্রণাম জানাতে লাগলো। আমি তেত্‌রাকে বললাম— আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। তাড়াতাড়ি আমার মাচান 'সিটটা' খুলে ফেল—চলো আমরা বাংলোয় ফিরে যাই।

আমরা যখন কুমাণ্ডির বাংলোতে ফিরলাম তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। বাংলোতে ঢুকেই দেখি আবদুল মিঞা বাবুর্চিখানায় বসে দতুর সংগে কথা বলছেন, আমাদের দেখেই উঠে একটা সেলাম করলো। গাড়ী থেকে নেমে তাঁর কাছে যেতেই সেলাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—'ক্যা সাহাব কাল রাত মে শের মারীপর নেহী আয়া?' আমি তখন তাকে গতরাত্রের সব ঘটনা বললাম। সে সব শুনে একটা খুব বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—'খোদানে আপকো জান বাঁচা দিয়া এ শয়তান কা হাঁত সে, না জানে আপ ক্যায়সে বঁচ্‌ গেয়া। থোড়া রোজ আগে হামারা এক গোখিয়ান (রাখাল)

কো মারা। ইয়ে শয়তান ৩।৪ আদমীয়োঁকো মার চুকা লেকিন খায়া নেহী। আদমীও সে ডরতা নেহী। আগর জরাসে চিল্লায়ে কি হাল্লা করে তব উয়ো মারী ছোড়কে গোখিয়ান কো মার ডালতা—ইয়ে এতনা বদমেজাজী শয়তান। না জানে ক্যায়সে আপকো জান বঁচ্ গেয়া। জরুর খোদাকা মেহেরবাণীসে আপকো জান বঁচ্ গেয়া।' আমি সব শুনে আবদুল মিঞাকে বললাম—কই গতকাল এর মেজাজ সম্বন্ধে আমাকে তো একটুও সাবধান করে দিলেন না? বুড়ো শুনে বললো—'আপ রাত কো মাচান সে উতরিয়েগা ইয়ে ক্যায়সে মেরা মালুম হোগা—যব জোড়া শের আপনা মারা পর হ্যায়? ইস্ শয়তান কো ম্যয় বহুত দিনোঁ সে দেখ রহা হুঁ—এতনা ভারী শের, এতনা বদমেজাজ আউর এতনাহি চালাক হাম কভী দেখা নেহী। এ আগর আদমী খানে লগেগা তো ইসসে বাচনা মুসকিল হ্যায়।' আমরা আবদুল মিঞাকে বাংলোতে এনে বসিয়ে দতুকে আমাদের সকলের জন্য চা দিতে বললাম। চা খেতে খেতে আবদুল মিঞার কাছ থেকে কুমাণ্ডির জঙ্গলের অনেক শিকার কাহিনী শুনলাম। লোকটি বেশ ভদ্র এবং রইশ বলে মনে হোল। লাতেহারে তার বেশ বড় বাড়ী আছে। তার পরিবারও বেশ বড়। সে জঙ্গলেই বেশির ভাগ সময় থাকে, গাই-ভইসের দুধ থেকে ঘি করে সে শহরে চালান দেয়। আবদুল মিঞা চলে গেলে আমরা যে যার স্নান করে খেতে বসলাম। খাওয়ার টেবিলে সেই শিক্ষানবীশ অফিসার ভদ্রলোকও ছিলেন। তাঁকে আমরা এ ক'দিন আমাদের সংগেই চার বেলা খাওয়াচ্ছি। খাওয়ার টেবিলে আমাদের ঠিক হোল, আগামী কাল সকালে প্রাতরাশ সেরে রওনা হবো—এখানকার পর্ব শেষ। ভদ্রলোকটিকে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম তিনি ওখানে আর কতদিন থাকবেন? কারণ আমরা পরের দিন সকলেই চলে যাচ্ছি। তিনি বললেন—'দেখি হয়তো আমাকে আরও এক আধদিন এখানে থাকতে হতে পারে।

আপনারা থাকাতে আমার খুব সুবিধে হয়েছিলো—আপনারা কত আদর যত্ন করে এ'কদিন আমাকে খাওয়ালেন। আমি আপনাদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।' আমি শুনে বললাম—না না ওকথা বলছেন কেন? আমরা আর এমন কি করতে পেরেছি। আপনাকে পেয়ে আমাদেরও খুব ভাল কাটলো। যাই হোক আপনার কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, যা আপনি নিজেই দেখে ও শুনে গেলেন তা আপনি ওপর মহলে যথাযথ জানাবেন—যাতে অতঃপর শিকারীরা এরকম বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পায়। আমরা কষ্ট করে শিকারে এসেছি। জ্ঞানতঃ বনবিভাগের কোন আইন ভাঙ্গিনি। চিরকাল আমরা শিকারটাকে একটা ভাল 'স্পোর্টস' হিসাবেই নিয়েছি—খালি জন্তুজানোয়ারদের মারাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অথচ এই ক'দিনে আমাদের রেঞ্জার সাহেব অকারণে কত রকমের বাধা ও অশান্তির সৃষ্টি করলেন—খালি আমাদের একমাত্র অপরাধ যে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁর সংগে দেখা করে সেলাম করে আসতে পারিনি—এই সামান্য অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য বুড়ো চৌকিদার অসুস্থ অবস্থায় মিথ্যা বলতে পারবে না বলায় অহেতুক মার খেলো। আপনি যদি পারেন, আমাদের এই দুর্ভাগ্যের কথা বনবিভাগের অফিসে জানাবেন। তিনি সব শুনে বললেন যে তিনি নিশ্চয়ই জানাবেন। এঁর সামনেই কুট্‌স বলে বসলেন তাঁর সেই পুরাণো কথা—তিনি ফিরে গিয়েই চীফ কনসারভেটার-অব ফরেষ্টকে সমস্ত খুলে জানাবেন কারণ তিনি তাঁর বিশেষ বন্ধু। একথা যে রেঞ্জারের কানে গিয়ে বিষের কাজ করবে—সে জ্ঞান তার ছিল না। খাওয়ার পর ভদ্রলোকটি খানিক পরে তাঁর কাজে বেরিয়ে গেলেন। আমরা যে যার একটু বিশ্রাম করতে গেলাম। দতুকে বলে রাখলাম কাল সকালেই প্রাতঃরাশ সেরে আমরা রওনা হ'ব; ভোরে উঠে সে যেন তাড়াতাড়ি সব জিনিষপত্র গুছিয়ে ফেলার চেষ্টা করে, সকাল ৮টার মধ্যেই আমরা রওনা হতে চাই। রাত্রে খাওয়ার

টেবিলে বনবিভাগের ভদ্রলোকটি জানালেন তিনিও আগামীকাল সকালে ফিরে যাবেন এবং আমরা যদি তাঁকে লাতেহারে নামিয়ে দিই তাহলে খুবই ভাল হয়। আমরা বললাম—নিশ্চয়ই তিনি স্বচ্ছন্দে আমাদের সংগে লাতেহার যেতে পারেন তাতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। খাবার পর কিছু গল্প হলেও জমল না, শুতে গিয়ে ঘুমও এলো না। এপাশ ওপাশ করে আমাদের এবারকার সফরের একটা হিসাব টেনে চলেছি—সব মিলিয়ে শুধু হত-আশা, প্রচণ্ড দুর্ভোগ আর একটানা পরিতাপের অঙ্কটাই উঠে এলো। বিড়াল জাতের মধ্যে আকারে সব চেয়ে বড়, হিংস্র ও তড়িৎ গতির অধিকারী এক শক্তিশালী গোষ্ঠির এই বাঘ কত রকম ধোকা দিতে যে অভ্যস্ত তা দেখলে অবাক হ'তে হয়। নানা রকম পশু-পাখীর ডাক সে অবাধে এমন ভাবে নকল করে যেতে পারে যা শুনে কিছুতেই বুঝতে পারা যায় না—সত্য কি মিথ্যা। গতিতেও সে নানা রকম চাল দিয়ে শিকারীকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে দেয়। অতি সাবধানী বা শয়তান লোক সম্পর্কে কথায় বলে—লোকটা কী ঘুঘু—কিন্তু বাঘ যে কতবড় ঘুঘু তার তুলনা হয় না। দরকার বোধ করলে সে নানা রকম আওয়াজ তুলে আসবে—আর শয়তানির ফিকির খুঁজলে সে একেবারে নিঃশব্দে যেন হাওয়ায় উড়ে চলে আসবে ঃ তার কত রকম পরিচয়ই ত আমি পেয়েছি। মনে পড়ল একবার মধ্যপ্রদেশের কাবীরচবুত্রা সুটিং ব্লকে আমার বন্ধু কুট্‌সের সংগে শিকারে গিয়েছিলাম। ২।৩ দিন হয়ে গেছে শিকারের কোন হদিশ করতে পারিনি। মনমেজাজ খুবই খারাপ। দুই বন্ধুতে চা খাচ্ছি আর আলোচনা করছি যে, গভীর জঙ্গলে এসেও শিকারের কোন হদিশ করতে পারছি না। এমন সময় পাহাড়ের নীচু থেকে একটা লোক বাংলোতে এসে চৌকিদারকে দিয়ে আমাদের জানাল—'তাদের একটা বলদ আজ শের, মারী করেছে।' তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে আমাদের বাংলো থেকে ৭।৮ মাইল দূরে

জগৎগোয়ারা গ্রামে পাহাড়ের কোলে, একটা সাদা বলদ আজ দুপুরে বাঘে মেরেছে এবং মারীটা পাহাড়ের ঢালে পড়ে আছে। লোকটাকে ২ টাকা বকশিস দিয়ে বললাম—তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ২।১ জন লোক নিয়ে মারীর কাছাকাছি একটা গাছ দেখে তোমাদের একটা খাটিয়া নিয়ে চারটে পায়া উপর দিকে করে বাঁধ। আর খাটিয়ার চারটে পায়াতে দড়ি বেঁধে তাতে কিছু ডালপালা ঝুলিয়ে দিও যাতে পর্দ্দার কাজ করে। আমার বন্ধু কুট্‌সের তখন শরীর খারাপ আরম্ভ হয়েছে সেই অজুহাতে আমাদের সংগে যেতে রাজী হ'লেন না। আমি ও চৌকিদার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রওনা হ'লাম। বরাবর ঢাল বেয়ে আমরা খুব সাবধানে পাহাড়ের নীচে নেমে চলেছি—একটু পিছলে পড়লেই আর রক্ষে নেই, কয়েক হাজার ফিট নিচে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে পড়বো। আমরা যখন জগৎগোয়ারা গ্রামে গিয়ে পেঁাছলাম তখন সন্ধ্যে ৭টা বেজে গেছে। বেশ অন্ধকার। কিন্তু যে লোকটাকে মাচান বাঁধার জন্য বকশিস দিয়েছিলাম তার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। চৌকিদার গ্রামের লোকেদের সাহায্যে একটা খাটিয়া নিয়ে এবং দু একটা মশাল জ্বেলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে মারীটার দিকে এগুল। এইভাবে যাওয়াতে আমার খুবই আপত্তি ছিল কারণ এত রাত্রে লোকজন নিয়ে মশাল জ্বেলে মারীর কাছে গিয়ে মাচান বাঁধতে দেখলে বাঘ কখনই তার মারীতে আসবে না। কিন্তু উপায় কি? এত কষ্ট করে ৭।৮ মাইল এসেছি ফিরে যাবার কথা ভাবতেই আমার মেজাজ খিঁচড়ে যাবার জোগাড়। এই অন্ধকারে দুর্গম খাড়াই পাহাড় আর ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। গ্রাম থেকে যতই আমরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠছি মারীর দিকে, ততই চোখে পড়েছে বিরাট বড় বড় ঘন সেগুন ও শাল গাছের জঙ্গল—সময়টা ছিল মার্চ মাসের শেষের সপ্তাহ। বড় বড় শুকনো সেগুন ও শাল পাতাতে জঙ্গল ছেয়ে গেছে। শুকনো

পাতা জমে এক হাতের থেকেও বেশী উঁচু হয়ে আছে। শুকনো পাতা মাড়িয়ে যখন মারীর দিকে যাচ্ছি তখন মনে হচ্ছে নিস্তব্ধ জঙ্গলে যেন একপাল হাতী দাপাদাপি করে চলেছে। হাজার সাবধানতা সত্ত্বেও আমরা বিনা আওয়াজে এক পাও এগুতে পারছি না। গ্রাম থেকে প্রায় দেড় দু মাইল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার পর আমরা মারীর কাছে পৌঁছলাম। টর্চটা জ্বালিয়ে দেখলাম মারীটা বাঘের। সময় নষ্ট না করে কাছাকাছি একটা গাছ বেছে তাতে কোনরকমে খাটিয়াটা বাঁধলাম। লোকদের বললাম তারা যেন সকাল আটটার সময় ওখানে এসে আমাদের মাচান থেকে নামায়। মাচানে বসে ভাবলাম বাঘ যত সাবধানেই আসুক না কেন আমরা আওয়াজ পাবই পাব। মাচানে বসলাম প্রায় রাত দশটায়। রাত ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভরা। খাটিয়াতে বসেই বুঝলাম সারারাত আমাদের কপালে অনেক দুর্গতি আছে। ছোট্ট খাটিয়া—তার দড়িগুলো এতই ঢিলে যে আমরা বসতেই গুড়ের কলসীর মত অবস্থা হয়ে দাঁড়াল আর আমরা দুজনে সেই গর্তের মধ্যে নড়নচড়নবিহীন হয়ে আটকে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের শরীরের নিচের দিকে রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে সমস্ত নিচের দিকটা অসাড় হয়ে এল। ঘণ্টা খানেক পর মারীটার কাছে শুকনো পাতার উপর খড় খড় আওয়াজ শুনতে পেলাম। বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে স্নিগ্ধ চাঁদের আলো মারীটার উপর পড়েছে তাতে সাদা মারীটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আওয়াজটা কিসের জানবার জন্য অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর বুঝলাম একটা টিকটিকি বা গিরগিটি শুকনো পাতার উপর কোন পোকামাকড় ধরবার জন্য একটু নড়াচড়া করাতে এত আওয়াজ হচ্ছে। রাত ১২টার পর আস্তে আস্তে জঙ্গলে অন্ধকার নেমে আসতে লাগলো। রাত ২½/৩টে নাগাদ মাচানের ঠিক পেছন দিকে ৫০।৬০ গজ দূরে একটা বলদ ডাকার আওয়াজ পেলাম—বঁঙ-বঁঙ-বঁঙ। এই গভীর জঙ্গলে এত রাত্রে বলদ ডাকার

শব্দ! আমার কেমন খট্‌কা লাগলো। মনে পড়ল বাঘ অনেক রকম জন্তু জানোয়ার এবং পাখীর আওয়াজ পর্যন্ত অনুকরণ করতে পারে—এ নিশ্চয়ই বাঘের কারসাজি! চৌকিদারও সেই সময় আমার গা টিপে একটু ইশারা করলো এবং যা কিছু সন্দেহ ছিল তা চৌকিদারের ইশারাতে ঘুচে গেল। আরও ১৫।২০ মিনিট পর ঠিক সেই জায়গা থেকেই বাঘ বলদের আওয়াজ অনুকরণ করলো—বঙ্‌···বঙ্‌···বঙ্‌। তারপর সব চুপ! আমার মনের মধ্যে তখন নানা চিন্তা ঘোরপাক খেতে লাগল। এই অন্ধকারে বাঘ মারীতে আসলেও আসতে পারে কিন্তু যদি আসে তাহলে যেমন ভাবে বসেছি তাতে আমি তো গুলি চালাতে পারবো না। রাইফেলটা হাতে তোলার সময় খাটিয়া থেকে আওয়াজ হতে পারে। নিশুতি জঙ্গলে ওই আওয়াজই বাঘের পক্ষে যথেষ্ট। সে তখন কর্পূরের মত উবে যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে ৩০।৪০ মিনিট বোধহয় কেটে গেছে। হঠাৎ আমি চম্‌কে উঠলাম, আমাদের মাচানের ঠিক নীচে কখন যে বাঘটা এসেছে আমরা কোনরকম টেরই পাইনি। সে আমাদের মাচানের ঠিক নীচে এসে বার তিনেক হাঃ-হাঃ-হাঃ করে নিঃশ্বাসের মত আওয়াজ করে আমাদের একেবারে বোকা বানিয়ে দিল! অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এ কী করে সম্ভব? চারপাশে এত শুকনো পাতা, একটা টিকটিকি চললে মনে হয় যেন হাতী চলেছে আর বাঘ এই ভারী শরীর নিয়ে কি করে হাওয়াতে মাচানের তলায় এ'ল! একটা আওয়াজ পর্যন্ত পেলাম না! যেন ভোজবাজী! তারপর সব নিঝুম নিস্তব্ধ! তার আসা যাওয়া টেরই পেলাম না। আস্তে আস্তে ভোর হয়ে গেল। এই সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

সকালে উঠে আমরা যখন জিনিষপত্র গোছাগুছি করতে ব্যস্ত, সেই সময় খাকি পোষাক পরা একজন লোক এসে বনবিভাগের ভদ্রলোকটির সংগে দেখা করে চুপি চুপি কি যেন বললো—তারপরেই

ভদ্রলোকটি হঠাৎ আমাদের বললেন—'আমি এখনই হাঁটাপথে লাতেহার চলে যাচ্ছি। আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে।' শুনে অবাক হয়ে বললাম—হাঁটাপথে লাতেহার যেতে যে আপনার অনেক সময় লাগবে। আমরা তো আর খানিক পরেই এখান থেকে রওনা হ'ব। আপনি আমাদের সংগে চলুন। জবাব দিতে গিয়ে তিনি আর আমাদের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারলেন না। মুখ নীচু করেই বললেন—'আমাকে মাপ করবেন—আমি এখুনি রওনা হচ্ছি।' বলেই তিনি আমাদের সকলের সংগে হাত মিলিয়ে চলে গেলেন। ব্যাপারটা আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না অথচ একটা অস্বস্তি হতে লাগল। যাহোক আমরা জিনিষপত্র গুছিয়ে গাড়ীর ট্রেলারে বোঝাই করে চা ও খাবার খেয়ে ঠিক আটটার সময় রওনা হলাম। রওনা হবার মুখে বুড়ো চৌকিদারকে বকশিস দেওয়ায় বুড়ো হাঁউ মাউ করে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো—'সাহেব আপনারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আপনাদের কাছে আমি চিরকাল গোলাম হয়ে থাকবো। রেঞ্জার সাহেব আমায় যতই মারুন না কেন আমি কোনোদিনই আপনাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারবো না। রেঞ্জার সাহেব বেশী জুলুম করলে চাকরী ছেড়ে দেব সো ভী আচ্ছা কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারবো না।' তেত্‌রা ও তার তিন সংগীকেও খুশী করে বকশিস দিয়ে আমরা রওনা হলাম।

আমাদের গাড়ী বাংলোর ফটক পেরিয়ে খুব জোর দশ বার হাত এসেছে এমন সময় একটা লরী এসে আমাদের গাড়ীর রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়ালো। দেখলাম লরীর সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে একজন পুলিশ দারোগা এবং তাঁর পাশে খাকি পোশাক পরা একজন ভদ্রলোক। আন্দাজ করলুম খাকি পোশাক পরা ভদ্রলোকই ওখানকার রেঞ্জার, লরীর পেছনে দেখি দু'জন পুলিশও দাঁড়িয়ে এবং সংগে সেই বনবিভাগের পাহারাদারটা, যে সম্বর মারার পরের দিন রেঞ্জার সাহেবের আদেশ নিয়ে এসেছিল। দারোগা সাহেব নেমে

এসে আমাদের বললেন—'বনবিভাগ থেকে আপনাদের নামে কতকগুলি বিশেষ অপরাধের জন্য অভিযোগ করা হয়েছে পুলিশ বিভাগে। আমি লাতেহার থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। আপনারা বেআইনিভাবে যে সম্বরটি মেরেছেন তার চামড়া ও সিং বাজেয়াপ্ত করা হোল। আপনারা এখনই ওগুলো আমাকে দিয়ে দিন।' আমরা শুনে তো অবাক। আমি দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাদের নামে কি কি অভিযোগ আছে তা আমরা শুনতে পারি কি? তিনি বললেন—'নিশ্চয়ই'; তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পড়তে লাগলেন—(১) আপনারা রাত্রে 'স্পটলাইটের' সাহায্যে বেআইনিভাবে সম্বর মেরেছেন। (২) বনবিভাগের রেঞ্জার সাহেব যখন পাহারাদার পাঠিয়ে সম্বরটাকে বেআইনিভাবে মারার জন্য বাজেয়াপ্ত করতে পাঠান, তখন আপনারা তাকে বন্দুক দেখিয়ে গুলি করবেন বলে ভয় দেখান। (৩) সম্বরটি বাজেয়াপ্ত করতে দেন নাই। এক ঝুড়ি মিথ্যা শুনে আমরা ত হতবাক। পাহারাদারটাকে বললাম—তুমিই তো সেদিন সকালে এসেছিলে; তোমাকে তো আমরা বন্দুক দিয়ে ভয় দেখানোর বদলে নাস্তাপানি না করে ভোর রাত্রে লাতেহার থেকে ছুটতে ছুটতে হুকুম তামিল করতে এসেছিলে বলে পেট ভরে চা ও খাবার খাইয়েছিলাম। আর তুমিই বলছ যে আমরা বন্দুক দেখিয়ে গুলি করবো বলেছি? এ তো বড় অবাক কাণ্ড! এই সব শুনে লোকটা বেশ কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে রইল—লজ্জায় মুখ তুলতে পারলো না। বার কয়েক জিজ্ঞাসা করার পর সে রেঞ্জার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল—'হাঁ, আপনারা তো আমাকে বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখালেন।' শুনে আমাদের কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না খানিকক্ষণের জন্য। কী নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা—এও কি সম্ভব!

এতক্ষণ রামু ও দতু পুলিশ দেখে চুপ করে ছিল কিন্তু যখন পাহারাদারটা এই কথা বললো তখন তারা আর চুপ করে থাকতে

পারলো না। দুজনেই চিৎকার করে উঠল,—'এই বেইমান, এত মিথ্যা কথা বলতে তোর জিভ খসে গেল না? সাহেবরা তোকে চা ও খাবার খাওয়ালেন আর তুই বলছিস এঁরা তোকে বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছেন? তুই এত মিথ্যাবাদী বেইমান? এত মিথ্যা বলার জন্য তোর জিভ খসে যাবে দেখে নিস।' আমরা ওদের দুজনকে থামতে বলে দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, খাকি পোষাক পরা যে ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাষ্ঠহাসি হাসছিলেন, উনিই কি কুমাণ্ডির রেঞ্জার? দারোগা সাহেব বললেন—'হাঁ উনিই বনবিভাগের আইন অমান্য করার জন্য আপনাদের নামে থানায় অভিযোগ করেছেন।' শুনে বললাম—এ লোকটির বনবিভাগে রেঞ্জারী না করে ফৌজদারী আদালতে ওকালতি করা উচিত ছিল। উনি অনেক ভেবেচিন্তে আমাদের বিপদে ফেলার বেশ পাকা বন্দোবস্ত করেছেন দেখছি। উনি ভাল করেই জানেন আমরা সম্বরটা দিনের আলোতে মেরেছি। আমাদের বিপদে ফেলার জন্য বাংলোর বুড়ো চৌকিদারকে মিথ্যা সাক্ষী দেবার জন্য পীড়াপীড়িও করেছেন। বুড়ো চৌকিদার বেচারা দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাকে আমরা ওষুধ ও পথ্য দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করেছি। সে বেচারা নিমকহারামি করে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজী হয়নি, কারণ সে এই পাহারাদারটার মত বেইমান নয়। এই রেঞ্জার, বুড়োকে অন্যায় ভাবে সে রাত্রে বেশ মারধোর করে যান। আমরা ফি জমা দিয়ে বনবিভাগ থেকে শিকারের অনুমতি নিয়েই এখানে শিকার করতে এসেছি; আমাদের পারমিটে একটা সম্বর মারতে পারি একথা লেখা আছে এবং সম্বরটা যে মাদী নয় সেটা শিং দেখেই বুঝতে পারছেন। আমরা বাঘ শিকারের উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলাম—রেঞ্জার সাহেব আমাদের শিকার পণ্ড করার অনেক চেষ্টাই করেছেন। তিনি বেআইনিভাবে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আমাদের রিজার্ভ এলাকাতে সারারাত্র

মনের আনন্দে বন্দুক চালিয়ে শিকার করেছেন, তাতে আমাদের শিকার করাও পণ্ড হয়ে গেছে। এর ঠিক কারণটা যে কি আমরা তা বুঝলাম না। একমাত্র কারণ যা আমরা অনুমান করতে পারি তা হোল জঙ্গলে ঢোকার আগে আমরা তাঁকে সেলাম করে আসতে পারিনি।

দারোগাকে আদ্যোপান্ত যা যা ঘটেছিল সবই আমরা বুঝিয়ে দিয়ে বললাম যে—দেখুন, রেঞ্জার এই কুমাণ্ডিতেই ৩।৪ দিন যাবৎ বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘুরে ঘুরে শিকার করে বেড়াচ্ছেন অথচ প্রচুর চেষ্টা করেও তাঁর দেখা পাইনি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর সংগে আজ আমাদের এইভাবে প্রথম সাক্ষাৎ এবং তিনি মিথ্যার এক বিরাট আয়োজন করে আমাদের সংগে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। তাঁর মত একজন পদস্থ লোকের পক্ষে এটা খুবই অন্যায় হয়েছে। যাই হোক আমি যা যা বললাম তার প্রত্যেকটি কথা ধ্রুব সত্য। এই রেঞ্জার লোকটির স্বভাবে দেখছি তিনি দিনকে রাত বানাতে ওস্তাদ। দেখলাম সমস্ত ঘটনা শুনে দারোগা সাহেব বেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছেন, ঐ রেঞ্জার লোকটির নীচ মনোবৃত্তির জন্য। কিন্তু দেখলাম তিনি নিরুপায়, আমাদের অনুরোধ করলেন, আমরা যেন চামড়া ও শিং দিয়ে দিই এবং আমাদের যা কিছু বলার—তা যেন আমরা কোর্টেই বলি। এই কথা শুনে কুট্স তো প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—'কোর্টে?' দারোগা সাহেব বললেন—'হাঁ।' 'মাই গড' বলে কুট্স কপাল চাপড়াতে লাগলেন কিন্তু তখন আর তিনি সেই চীফ কনসারভেটর অব ফরেষ্টের পরিচয় তুলতে পারলেন না। আমি আর সময় নষ্ট না করে দতু আর রামুকে সম্বরের চামড়া ও শিং বার করে দিতে বললাম। দারোগা সাহেব সে সব নিয়ে চলে গেলেন।

ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা! শিকারের পারমিট নিয়ে ন্যায্যমত শিকার করেও—শিকার "ট্রফি" সম্বরের চামড়া ও শিং অন্যায়ভাবে হারাতে

হল। ক' ডজন অশ্লেষা ও মঘা মাথায় নিয়ে যে এই শিকার যাত্রা শুরু করেছিলাম জানি না। এক পঞ্চমাঙ্ক নাটকের শেষে আরেক পঞ্চমাঙ্ক নাটক জমতে শুরু করেছে, দেখে মনে হ'ল নানা দুর্ভোগ আরও আসছে ; এ যেন "ডবল শো"র ব্যাপার!

আমাদের গাড়ী ছাড়তেই কুট্‌স ভীষণ রাগারাগি করে বলতে লাগলেন, তিনি ফিরে গিয়েই তাঁর বন্ধু চীফ কনসারভেটর অব ফরেষ্টসকে চিঠি দেবেন—আরও সব কত কি। পথে আমি ও রেফিল্ড বললাম যে আমাদের উচিত লাতেহারে ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের সংগে দেখা করে সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে দেওয়া। শুনেই তো কুট্‌স পণ্ডিতের মত চেঁচিয়ে উঠলেন 'না—না—না', তাঁর যেখানে সর্বোচ্চ সরকারি কর্মচারীর সংগে বন্ধুত্ব, সেখানে আমরা তাঁকে চাপরাশির সংগে হাত মিলাতে বলছি কি করে? পরে দেখে নিতে তার একটা চিঠিতে কি হয়, তখন এসব লোক তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে পথ পাবে না। আমাদের কিন্তু এতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল ; তাই বললাম—ডিভিশনাল অফিসারই এই পুরো বিভাগটার হর্তাকর্তা। আপনার সংগে চীফ কনসারভেটার-অব-ফরেষ্ট-এর যতই ভাব থাকুক না কেন তিনি বড় জোর আপনার চিঠি পেয়ে এই অফিসারের কাছেই পাঠাবেন মতামতের জন্য এবং এই অফিসার কখনই তাঁর নীচের কর্মচারী এবং নিজের বিভাগের বদনাম এক বাইরের শিকারীর চিঠির জন্য উপর মহলে জানাতে চাইবেন না। রেফিল্ডও আমাকে সমর্থন করলো! তারও ইচ্ছে আমরা লাতেহারে নেমে আফিসারকে সব জানিয়ে যাই ; কুট্‌স কিন্তু রেগে গিয়ে বললেন, তিনি কখনই ওখানকার অফিসারদের সংগে দেখা করবেন না। তিনি একমাত্র চীফ কনসারভেটার-অব-ফরেষ্টসকে সমস্ত জানাবেন।

ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ী ঔরাঙ্গা নদীর ধারে এসে পৌঁছলো। এবারও গাড়ী নদীতে কিছুদূর চলে প্রায় হাঁটুজল হতেই তার

চলা বন্ধ করে দিল। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই—মোটর গাড়ী নদীতে চলার বাহন ত নয়—ওটা কেন নদী পার হতে চাইবে। কুট্‌সের মেজাজ খুবই খারাপ চলছে। তিনি আর গাড়ী ঠেলার জন্য নদীতে নামতে চাইলেন না। আমরা সকলে নেমে গাড়ী ও ট্রেলার কোনরকমে ঠেলাঠেলি করে নদী পার হয়ে আবার রওনা হলাম ও বেলা সাড়ে এগারটায় আমি লাতেহারে ফরেষ্ট অফিসারের বাংলোর সামনে এসে গাড়ী থামিয়ে দিলাম। গাড়ী থামাতে দেখেই কুট্‌স জিজ্ঞাসা করলেন—'এখানে কেন গাড়ী থামালে?' আমি বললাম—চলুন, আমরা অফিসারের সংগে দেখা করে সব কথা বলে যাই। শিকারের পারমিটে আপনার নাম প্রথমে আছে তার পরে আমার ও রেফিল্ডের, পুলিশ আপনার নামেই 'কেস্' করেছে। ব্যাপারটা যদি এইখানেই মিটিয়ে ফেলা যায় তাহলেই ভালো, নয়তো ভেবে দেখুন, এই 'কেস' লড়ার জন্য প্রতিবার আমাদের দু'শ দু'শ—চার'শ মাইল গাড়ী ছুটিয়ে আসতে হবে! কুট্‌সের ওই এক কথা; বলতে লাগলেন—'কেস লড়তে হয় লড়বো কিন্তু ওদের আমি কখনই তোষামদ করতে পারবো না।' রেফিল্ড আমার কথায় সমর্থন জানালো কিন্তু কুট্‌স নাছোড়বান্দা। মনে পড়ে গেল "ঘাড়ে মোর শনি আমি কারে গণি।" তিনি আমাকে গাড়ী ছাড়তে বাধ্য করালেন—অগত্যা আমি চালাতে শুরু করলাম। আমার মনটা কিন্তু বড়ই অশান্তিতে ভরে গেল—আমাদের কাজটা মোটেই ভাল হোল না। প্রায় একটার সময় আমরা চাঁদুয়ার ডাক বাংলোতে এসে পৌঁছলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম দুপুরের খাওয়া ওখানেই সেরে নেব, কিন্তু চৌকিদারের সংগে কথা বলে বুঝলাম ওখানে খাবার জোগাড় করে বানিয়ে খেতে অনেক সময় লেগে যাবে। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল আমরা রাঁচির কোন দোকান থেকে খেয়ে ও রাত্রের জন্য কিছু খাবার নিয়ে সারারাত গাড়ী চালিয়ে ফিরে আসব আমাদের

আসানসোলের আস্তানায়। এই ভেবে রাঁচির পথে রওনা হয়ে আড়াইটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম রাঁচিতে। সেখানে খাওয়া দাওয়া সেরে রাতের খাবার নিয়ে রওনা দিতে বিকেল চারটে বাজলো। সারারাত গাড়ী চালিয়ে পরের দিন ক্লান্ত হয়ে সকাল আটটায় আমরা সব ফিরে এলাম। ঘটনার বেগ যেখানে শেষ হবার নয় সেখানে জোর করে ত বন্ধ করা যায় না। দুর্যোগের বন্যা ত কেউ কখনও রোধ করতে পারে নি।

এর পরে যা আরম্ভ হ'ল তা যেমন মর্মান্তিক তেমনই লজ্জাদায়ক। আমরা কুমাণ্ডির শিকার পর্ব শেষ করে একটু গা-হাতের ব্যথা ছাড়াচ্ছি, আর দৈনন্দিন জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যের চায়ের আসরে বসে বন্ধু বান্ধবদের কাছে আমাদের অভিশপ্ত অভিজ্ঞতার গল্প করছি, এমন সময় লাতেহার কোর্ট থেকে কুট্সের নামে এক শমন এসে হাজির। তাকে অমুক তারিখে সকাল দশটার সময় লাতেহার কোর্টে হাজির হতে হবে, অন্যথায় তাকে যথারীতি শাস্তি দেওয়া হবে। কুট্স কিন্তু ফিরে এসেই সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে তাঁর বন্ধু চীফ কনসারভেটার-অব-ফরেষ্ট্স কে চিঠি দিয়েছিলেন এবং দেখা হলেই বলতেন—'এবার দেখে নিও কুমাণ্ডির রেঞ্জারের কি অবস্থা হয়। তাকে উচিত শিক্ষা না দিয়ে আমি আর ছাড়ছি না। কিন্তু লাতেহার কোর্টের শমন পেয়েই তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। আমাকে টেলিফোনের ওপর টেলিফোন আমি যেন তার সংগে তক্ষুণি দেখা করি—বিশেষ জরুরী দরকার। টেলিফোন পেয়ে ছুট্তে ছুট্তে গিয়ে হাজির—গিয়ে দেখি তিনি মুখ কালো করে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, সামনে লাতেহার কোর্টের শমনটা খোলা রয়েছে। আমি যেতেই তিনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—'দেখো, আমার নামে শমন পাঠিয়েছে লাতেহার কোর্টে হাজির হবার জন্য। এখন কি করা যায়? আমার বন্ধু বোধ হয় চিঠি পায়নি! আমি তো কিছুই বুঝছি না। লাতেহার কোর্টে হাজির হওয়া কি চারটিখানি

কথা ? ট্রেনে গেলে দেড় দুদিন যেতেই লাগবে তারপর লাতেহার স্টেশন থেকে কোর্ট ৪।৫ মাইল দূর। স্টেশন থেকে কোর্টে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনও ব্যবস্থা নেই। ট্রেনও ২৪ ঘণ্টায় সকালে একটি প্যাসেঞ্জার যাবার আর রাত্রে আরেকটি প্যাসেঞ্জার ফেরার। তার মানে প্রতিবার কোর্টে হাজরী দেবার জন্য আমাদের ৪।৫ দিনের ছুটি নিয়ে এই কষ্ট করে যাতায়াত করতে হবে। কোর্টে হাজরী দিয়ে হয়তো শুনবো আজ 'কেস' হবে না। আবার দিন ফেলা হচ্ছে ১০।১৫ দিন পর—তারপর আবার হাজরী দিতে হবে। এইভাবে আমরা কতদিন কোর্টে কেস চালাতে পারবো জানি না।' যে ভয় পেয়েছিলাম—ঠিক তাই-ই হতে চলেছে। আমি শমনটা পড়ে বললাম—উপায় নেই—শমন যখন দিয়েছে তখন আমাদের কোর্টে হাজরী দিতেই হবে। এখন রেহাই পাবার একমাত্র পথ হোল ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার ও রেঞ্জারের সাথে দেখা করে অপরাধ স্বীকার করে যা কিছু দণ্ড দেবার তা দিয়ে 'কেস' মিটিয়ে ফিরে আসা। আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি তো তখন আমার কথা শুনলেন না। শুনে কুট্‌স তো চটেই লাল। তিনি মাথা নেড়ে বলে উঠলেন—'কখনই হতে পারে না—আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষী—কেন আমরা ওদেরকে বলতে যাব আমরা অপরাধী। যত অসুবিধাই হোক আমরা 'কেস' লড়বো, তুমি ওই সময় ছুটি নাও। আমরা দুজনে আমার গাড়ীতে যাব। 'কেস' আমাদের লড়তে হবে—তাতে যত অসুবিধাই হোক না কেন।' আমি মনে মনে ভাবলাম "গাধা সেই জলই খায় তবু সাতবার ঘোলায়"—আমাদের কপালে দুঃখ আছে—আমাদের তরফে একটা সাক্ষীও পাওয়া যাবে না। রেঞ্জারের ভয়ে কেউ আমাদের হয়ে সাক্ষী দিতে আসবে না। এমন কি হয়তো বুড়ো চৌকিদারও আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী দিতে পারে। সাক্ষী জোগাড় করাও খুব শক্ত। নির্দোষী হয়েও কোর্টে

আমাদের দোষ স্বীকার করতে হবে। এর থেকে আর দুঃখের কি আছে—কিন্তু উপায় কি ? শেষ পর্যন্ত আমাদের লাতেহার কোর্টে হাজির হবার দিন এলে আমরা দুই বন্ধু গাড়ী নিয়ে ছুটলাম প্রায় দু'শ মাইল পথ। ভোর রাত্রে চাঁদুয়ার ডাক বাংলোয় পৌঁছে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে সকালে উঠে স্নান করে চা ও সামান্য কিছু খেয়ে আমরা দশটার আগে লাতেহার কোর্টে ছুটলাম। বেলা বারটায় আমাদের খবর দেওয়া হোল সেদিন 'কেস' হবে না। দূর থেকে আমরা রেঞ্জারকে কয়েকবার দেখলাম—তার মুখে সেই শয়তানের হাসি। দশদিন পর আবার আমাদের 'কেসের' তারিখ পড়লো, শুনেই তো কুট্স গরম হয়ে উঠলেন কিন্তু উপায় কিছু নেই। বললাম—ফিরে চলুন, আমাদের কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে। আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে অফিসার ও রেঞ্জারের সাথে কথা বলে, অপরাধ স্বীকার করে, ওরা যা কিছু সাজা দিতে চায় তা মাথা পেতে নিয়ে ফিরে যাই—তাছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না। কথা শুনে কুট্স রেগে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠেই গাড়ী 'স্টার্ট' দিলেন। কী আর করি আমিও চুপচাপ গাড়ীতে গিয়ে বসলাম এবং দু'শ মাইল গাড়ী চালিয়ে আবার ফিরে এলাম। মেমসাহেব সব কিছু শুনে আমার বন্ধুর উপর খুব রাগ করলেন এবং আমি যে ভাবে কেস্‌টা মেটাতে চেয়েছিলাম ওই ভাবেই কেস্‌টা মিটিয়ে ফেলা উচিত ছিল বললেন। কুট্স মুখ কালো করে বসে রইলেন। তাঁকে আবার বোঝালাম—আমরা যদি ফেরার মুখে ওই অফিসারের সংগে দেখা করে সমস্ত বলে তাঁর সাহায্য চাইতাম তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি সংগে সংগে রেঞ্জারকে ডেকে তার এই অন্যায়ের জন্য কিছু বলতে পারতেন—হয়তো আমরা সেই সংগে সম্বরের চামড়া ও শিং ফেরৎ পেয়েও যেতে পারতাম—এই অকারণ হ'য়রানিও হোত না।

আবার দশদিন পর আমাদের লাতেহার যেতে হোল। এ ক'দিনে

কুট্সের হম্বিতম্বি একেবারে চলে গিয়ে খুবই নরম হয়ে পড়েছিলেন। আমরা চাঁহুয়া থেকে একটু সকাল সকাল রওনা হয়ে আগে রেঞ্জার ও পরে ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের সংগে দেখা করে আমাদের হুরবস্থার কথা জানিয়ে বললাম—আমাদের পক্ষে চার'শ মাইল গাড়ী ছুটিয়ে কোর্টে 'কেস' করা অসম্ভব। আমরা 'কেস' লড়তে চাই না। আমাদের যা কিছু সাজা আপনারা দিতে চান দিন—আমরা তাতেই রাজি। রেঞ্জার বিজয়ীর বক্রহাসির মধ্যে দিয়ে আমাদের বারকয়েক জানিয়ে দিলেন যে শুধু পয়সা খরচ করে 'পারমিট' জোগাড় করে শিকার করতে এলেই হয় না। বনবিভাগের সামান্য একজন পাহারাদারও ইচ্ছা করলে আপনাদের মত অনেক সাহেবকে জেলে পুরে দিতে পারে। যাই হোক কুট্স ও আমি বেশ খানিকক্ষণ খোশামোদ ও অনুরোধ করার পর রেঞ্জারের বোধ হয় একটু দয়া হোল। তাঁর হুকুম মত ৫০ টাকা জরিমানা দিয়ে তাঁরই তৈরী করা সব অপরাধ মাথা পেতে নিয়ে আমরা মুখ হু'টি নীচু করে সে যাত্রায় উদ্ধার পেলাম। সাংঘাতিক হুই যমের মুখ থেকে পৈত্রিক প্রাণটাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি বলে কুমাণ্ডির শিকার আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে ফিরেছি বলে আরও শিকারে যেতে পেরেছি। শিকার রোজনামচায় কি সাধে লিখে রেখেছিলাম—শুভদিনের নির্ঘণ্টের কথা।

সিনিয়র "ডবর" (ডবল) টাইগার

সিনিয়র "ডবর" (ডবল) টাইগার

চোরদিহা—গয়া জেলা

জুন ১৯৫৪

ছোট্ট তিন-চার বছরের একটি আহ্লাদি মেয়ের রাগ করে বলা, মনে দাগা দেওয়ার মত হু'টি কথা—"তুমি কিচ্ছু না—তোমার বন্দুক নেই—কিচ্ছু নেই"—আজও দীর্ঘ বাইশটি বছর পরে মনে পড়লে স্মৃতির বেদনায় মনটা মোচড় খায়।

১৯৫৪-এর ফেব্রুয়ারী মাস হবে—বার্ণপুরের এক বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ, নানা গল্পগুজব চলছে, এমন সময় হঠাৎ পাশের বাংলো থেকে গোলগাল আহ্লাদি ছোট্ট মেয়েটি ছুটে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বায়না ধরল—একটা বাঘের গল্প বল না। ওকে বোঝাতে হ'ল—বাঘ ত এখনও শিকার করতে পারি নি—করতে পারলে তখন বলব। কে কার কথা শোনে—আবদার, বায়নাক্কা, রাগের শেষ নেই—নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত মেয়েটির মা ওকে বকে উঠল—কেন বিরক্ত করছ। বাঘ যখন শিকার করতে পারবেন, তখন তোমাকে সেটা দেখাবেন—গল্পও করবেন—এখন চা খেতে দাও। গল্পের আবদার টিকল না বলে জলভরা চোখ করে চলে যাবার সময় বলে গেল ক'টি কথা—তুমি কিচ্ছু না, তোমার বন্দুক নেই—কিচ্ছু নেই।

মার্জার গোষ্ঠির এই হিংস্র ও অসম্ভব ধূর্ত বড় জাতটি শিকার করা যে কী কঠিন ব্যাপার তা সাধারণ লোকের জানার কথা নয়; শিকারী মাত্রেই জানেন এটি কী ধরনের কঠিন কাজ। বহু বছর অনেক জন্তু জানোয়ার শিকার করে হাত পাকিয়েছি, বহু রাত একা মাচানে বসে থেকেছি এই জাতের একটির জন্য নিষ্পলক চোখে, কিন্তু ঠিক শিকার করার মত অবস্থায় একটিকেও পাই নি। বলতে

বাধা নেই—সে দিনের ঐ সান্ধ্য আসরে ছোট্ট মেয়েটির কথাগুলি মনের মধ্যে শেল হয়ে বিঁধে আমাকে যেমন নিরাশ-চঞ্চল করে তুলেছিল তেমনই আত্ম অহঙ্কারে যেন হাতুড়ির ঘা পেয়েছিলাম : সত্যিই ত এতোদিন হয়ে গেল, শিকারে মেতে বছরের পর বছর কেটে গেল, অর্থও গেছে কম নয় কিন্তু বাঘ না মারলে যে শিকারীর মঞ্চে ওঠা যায় না—সম্মান আসে না তার হিসাব মিলিয়ে দিয়েছিল ঐ মেয়েটির ক'টি কথায়—তুমি কিচ্ছু না, তোমার বন্দুকও নেই—কিচ্ছু নেই। চায়ের পর বাড়ী ফিরে কিছুই ভাল লাগছিল না—রাত্রে ঘুমও এলো না। কেবল ঐ কথাগুলি মনের মধ্যে কচ্ কচ্ করতে লাগল।

এমনি এক মনের অবস্থায় বাঘ বাঘ করে আমি যখন আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করার জোগাড়, তখন সেই শিকারের এক আশার হাতছানিতে আমায় কোথায় নিয়ে ফেলেছিল—তার চমকপ্রদ এবং প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা আপনাদের বলবো মনে করছি।

একটা বাঘ মেরে নিজেকে শিকারীর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি তখন হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি। এমন সময় আমাদের ইস্পাত কারখানার কে, আর, বর্মনবাবু আমাকে বললেন—'চলুন আজ আপনাকে আমাদের মনসুর চাচার সংগে আলাপ করিয়ে দিই। চাচার বাড়ী গয়া জেলাতে। সে খুব ছোটবেলাতেই বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছে এবং এখন সে একজন খুব নামকরা শিকারী। গয়া এবং হাজারিবাগ অঞ্চলের সব বাঘের খবরই নাকি তার জানা আছে।' বর্মনবাবু মনসুর চাচার সংগে আলাপ করিয়ে দিলেন এবং তাঁর কয়েকটি দুঃসাহসিক শিকার কাহিনী শুনে আমি তো মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। চাচাকে অনুরোধ করলাম যত তাড়াতাড়ি পারেন তিনি যেন আমার জন্য একটা বাঘ শিকারের ব্যবস্থা করে আমাকে নিয়ে যান। শিকারের পারমিট ও আনুসঙ্গিক খরচ বাবদ কিছু টাকা চাচার হাতে আগাম দিয়ে এলাম, এবং

তারপর থেকে আমার প্রতীক্ষার পালা শুরু হোল। দিন যায়, মাস যায়, কিন্তু না মনস্থুর চাচা না তার শিকারের ব্যবস্থা—কোন কিছুরই হদিস পাওয়া গেল না। আমি মধ্যে মধ্যে বর্মনবাবুকে তাগাদা দিই—কোথায় গেল আপনার চাচা ? আমার শিকারের কি ব্যবস্থা করলেন ? আমি'ত কোন খবরই পাচ্ছি না।

যাই হোক, এইভাবে বেশ কয়েক মাস যাবার পর একদিন বর্মনবাবু এসে আমায় জানালেন যে চাচা নাকি আমার বাঘ শিকারের সব ব্যবস্থা করেছেন। খবরটা শুনে আমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। কোথায়, কবে, কোন জঙ্গলে ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করে যা বুঝলাম, তা হোল গয়া জেলার চারদিকে পাহাড় ও গভীর জঙ্গলে ঘেরা চোরদিহা বলে একটা ছোট্ট গ্রামে একটা বড় কেঁদো বাঘ ভীষণ অত্যাচার করছে। সেই গ্রামের মাহাতো (মোড়ল) "শোর মাহাতো"—বনোয়ারী বলে এক রেলের সুইপারের মাধ্যমে চাচার কাছে এই খবর পাঠিয়েছে। কেঁদো বাঘটি নাকি সে গ্রামের গরু মোষ সব প্রায় মেরে শেষ করে ফেলেছে। আসানসোল থেকে ট্রেনে গয়া যেতে 'দিলুয়া' বলে একটা ছোট ফ্ল্যাগ স্টেশন পড়ে। দিলুয়া স্টেশনের ডানদিকের ঢাল দিয়ে নামলে শ'খানেক গজের মধ্যে কয়েকটা রেলকুঠি নজরে পড়বে। বনোয়ারী থাকে এরই একটাতে। উঁচু উঁচু পাহাড়ের কোল ঘেঁসে চলে গেছে ইস্টার্ণ রেলের লাইন। ত্রিসীমানাতে আর কোনও জনপ্রাণী নেই—খালি পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। বনোয়ারী কিন্তু ওই অঞ্চলে সপরিবারে বহুদিন আছে এবং ওখানে যেসব শিকারী শিকার করতে আসে তারা সবাই বনোয়ারীর সাহায্য চায়। এইভাবে শিকারীদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে এবং তাদের নানাভাবে সাহায্য করে সে নিজেও একজন শিকারীর পর্যায়ে এসে পড়েছে। ওখানকার পাহাড় ও জঙ্গলের সব কিছুর নির্ভরযোগ্য খবর ওর কাছ থেকে পাওয়া যায় বলে ওর একটা খ্যাতি আছে। তাই চোরদিহার

শোর মাহাতো, বনোয়ারীর মাধ্যমে বাঘের খবরটা চাচার কাছে পাঠিয়েছে। দিলুয়ার পরের স্টেশন বাঁশকাটোয়া, সেটাও একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন। দিলুয়া থেকে বাঁশকাটোয়া যেতে তিন তিনটে বড় বড় রেলের টানেল পড়ে, তার মধ্যে একটা প্রায় আধ মাইল লম্বা। এই দু'জায়গার দূরত্ব প্রায় সাত আট মাইল হবে। এই দুই ফ্ল্যাগ স্টেশনে আপ ও ডাউন গয়া প্যাসেঞ্জার থামবেই এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এঞ্জিন বা গার্ডের কামরা থেকে কয়েক বালতি পানীয় জল নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বহুকাল আগে নাকি এই দুই স্টেশনের কয়েকজন রেলকর্মচারী গরমের সময় পানীয় জলের অভাবে মারা যায়। সেই থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী জলের জন্য এই ব্যবস্থা করে এবং এখনও তাই চালু আছে। কলকাতা—গয়া--দিল্লী যেতে পূর্ব রেলওয়ের গ্রাণ্ড কর্ড রাস্তায় দিনের বেলায় ঐ তিনটি সুড়ঙ্গ পথের গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অনেকেই যাতায়াত করেছেন। কী সুন্দর না লাগে রেলের কামরা থেকে আরামে বসে পাহাড় জঙ্গলের শোভা দেখতে দিনের বেলায়।

একটা বড় শিকারের ব্যবস্থা হয়েছে জানার পর থেকে আমার অবস্থা বাচ্চাদের ৺কালীপূজো দেওয়ালীর বাজী কিনতে যাওয়ার মত অস্থির। এই হল এই হচ্ছে করে আমাদের শিকার অভিযানের যাত্রা শুরু হতে হতে ১৯৫৪ সালের মে মাস পার হয়ে জুন মাসের মাঝামাঝি গড়িয়ে পড়ল। তখন প্রচণ্ড গরম। ভোরেই আসানসোল স্টেশন থেকে আমাদের গয়া প্যাসেঞ্জার ধরতে হবে। বর্মনবাবুর মারফত আমাদের গাড়ী ভাড়া ও রসদ বাবদ কিছু টাকা চাচার কাছে আগাম পাঠিয়ে দিলাম। শিকারের সঙ্গী শেষ পর্যন্ত চারজনে দাঁড়াল—চাচা, আমি, বর্মনবাবু ও বলাইবাবু বলে একজন। ভোরে স্টেশনে এসে চাচাকে, দেখতে পেলাম। আমাকে দেখেই চাচা খুব খুশী হয়ে এগিয়ে এসে 'আইয়ে আইয়ে' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বর্মনবাবু ও

বলাইবাবু ইতিমধ্যে স্টেশনে এসেছে দেখতে পেলাম। বর্মনবাবু আমার সঙ্গে বলাইবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক বর্মনবাবুর মতই মাঝবয়সী—তাঁকে আমার বেশ ভালই লাগল।

মালপত্র ও রসদ নিয়ে চাচা সকলের চলনদার হয়ে আমাদের একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরাতে তুললেন। রেলের প্রত্যেক কর্মচারীদের সংগে চাচার খুব পরিচয় দেখলাম। সবাই চাচার সংগে হাত মেলাল। তাদের সবার সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে চাচা বললেন এঁকে নিয়ে শিকারে যাচ্ছি, দিলুয়াতে নেমে চোরদিহা যাব। সেখানে একটা বড় বাঘ ভীষণ অত্যাচার করছে, সেটাকে আমরা মারব। রেলের কামরাতে আমাদের মালপত্র গুছিয়ে রাখার সময় আরেকটি লোককে দেখলাম—শুনলাম তার নাম চ্যাটার্জী; সেও নাকি আমাদের সংগে যাচ্ছে। চাচা তাকে সংগে নিয়েছে আমাদের চোরদিহা শিকার ক্যাম্পে চা ও খাবার বানিয়ে সাহায্য করবে বলে। গাড়ী ছাড়তে একজন টিকেট কালেক্টর আমাদের কামরাতে উঠলেন। চাচা সংগে সংগে তাঁকে 'আইয়ে সাহাব আইয়ে' বলে তাঁর হাত দুটো ধরে পাশে বসালেন এবং তাকে সিগারেট ও পান খাইয়ে খুব খাতির করলেন। নানা কথার মধ্যে চাচা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা সবাই বাঘ শিকারে দিলুয়া যাচ্ছি এবং আমরা তাঁরই সঙ্গী। টিকেট ক্যালেক্টর ভদ্রলোক একটা কি দুটো স্টেশনের পর নেমে গেলেন! আমার কেন জানিনা একটু সন্দেহ হোল—মনে হোল আমরা সকলেই বিনা টিকেটে যাচ্ছি। চাচা একবারের জন্যও টিকেট কালেক্টর ভদ্রলোককে আমাদের টিকেটগুলোর কথা বলবার সুযোগই দিলেন না। ভদ্রলোক নেমে যেতে আমি চাচাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলাম—আমাদের টিকেট কাটা হয়েছে তো? চাচা একটু হেসে আমাকে বললেন—'আপ কুছ ফিকির না কিজিয়ে।' আমি সংগে সংগে জিজ্ঞাসা করলাম —'আমাদের শিকারের পারমিট?' চাচা আবার হেসে উত্তর

দিলেন—'আপ কেঁও ঘাব্‌ড়াতে হ্যায়। সব কুছ পাক্কা বন্দোবস্ত হ্যায়। কুছ ফিকির না কিজিয়ে।' এবার আমি সত্যিই একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম—বিনা টিকেটে এবং বিনা পারমিটে বাঘ শিকারে যাচ্ছি ভেবে। রেলের টিকেট কালেক্টর ধরলে গাড়ী ভাড়া ও কিছু ফাইন দিলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিনা পারমিটে বাঘ শিকার করতে যাওয়ার কথা ভাবাও অসম্ভব। যদি বরাতগুণে বাঘ পেয়ে যাই তাহলে বনবিভাগের লোকেরা সে খবর জানতে পারবেই, কারণ এ খবর খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। তখন হাতে হাতকড়ি পড়ে যাবেই এবং বনবিভাগের কালো বোর্ডে আমাদের নাম উঠে যাবে—জীবনে আর কোনদিন শিকারের পারমিট পাওয়া যাবে না। মোটা কিছু ফাইন তো দিতেই হবে তার ওপরে জেলও হতে পারে। এই সব নানা ভাবনায় আমার মাথার মধ্যে ঝড় বইতে লাগল। এমন সময় একটা স্টেশনে গাড়ী থামতে চাচা একটা চাওয়ালাকে ডাকতে গেল। এই অবসরে আমি বর্মনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপারটা কি বলুন তো? আমার কিন্তু খুবই সন্দেহ হচ্ছে। চাচা যে আমাদের টিকেট করেনি সে আমি বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু শিকারের পারমিট যদি না করে থাকে তাহলে আমি ওর সংগে শিকারে যেতে নারাজ। আগাম টাকা দেওয়া সত্ত্বেও এইভাবে চোরের মত শিকারে যাওয়ার থেকে না যাওয়া ভাল। আমরা কোডারমা স্টেশনে দাঁড়িয়েছিলাম এবং গাড়ীটা সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ছিল। বর্মনবাবু আমার কথা শুনে বললেন—'না না, তা কখনো হতে পারে? চাচা আপনাকে যখন সংগে নিয়ে যাচ্ছে তখন বিনা পারমিটে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে না। অত সাহস ওর হবে না।' বলাইবাবু শুনে বললেন —'আমরা ত শিকারী নই—একটা সখের বন্দুক আছে মাত্র। আপনার সংগে জঙ্গল দেখতে বেরিয়েছি,—পেলে বড় জোর একটা পাখি বা হরিণ মারব কিন্তু আপনি যাচ্ছেন বাঘের সন্ধানে—বিনা

পারমিটে আপনার যাওয়া ঠিক হবে না।' বললাম—আমার সংগে চাচার তেমন কিছু আলাপ নেই, এই প্রথম ওর সঙ্গে আমার শিকারে আসা। আমি বহুকাল ধরে শিকার করছি কিন্তু কখনও পারমিট ছাড়া জঙ্গলে গেছি বলে মনেও করতে পারি না। আপনারা ভাল করে চাচাকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানাবেন। ইতিমধ্যে গাড়ী ছাড়ার হুইসিল বাজল। দেখি চাচা একজন চানাচুর বাদাম ভাজাওয়ালাকে সংগে নিয়ে হুড়মুড় করে কামরার মধ্যে উঠে পড়লেন এবং ভাজাওয়ালাকে বললেন—'দেও, সব সাহাব লোগোঁকো চানাচুর খিলাও।' বাইরে তখন কাঠফাটা রোদ আর গাড়ীর ভিতরে গরমে এমনিতেই প্রাণ যাবার দাখিল—তার মধ্যে শুকনো চানাচুর খেতে আমরা মোটেই উৎসাহ পেলাম না কিন্তু চাচার পীড়াপীড়িতে সকলেই একটু করে খেলাম।

লক্ষ্য করলাম, ভাজাওয়ালার সংগেও চাচার অনেক দিনের পরিচয়। চাচা তাকে বললেন—'তুম হামলোগন কা সাথ শিকার মে যায়েগা?' দেখলাম ভাজাওয়ালা এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। আমি শুনে বললাম—না না, ও কোথায় যাবে? ও বেচারা গরীব মানুষ চানা বেচে দুটো পয়সা করবে। জঙ্গলে গিয়ে ওর কি লাভ? চাচা আবার তাকে জিজ্ঞাসা করল—'কেয়া, যাওগে?' সে বললে—'জী হাঁ।' চাচাকে বলতে শুনলাম বনোয়ারীকা ডেরামে তোমরা চানাকা ডিব্বা রাখকে হামলোককা সামান লেকর চোরদিহা চলনে পড়েগা। সেত এক কথাতেই রাজী। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমাদের শিকার ক্যাম্পে আরও দুজন লোক বাড়ল; সমস্ত খরচটাই যে আমার ঘাড়ে চাপবে কিনা। মনের মধ্যে নানা অশান্তি নিয়ে কামরার বাইরে চোখ রেখে চলেছি—মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী যেন জ্বলে যাচ্ছে, আর গরম হাওয়া ও কাঠফাটা রোদে আশপাশের জঙ্গল ও পাহাড় যেন সব ঝিমিয়ে পড়েছে। এমন সময় চাচা উঠে

আমাদের বললেন—'এবার আমাদের নামতে হবে—দিলুয়া এসে গেছি।' দেখি গাড়ীটা একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁসে আস্তে আস্তে থামছে কিন্তু কোন প্ল্যাটফর্ম বা স্টেশন নজরে পড়লো না। আমরা তাড়াহুড়ো করে কোনরকমে নিজেদের মালপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম। তখন দুপুর বারোটা বেজে গেছে। ত্রিসীমানাতে একটা লোক বা একটু ছায়া দেখতে পেলাম না—কেবল আমরা কটি প্রাণী। কয়েক বালতি পানীয় জল নামিয়ে দিয়েই গাড়ীটা ছেড়ে দিল। বাঁ-হাতি উঁচু খাড়া পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। রেল লাইন—থেকে একটা ঢাল নেমে গেছে—দূরে কয়েকটা সাদা সাদা রেলের কুঠি—তার চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গল। আমি কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে চারপাশ দেখছিলাম। ইতিমধ্যে দেখি, চাচা চানাচুরওয়ালা ও চ্যাটার্জির সাহায্যে আমাদের মালপত্র তুলে বনোয়ারীর রেলকুঠির দিকে নিয়ে যেতে বলছেন। বুঝলাম চাচা কিসের জন্য এই দুটি লোক জোগাড় করেছিলেন, অদ্ভুত লোক এই চাচা—ওখানে জনপ্রাণী পাওয়া যাবে না ভেবেই আগে থেকে ঐ হুঁশিয়ারী ব্যবস্থা তার। বেশ কয়েক শ' গজ চড়াই উতরাই করে আমরা রেলকুঠি-গুলির কাছে এসে পোঁছতেই চাচা 'বনোয়ারী, বনোয়ারী' বলে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। প্রায় সব কটা কুঠিই বন্ধ এবং ব্যবহারহীন হয়ে পড়ে আছে, কেবল একটাতে মনে হোল যেন কেউ থাকে। খানিক পরে বনোয়ারীর স্ত্রী কুঠির পেছন থেকে বেরিয়ে এসে জানালো যে, বনোয়ারী উপস্থিত ওখানে নেই—সে গয়া গেছে এবং ২।১ দিনের মধ্যেই ফিরবে। খবরটাতে চাচাকে একটু চিন্তিত হতে দেখলাম। খানিক ভেবে চাচা বললেন, এক কাজ করা যাক। একটা খালি কুঠিতে আমাদের মালপত্র রেখে, চাবি দিয়ে আমরা চোরদিহা রওনা হই। পরে শোর ম্যাহাতোর লোক মারফৎ মালপত্র আনিয়ে নিলেই হবে।

অগত্যা তাইতেই রাজী হতে হোল। তাড়াতাড়ি একটা

খালি কুঠিতে মালপত্রগুলো রাখা হলে পর আমার একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক থেকে তালা খুলে দরজায় লাগিয়ে দিলাম। আমার সঙ্গে আমার পিতৃদত্ত দুটি হাতিয়ার ছিল—একটি '৪০৫ বোরের একনলা রাইফেল এবং একটা বারো বোরের দোনলা বন্দুক। যে যার বন্দুক সংগে নেবে ঠিক হোল আর সংগে যাবে একটি টিফিন কেরিয়ার। তাতে ছিল আমাদের দুপুরের খাবার। রওনা হবার আগে চাচা বনোয়ারীর স্ত্রীকে বলে গেলেন যে মালপত্রের জন্য চোরদিহা পৌঁছে তিনি লোক পাঠাবেন এবং বনোয়ারী এলেই তাকে যেন সে চোরদিহা চলে আসতে বলে। বনোয়ারীর স্ত্রী ঘাড় নেড়ে 'জী হাঁ' বলে সরে দাঁড়াল।

চোরদিহার পথে আমরা রওনা হলাম দুপুর দেড়টায়—ট্রেন থেকে নেমেছিলাম প্রায় বেলা ১২টায়। জুন মাস—দুপুরের প্রচণ্ড রোদে আমরা প্রায় ভাজা ভাজা হবার দাখিল। রেলকুঠিগুলিকে পেছনে ফেলে আমরা সামনের পাহাড় আর জঙ্গলের দিকে এগুতে লাগলাম। গরম হাওয়ার লু চল্‌ছে—নাক ও মুখের মধ্যে লু লেগে মনে হ'ল যেন শরীরের সব কিছু শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার দু'কাঁধে বন্দুক ঝুলছে, তার ভারও কম নয়। এই ভাবে মাইল খানেক চলার পর আমরা সামনের পাহাড়টার নীচে এসে পৌঁছলাম। চাচা সেখান থেকে একবার পাহাড়টার উচ্চতা লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'সামনের এই খাড়া পাহাড়টা যদি কোনরকমে চড়ে পার হতে পারেন তাহলে অপর পারেই চোরদিহা গ্রাম পাবেন। পাহাড়ে চড়তে যদি রাজী হন তাহলেই আমরা খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব, তা না হলে পাহাড়ের নিচে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটি ঘোরা পথ আছে, যেটা প্রায় ৪।৫ ক্রোশ পড়বে, তাতে পৌঁছুতে রাত হয়ে যেতে পারে। ফলে আজ আর শিকারের কোন সন্ধান করা যাবে না।' তাকে বললাম, যদি তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায় তাহলে আমরা পাহাড় পেরিয়েই যাব! এই দুর্দ্ধর্ষ গরমে যত তাড়াতাড়ি

পৌঁছান যায় ততই ভাল।

আমাদের মধ্যে চাচাই সব থেকে বয়সে বড়, এবং তারপর আমি ; বর্মনবাবু ও বলাইবাবু বেশ নব্য যুবক। মনে মনে ভাবলাম চাচা ও আমি যদি পাহাড় পার হতে পারি তাহলে এঁরাও পারবেন। তাই আর সময় নষ্ট না ক'রে আমরা রওনা হলাম। চাচা আমাদের পথপ্রদর্শক—তারপরেই আমি এবং পর পর বাকী সকলে, খাড়া পাহাড়টায় খানিকটা চড়েই বুঝলাম কাজটা খুব সহজ নয়। মনে অদম্য সাহস সঞ্চয় করে হাপরের মতন নিঃশ্বাস টানতে টানতে এগুতে লাগলাম ঠিক কতক্ষণ জানি না। সমস্ত জামা কাপড় ঘামে ভিজে উঠেছে আর গরম হাওয়া ও চড়া রোদে ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছি। শরীর ও মনের সব জোর একত্র করে কোনরকমে আমরা যখন পাহাড়টার পিঠের ওপর এসে পৌঁছলাম তখন আমাদের হাত পা সব অবশ। মুখ ও গলা শুকিয়ে কাঠ, পিপাসাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে, ঠোঁটগুলো গরম হাওয়াতে ফেটে রক্ত বেরুবার উপক্রম। বলাইবাবু ও বর্মনকে দেখে আমার বেশ কষ্ট হতে লাগল—বেচারারা কেন সখ করে এই কষ্ট ভোগ করতে এসেছিল জানি না। তুজনেই হাঁপাতে হাঁপাতে ধপ্ করে বসে পড়ে বললো, 'দাঁড়ান একটু জিরিয়ে নিই—প্রাণ যাবার দাখিল।' সকলেই কয়েক মিনিট একটু জিরিয়ে আবার রওনা হলাম। দেখলাম চাচা মহাশয় বলিষ্ঠ মেহনতি লোক। পাহাড়টার পিঠের ওপর দিয়ে মাইল দেড়েক আসার পর, চাচা থেমে বাঁহাতি দূরে আরেকটা পাহাড়ের তলার দিকে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল—'দো পাহাড়িকা বিচমে, নিচে শের কা 'মান্দ' (গুহা) হ্যায়। আপ মান্দ দেখনা মাংতা ? সায়েদ আভি শের মান্দমে লেটা হুয়া হ্যায়—যানে সে মিল স্যাকতা। নিচে কাফি ঠাণ্ডা হ্যায়। সামনে শেরকো পিনেকা বাস্তে পানিভি হ্যায়। চলিয়ে, আভি আপকো শের দেখা দেগা।' খবরটাতে আমার মন নেচে উঠলো। আমিও বেকুবের মত বলে উঠলাম—চলুন দেখা

যাক। চাচাকে যত দেখছি—অবাক লাগছে ; একজন বলিষ্ঠ চরিত্রের নট-নায়ক, সত্যিকারের এক খেলোয়াড়ি ও অক্লান্ত পরিশ্রমী ব্যক্তি।

চললাম চাচার সংগে। ঐ খাড়া ঢাল বেয়ে নিচে নামা যে কি শক্ত ব্যাপার তা আমরা সকলেই অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম। একটু অসাবধান হলেই কয়েক হাজার ফিট নিচে পাহাড়ের চাতালে গিয়ে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা। আমরা 'চেন সিস্টেমে' হাত ধরাধরি করে খুবই সাবধানে নামতে লাগলাম। গাছের ডাল শক্ত করে ধরে, একজন করে হাত ধরাধরি করে অনেক কসরৎ করে শেষ পর্যন্ত আমরা ছুই পাহাড়ের নিচে এমন একটা জায়গাতে এসে পেঁছিলাম সেখান থেকে ৮।১০ হাত নিচে লাফিয়ে নামা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সেখানে পেঁছিতেই একটা বিশ্রী পচা ছুর্গন্ধ আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করার উপক্রম করলো। চাচা চাপা গলাতে আমাকে বললেন—'শের মারী কো মান্দ্‌মে (গুহা) লে আয়া। দেখিয়ে সামনে কেতনা আচ্ছা পিনেকা পানি হ্যায়—বরফকা মাফিক ঠাণ্ডা। শের মারী খা কর মান্দ্‌মে শো রহা। খুব হুঁসিয়ার— বিনা আওয়াজ সে উতরনা হোগা।' সব জায়গাটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম, নিচে যেখানে লাফিয়ে নামবো সেখানে প্রচুর বালি জমা হয়ে একটা বেদীর মতন হয়ে আছে। সেই বালির বেদীর বাঁদিকে ১০।১৫ হাত দূরে একটা গুহা সুড়ঙ্গের মতন নজরে আসছে। বন্দুক হাতে নিয়ে নামলে পাথরে লেগে আওয়াজ হতে পারে। আমি খুব সাবধানে আমার '৪০৫ বোরের রাইফেলটায় কয়েকটা গুলি ভরে চাচার হাতে দিয়ে বললাম—আমি বালিতে লাফিয়ে পড়ছি—আপনি তাড়াতাড়ি আমায় রাইফেলটা এগিয়ে দেবেন আর আপনি ও বাকী সকলে বন্দুক বাগিয়ে ওপরেই থাকুন। আগে আমি মান্দ'টা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখি বাঘ উপস্থিত ওখানে আছে—না নেই। চাচা ঘাড় নেড়ে সম্মতি

জানালেন। আমি মুহূর্তের মধ্যে বালির উপর লাফিয়ে পড়ে সংগে সংগে রাইফেলের জন্য হাত বাড়াতেই চাচা আমার হাতে রাইফেল দিয়ে নিজেও নিচে লাফিয়ে পড়লেন যা আমি মোটেই আশা করিনি। আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন,—'খুব হুঁশিয়ার!—শের অগর নিকালেগা তো তুফানকা মাফিক আয়গা!' আমরা দুজনেই বন্দুক বাগিয়ে খুব সাবধানে একটু একটু করে মান্দএর দিকে এগুতে লাগলাম; পচা একটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছিল। কয়েক পা এগুতেই একটা বলদের পেছনের পা গুহাটার মুখের কাছে দেখতে পেলাম—বুঝলাম ওটা থেকেই দুর্গন্ধ আসছে। কয়েক হাত দূর থেকে গুহাটার মধ্যে লক্ষ্য করার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। চাচা ঝপ্ করে একটা বড় পাথর তুলে নিয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে যা বললেন তার অর্থ হ'ল—খুব হুঁশিয়ার, আমি এই পাথরটা মান্দের মধ্যে ছুঁড়বো। শের থাকলে কিন্তু তুফানের মতন বেরিয়ে আসবে। আর ঠিক নিশানা নিয়ে সংগে সংগে গুলি চালাতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত। ইশারাতে জানালাম আমি প্রস্তুত। চাচা সংগে সংগে পাথরটা গুহার মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন আর আমি আমার সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে ·৪০৫ রাইফেলটা বাগিয়ে বীর যোদ্ধার মতন দাঁড়িয়ে রইলাম! বেশ কয়েক বছর পরে এই ঘটনার কথা মনে হলেই ভাবতাম ঐ রকম বোকা বীরত্ব কেন দেখাতে গিয়েছিলাম। যা হোক চাচার পাথরটা গুহার চারপাশে পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে বেশ আওয়াজ করতে করতে নিচের দিকে নামতে লাগলো কিন্তু বাঘের তো কোন দেখা নেই! পাথরটা ছুঁড়েই চাচা তার একনলা ১২ বোরে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটু অপেক্ষা করেই তিনি আবার একটা পাথর গুহাতে ফেলতেই ঝট্পট্ ঝট্পট্ আওয়াজ করে মস্ত বড় একটা 'বাদুড়' যা সাধারণতঃ দেখা যায় না, নিমেষের মধ্যে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে

আমাদের দুজনের মাথার খুব কাছ দিয়ে উড়ে চলে গেল। আমি হলপ করে বলতে পারি সে সময় আমার মুখে চোখে অবধারিত মৃত্যুর ছায়া পড়েছিল, বুকের মধ্যে হাজার হাতুড়ি একসংগে ঘা দিয়ে উঠেছিল বাঘ বের হয়ে এসেছে বলে! একটু সামলে নিয়ে আবার চাচাকে পাথর ফেলার জন্য ইশারা করলাম এবং কয়েকটা পাথর ফেলার পর বুঝলাম উপস্থিত বাঘ গুহাতে নেই। ঘটনা যা ঘটবার তা ত ঘটে গেল কিন্তু বাঘ যদি সত্যই ওখানে থাকত—আর কোন কারণে যদি আমার গুলি ঠিকমত না লাগত তবে ঐ বলদের হাড়গোড়ের সংগে আমারও হাড়গোড় মিশে যেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চাচা পরে বললেন—'হামলোক যাঁহাসে পাহাড় চড়নে শুরু কিয়া, মান্দকা (গুহার) দুসরিমু উস্ পাহাড়িকা নিচে নিকলা।' তখনই বুঝলাম যদি বা বাঘ গুহাটাতে থেকে থাকে তাহলে সে এতক্ষণে লোকের সাড়া পেয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়ে থাকবে।

আমরা দুজনে যখন বাঘ ঐ মান্দ'-এ নেই ঘোষণা করলাম এবং বাকী সকলকে নিচে নামার জন্য বললাম, তখন মুস্কিল হোল বর্মনবাবু ও বলাইবাবুকে নিয়ে। দেখলুম বেচারারা ৮।১০ হাত নিচে লাফিয়ে পড়তে ভয় পাচ্ছে। তখন আমি ও চাচা পাহাড়টার খাড়া দেওয়ালের কাছে গিয়ে ওদের বললাম আমাদের কাঁধে পা রেখে সাবধানে নেমে পড়তে। ওঁরা তখন তাই করতে বাধ্য হলেন। তখন বেলা প্রায় তিনটে হবে—ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির, সকলে বলল এখানে যখন কাঁচের মত পরিষ্কার জল রয়েছে, তখন হাত মুখ ধুয়ে খাবারটার সদ্‌ব্যবহার করা যাক। গুহার মুখ থেকে কয়েক পা এগিয়ে জলের ধারে এসে সকলে হাত মুখ ধুয়ে খাবার খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি শুধু হাত মুখ ধুয়ে শান্ত হয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা একবার ভাল করে বিচার করার চেষ্টা করলাম। উত্তেজনা কমে আসলে মনে হল চাচা ও আমি মূর্খের মত যে কাজ করেছি তাত

ভাবলেই বুকের রক্ত জল হয়ে যাবার কথা, ঘুমন্ত বাঘকে গুহার মধ্যে পাথর মেরে জাগালে সে যে কি ভীষণ মূর্ত্তি ধরবে তা কল্পনার অতীত; মৃত্যু অবধারিত। ঢিল খেয়ে বাঘ রাগে আগুন হয়ে বিদ্যুতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের কোন সময় না দিয়েই চোখের পলকে দুজনেরই ঘাড় মট্‌কে মেরে ফেলার আশঙ্কা ছিল। এছাড়া আমার মত বাঘ শিকারে অনভিজ্ঞ লোকের এই দুঃসাহসিকতা মূর্খামি বা পাগলামি ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে। সকলের খাওয়া শেষ হতে আমি বললাম, এবার আমাদের রওনা হওয়া দরকার।

আমাদের চারপাশ পাহাড় দিয়ে ঘেরা—আমরা একটা খাদের মধ্যে আছি। চাচা উঠে খাদের চারপাশটা পরীক্ষা করে বললেন যে সামনের খাড়া পাহাড়টা যদি আমরা কোনরকমে পার হতে পারি তাহলেই চোরদিহা পৌঁছে যাব। পাহাড়টা বেশ উঁচুতে মাথা তুলে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে। উপায় নেই—আমরা শুরু করলাম আমাদের অভিযান। প্রচণ্ড রোদ আমাদের শরীরে আছড়ে পড়লো। বন্দুকগুলোকে পিঠে বেঁধে আমরা হাত ও পায়ের সাহায্যে হামাগুড়ি দেবার মত করে এগুতে লাগলাম। আগে চাচা, তারপর আমি ও পরে অন্যান্যরা। বর্মনবাবু ও বলাইবাবুর অবস্থা খুবই সঙ্গীন, প্রায় মরমর—তাদের দম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটু অসাবধান হলেই নিচে পাথরের চাতালে গিয়ে আছড়ে পড়তে হবে। এক এক জায়গাতে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠাও শক্ত হয়ে দাঁড়াল। পাহাড় তেতে ভীষণ গরম হয়ে আছে তার উপর অরুণদেব কট্‌মটিয়ে তাঁর রোষ দৃষ্টি ফেলছেন। অল্পক্ষণের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে সকলেরই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল তার সংগে গরম হাওয়া নাকের মধ্যে গিয়ে নাক শুকিয়ে একটু একটু রক্ত বার হচ্ছিল। বর্মনবাবু ও বলাইবাবু মাঝ বরাবর উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে ইসারায় জানালো "আমরা আর পারবো না,

তেষ্টায় প্রাণ যাচ্ছে।" তখন আমি ও চাচা পাহাড়টার প্রায় মাথার কাছাকাছি এসে গেছি—আমি রয়েছি চাচার কাছ থেকে তিন চার হাত পেছনে। অল্পক্ষণের মধ্যেই চাচা পাহাড়টার চূড়োর ওপর পোঁছে গেলেন—আমি তখনও ওঠবার চেষ্টা করছি। চূড়োর ওপরে উঠেই সবদিক পরীক্ষা করে চাচা আমাকে বললেন—'আমরা ভুল পথে পাহাড়ে চড়েছি—এদিক থেকে নামা অসম্ভব।' কি সর্বনাশ! শুনেই আমার বুকের রক্ত প্রায় শুকিয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে মুখ দিয়ে কথা বের হলো না, কোনও রকমে চাচাকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখন উপায়! চাচা কোন কথা না বলে গম্ভীরভাবে আশেপাশে তাকাতে লাগলেন, যেন আকাশে পথ খুঁজছেন। আমি আস্তে আস্তে উঠে এসে চাচার পাশে এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ দেখি চাচা তাঁর মাথাব শোলার টুপিটি খুলে হাতে নিয়ে খুব জোর নাড়তে নাড়তে চেঁচাতে লাগলেন—'এ ভাইয়া—এ ভাইয়া, হামলোগ চোরদিহা যায়েগা, রাস্তা ভুলা গিয়া হামলোগন কো বঁচাও।' লক্ষ্য করে দেখি পাহাড়টার নিচে সাদা ও কালো ফুট্‌কির মতন কি যেন নড়াচড়া করছে। খানিক পরে বুঝলাম কতকগুলো গরু মোষ চরছে এবং যে লোকটা গরু মোষ চরাচ্ছিল চাচা তাকে টুপি নেড়ে ডাকবার চেষ্টা করছে। কয়েকবার ডাকাডাকিতে লোকটা আমাদের দেখতে পেয়ে সংগে সংগে তার গামছা দুলিয়ে আমাদের জানায় যে সে দেখতে পেয়েছে এবং কী যেন সে নিচে থেকে চেঁচিয়ে বলছে। শুনেই চাচা দ্বিরুক্তি না করে নামতে শুরু করলো—অগত্যা আমিও নামতে আরম্ভ করলাম। ওঠা নামা দুই-ই দারুণ বিপদজনক ব্যাপার। মনে মনে ভাবলাম বর্মনবাবু ও বলাইবাবুরা না উঠে ভালই করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ওদের কাছে এলাম। ওরা যখন শুনল যে আমরা ভুল পথে পাহাড়ে চড়েছি এবং নেমে গিয়ে অন্য পথ ধরে আবার পাহাড়ে চড়তে হবে, তখন তাদের প্রায় তারস্বরে কেঁদে উঠার উপক্রম।

দুজনেই বলে উঠলেন পিপাসায় আমাদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, একটু জল চাই। আমাদের সংগে জলের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, একমাত্র পাহাড়ের নিচে বাঘের জল খাবার ছোট ঝরনাটাই ভরসা। হাঁটু এবং হাতে অজস্র জায়গার চোট খেয়ে আমরা কোনরকমে নিচে নামলাম এবং ওরা সকলে অতি কষ্টে এক পা এক পা করে ঝরনাটার দিকে এগুতে লাগল। আমি বারণ করা সত্বেও ওরা হাতের আঁচলা ভরে পেট ভরে জল খেতে লাগল—কী সর্বনাশ—এত জল কেউ খায়! আমি ঝরনার ধারে গিয়ে সেই পরিষ্কার কাঁচের মত ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। সকলেই একটু স্বস্তিবোধ করতে আমি চাচাকে কাতর স্বরে বললাম আমাদের এই খাদ থেকে উদ্ধারের পথ দেখান। আবার চাচা অদমিত হয়ে আমাদের নিয়ে চলতে শুরু করে গুহাটা পেরিয়ে প্রায় এক'শ গজ ঢাল বেয়ে নেমে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন 'মিল গিয়া।' আমরা সকলেই চাচার মুখের দিকে নির্বাক অবস্থায় চেয়ে—কী 'মিল গিয়া' তখনও আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। চাচা বললেন—'ইধারসে চড়নেকা রাস্তা হ্যায়—আব হামলোগনকো ঠিক রাস্তা মিল গিয়া।' মনে মনে ভাবলাম রাস্তা ত মিলেছে কিন্তু যাব কি করে—শক্তি কোথায়! চড়াই উৎরাইয়ে বড় বড় কাঁটার ঝোপ আর পাথরের প্রকাণ্ড এক এক চাকের মধ্য দিয়ে—সকলকে নিয়ে ফিরে যাওয়া অসম্ভব বলে মনে হ'ল। সকলেই খুব গম্ভীর—আসন্ন বিপদের আশঙ্কায়।

সবাই মিলে মনের জোরে আবার আমাদের পাহাড়ে চড়ার অভিযান শুরু হোল কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সকলের অবস্থাই সঙ্গীন হয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে নিজেদের শরীরগুলোকে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলাম। এক এক সময় মনে হতে লাগল এই বুঝি শেষ। আর না, পিপাসাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে—পড়ন্ত রোদ আর তপ্ত পাহাড় ও পাথর আমাদের ঝলসে দিচ্ছে। এইভাবে কতক্ষণ যে নিজেদের শরীরগুলোকে

টেনে ওপরে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি বলতে পারবো না। এক এক সময় মনে হোল মৃত্যু অবধারিত—জিভ্ গুলো শুকিয়ে গলার মধ্যে একটা পুঁটলির মতন হয়ে আসছে—কে যে কখন হার্টফেল করে—কিছুই ঠিক নেই! এই অবস্থায় পাহাড়ের আধাআধি আমরা যখন উঠেছি তখন দূর থেকে একটা জোয়ান ছেলেকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম। আমি হলপ করে বলতে পারি, সেই সময় আমার মনে হোল যে সেই ছেলেটিকে যেন ভগবান তাঁর করুণার দূত করে আমাদের এই কটি প্রাণীর প্রাণ বাঁচাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। চাচা তাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই প্রাণপণ চীৎকার করে ডাকলেন। জোয়ান ছেলেটি তার গতি বাড়িয়ে আমাদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসতে লাগল। আমরা তখন আমাদের শেষ শক্তি নিঃশেষ করে পাহাড়ের গায়ে বসে বা শুয়ে পড়েছি। লোকটি এসে পৌঁছতেই বড় রকম বকসিস কবুল করে আমাদের সকলের বন্দুক তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে আমাদের পথ দেখিয়ে শোর মাহাতোর ডেরায় নিয়ে যেতে কাতর হয়ে অনুনয় করলাম, সে অনুনয়ের বোধ হয় তুলনা নেই। জানতে পারলাম, সে সেইখান থেকেই আসছে। তার একটা বলদ নাকি হারিয়ে গেছে—সেই খোঁজেই সে পাহাড়ে এসেছিল। দিনের আলো প্রায় ডুবে এসেছে। নিজেদের শরীরগুলো কোন রকমে টেনে সেই পথ প্রদর্শকের পেছন পেছন কোনরকমে পাহাড়টাকে ডিঙ্গিয়ে, আমরা নামতে সুরু করলাম; যখন পাহাড়ের নিচে এসে পৌঁছলাম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। কয়েক পা যেতেই অন্ধকারে একটা শুকনো পাহাড়ী নদী দেখতে পেলাম। পিপাসায় আমাদের সকলেরই অবস্থা তখন শোচনীয়। লোকটাকে বললাম—ইঁহা পানি মিলেগা? সে বললে—'জী হাঁ। ঠহরিয়ে আভি পানি নিকাল দেতা!' বন্দুকগুলো বালির উপর রেখে সে এক জায়গায় খানিকটা বালি

সরিয়ে হাত দুয়েক গর্ত করে দেওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যে সেই বালি চুঁইয়ে জল বেরুতে লাগল। আমরা বালির মধ্যে বসে এবং শুয়ে পড়ে জল জমার অপেক্ষা করতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে ছেলেটি বলল—'আভি পানি পি স্যাকতা।' কথাটা শুনেই আমরা সকলে হুড়মুড় করে বালির গর্তটার কাছে গিয়ে হাতের আঁচলা ভরে বরফের মত সেই ঠাণ্ডা জল প্রাণভরে খেয়ে পিপাসা দূর হওয়ায় আস্তে আস্তে আমাদের শরীরের অনেকখানি ক্লান্তি ও কষ্ট লাঘব হয়েছে বলে মনে হতে লাগল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল। ক্লান্তি হয়ত কিছু লাঘব হয়েছে কিন্তু আমাদের সকলেরই হাতের চেটোয় হাঁটুতে নানা জায়গায় উত্তপ্ত পাথর ধরে উঠা বা হামাগুড়ি দেওয়ার ফলে ফোস্কা পড়ে গেছে, পড়েছে ফোস্কা কাঁধে বন্দুকের ভারে। হাতে পায়ের আঙ্গুল কাঁটা গাছে ছিঁড়ে জায়গায় জায়গায় জখম হয়ে রক্ত বের হচ্ছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই অবস্থায় অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যখন আমরা চোরদিহা গ্রামে শোর মাহাতোর বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম তখন রাত ৮টা বেজে গেছে। মনে হতে লাগল বহু যুগ আগে শতদ্রু নদীর তীর হতে মহা আর্যেরা যেন বেলা দেড়টা থেকে নানা বিপর্যয়ের মধ্যে লড়াইয়ের পর বিশ্রাম করতে এসেছেন সন্ধ্যার অবকাশে।

শোর মাহাতো আমাদের দেখে খুব খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি তার বাড়ীর সামনের খোলা মাঠটার মধ্যে কয়েকটা দড়ির খাটিয়া বিছিয়ে দিল। আমরাও দেরী না করে আমাদের অবশ, শক্তিহীন শরীরগুলো খাটিয়ার মধ্যে এলিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমাদের সমস্ত দেহ ক্লান্তিতে প্রায় অসাড় হয়ে গেল। ইতিমধ্যে শুনতে পেলাম চাচা শোর মাহাতোর সংগে পরামর্শ করছেন, কি করে দিলুয়াব রেলকুঠি থেকে আমাদের মালপত্র আনার ব্যবস্থা করা যায়। শোর মাহাতো বলল সে এখুনি

কয়েকজন লোক দিয়ে মালপত্র আনার ব্যবস্থা করছে—তারা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই মালপত্র নিয়ে ফিরে আসবে। কথাবার্তা শুনে আমি চাচার হাতে কুঠির চাবিটা দিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এই সময় কয়েক কাপ গরম চা পেলে বুঝি ভাল হোত—চুরুটের সংগে ভালই জমত। এমন সময় দেখলাম চাচা খুব সোরগোল করে শোর মাহাতোর বাড়ী থেকে কয়েক লোটা গুড়ের চা বানিয়ে আমাদের জন্য নিয়ে আসছেন। ভাবলাম চাচা সত্যি এক অসামান্য কাজের লোক। পরম তৃপ্তির সংগে আমরা সেই গুড়ের চা খেয়ে খানিকটা স্বস্তি বোধ করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার মাথায় স্নানের কি ব্যবস্থা করা যায় সেই ভাবনাটা চাড়া দিয়ে উঠল। শোর মাহাতোকে কাছে ডেকে তার সংগে একটু আলাপ এবং সহৃদয়তা গড়ে তোলার জন্য নানা কথার মধ্যে বাঘের খবরাখবর এবং সেই সংগে কোথায় তাদের কূয়া আছে এবং জল পর্যাপ্ত আছে কি না তার খবর নিতে লাগলাম। শোর মাহাতো যা বলল তা শুনেই আমার প্রাণ খাঁচাছাড়া হবার দাখিল। সে বলল—'সাহেবজী আমাদের তামাম গ্রামেতে একটি মাত্র কূয়া আছে তাতে এতই অল্প জল যে গ্রামের ক'টি লোকের পানীয় জল ছাড়া তা থেকে একবিন্দুও খরচ করা সম্ভব নয়। কূয়াতে তালা চাবি দেওয়া আছে এবং গ্রামের মাহাতো হিসেবে সে চাবি আমারই কাছে আছে। আমাকে মাপ করবেন—চান করার জন্য আপনাকে এক লোটাও পানি আমি দিতে পারবো না।' খবরটা শুনেই আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। চানের অভাবে সারা শরীর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে তার উপর সারাগ্রামে এক ফোঁটাও জল নেই! আমি মাহাতোকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাদের স্নান করা বা কাপড় কাচার কি ব্যবস্থা? সে একটু হেসে বলল—'সব বন্ধ। আমাদের গাই-ভঁইস্‌কে পচা নোংরা জল খাইয়ে কোনরকমে বাঁচিয়ে রেখেছি। জলের যা অবস্থা জানি না কতদিন আমরা এইভাবে

বাঁচবো। নদী নালা সব শুকনো। বালি খুঁড়ে সামান্য যা জল পাওয়া যায় সেই জল আর এই কূয়ার জল আমাদের ভরসা।' হঠাৎ আমার মাথায় এল মাহাতো হয়তো বলতে পারবে বাঘে কোথা থেকে জল খায়। আমি মাহাতোকে জিজ্ঞাসা করলাম —জঙ্গলে যে দু' এক জায়গাতে জল আছে, শের নিশ্চয়ই ওই সব জায়গা থেকে জল খেয়ে থাকবে—তোমার কি সেই সব জায়গা জানা আছে? সে বলল—'জী হাঁ। ইঁহাসে থোড়াই দূরমে এক জায়গামে পানি হ্যায়। ২।৩ রোজ আগে শের উঁহাসে পানি পিয়া। আপকো আভি দেখা স্যাকতা। এ শের হামলোগোঁকা উপর বহুত জুলুম করতা। দো রোজ আগাড়ি আপকো খাটিয়া যাঁহাপর লাগা হ্যায় উস জায়গা সে হামারা এক বড়া বয়েল রাত মে লে গিয়া। খেতি বাড়ী কা কাম চালানা বহুত মুসকিল হো গিয়া। ভগবান পানি বেগার মারতা—আউর ইয়ে শয়তান শের হামলোগোঁকা সব গাই ভঁইস মারতা। আব হামলোগ কা বাল বাচ্ছা লেকর বাঁচনা মুস্কিল।' মাহাতোর কথা শুনে ইচ্ছে হোল —বাঘ যখন ওখান থেকে জল খেয়ে থাকে তখন একবার জলের জায়গাটা দেখাই যাক না। পিপাসায় জল খেতে আসার জায়গাতে কোন জানোয়ার মারা নীতিবিরুদ্ধ, যারা মারে সকলেই তাদের ঘৃণার চোখে দেখে—এটা কি ঠিক হবে? মারতে না যাই দেখতে দোষ কি। আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম, রাত্তিরটা এখানে কোন রকমে কাটিয়েই পরের দিন সকালে এই নির্জলা জায়গা থেকে পালাতে হবে। জল আছে এমন জায়গাতে শিকার ক্যাম্প নিয়ে যেতে হবে তাতে বাঘ পাওয়া যাক, আর নাই যাক। তাই দোমনা হয়ে শেষ চেষ্টা হিসাবে একবার বাঘের জল খাবার জায়গাটা দেখে আসার ভীষণ ইচ্ছা জাগল। আর মাহাতো যখন বলছে ২।৩ দিন আগেও সে বাঘকে ওখান থেকে জল খেতে দেখেছে তখন জায়গাটা দেখে আসতে দোষ কি? তাকে অনুরোধ করলাম

আমাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য। শুনেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'চলিয়ে সাহেবজী।' নেশায় বোধ হয় মানুষ খেই হারিয়ে ফেলে তাই এতো কাণ্ডের পরেও আবার বের হলাম!

আমি আমার খাটিয়ার পাশ থেকে '৪০৫ বোরের রাইফেলটা ও একটা টর্চ নিয়ে উঠে দাঁড়াবার সংগে সংগে বুঝলাম আমার পায়ের পাতার তলা দুটোতে অনেকগুলো বড় বড় ফোস্কা পড়েছে এবং সেগুলো চলাফেরার পক্ষে ভীষণ অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি প্রাণপণে সেগুলো অগ্রাহ্য করে মাহাতোর পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। আমাকে বন্দুক নিয়ে বেরুতে দেখেই সকলে জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাচ্ছি। সংক্ষেপে ওদেরকে জানাতে সবাই বলে উঠল সত্যই আপনি ক্ষ্যাপামি করছেন। তারা পেটে কিছু না পড়ার আগে কোথাও যেতে রাজী নয়। চলতে চলতে কিছুদূর গিয়ে একটা জলের জায়গা দেখতে পেলাম। শোর মাহাতো আমাকে ঐ জায়গা দেখিয়ে বলল—'২।৩ রোজ আগে শের ইঁহাসে পানি পিয়া।' রাত্রের অন্ধকারে মাত্র এক ফালি চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় যদ্দূর সম্ভব ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম জলটা শুকিয়ে গেছে কিন্তু তখনও একটু কাদা কাদা ভাব আছে। কিন্তু বাঘের পায়ের কোন দাগ নজরে পড়ল না। ফোস্কা পড়া পা নিয়ে আবার এতখানি হেঁটে আসতে অত্যন্ত কষ্টে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই একটু বিশ্রাম খুঁজছিলাম। সেই সময় মাহাতো নিচু গলাতে জিজ্ঞাসা করলে—'বৈঠনে মাংতা—না চলিয়েগা?' আমি ওকে বললাম—পানি তো নেহী হ্যায়—শের আনেকা কোই উমেদ নেহী—লেকিন শূয়র মিল স্যাকতা। থোড়া বৈঠ্‌কে দেখ্‌নে মাংতা। সে আমাকে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে বসাল—আমার উদ্দেশ্য খানিক বিশ্রাম। বসার পর খুবই ক্লান্তি লাগছিল, সন্ধ্যের ঠাণ্ডা হাওয়াতে দুচোখের পাতা জুড়ে ঘুমের ভাব। বেশ কিছুক্ষণ পরে মাহাতো আমাকে ঠেলে বলল—'চলিয়ে সাহাব।' উঠে

দাঁড়াতেই আবার পায়ের ফোস্কাগুলো অত্যন্ত কষ্টকর জানান দিয়ে উঠলো। ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে আমি মাহাতোকে বললাম—আমার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে, তোমাকে এক বালতি জল আমায় দিতেই হবে। কাল সকালেই এখান থেকে ডেরা উঠিয়ে যেখানে জল আছে সেরকম জায়গায় চলে যাব, আজ তুমি দয়া করে আমায় এক বালতি জলের ব্যবস্থা করে দাও। সে তো কিছুতেই রাজী নয়। বার বার সে খালি বলছে—'সাহাব, হাম এহি গাঁওকা মাহাতো। এতনা বড়া গলতি ম্যায় ক্যায়সে কর সেকতা? গাঁওকা লোক মুঝে ক্যা কহেঙ্গে। নিরুপায় হয়ে তার হাত দুটো ধরে অনেক অনুরোধ করাতে সে কোনরকমে রাজী হোল। সে আমাকে বুঝিয়ে যা বলল, তার অর্থ হচ্ছে—কি আর করা যাবে—আপনাকে লুকিয়েই জল দেব। যেখানে আপনার খাটিয়া লাগান ছিল তারই সোজা ময়দানে একটু দূরে গেলে দেখবেন ডানহাতি কয়েকটা বড় বড় গাছ, সেইখানে দেখতে পাবেন আমাদের কুয়ো। আপনি জামা কাপড় ছেড়ে যেন ময়দানে যাচ্ছেন এইভাবে অন্ধকারে কুয়ার কাছে আসবেন। আমি খুব সাবধানে চাবি খুলে আপনাকে নিঃশব্দে এক বালতি জল তুলে দেব। আপনার লোকদের এই কথা ভুলেও বলবেন না। দ্বিরুক্তি না করে আমি একবাক্যেই রাজী হলাম।

আমরা ফিরে এসে দেখি আমাদের মালপত্র সব এসে গেছে এবং সবাই রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করতে খুব ব্যস্ত। ওরা জানতে চাইল আমরা বাঘের কোন খবর পেলাম কি না। বললাম, না, জলটা শুকিয়ে গেছে, ওখানে বাঘের আসার আর কোন সম্ভাবনা নেই। খাটিয়াটার ওপর রাইফেল ও জামা কাপড় খুলে রেখে খানিক লম্বা হয়ে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম। দেখলুম রাত বাড়ার সংগে সংগে বেশ একটু ঠাণ্ডার ভাব নেমে আসছে—তাতে আমার গায়ের জ্বলুনি একটু কমছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে স্নান না করলে মরে যাব। কিছুক্ষণ পরে উঠে জুতো মোজা খুলে একটা ধুতি পরে

সামনের অন্ধকার জায়গাটার দিকে এগিয়ে বড়ো গাছগুলোর কাছে গিয়ে পড়লাম। ।তার আগেই শোর মাহাতোর সংগে আমার চোখের ইশারাতে কথা হয়ে গেছে! মাহাতো আমার আগেই এসে গিয়েছিল। সে খুব সাবধানে কূয়ার ওপরকার কাঠের পাটার তালা খুলে নিঃশব্দে এক বালতি জল তুলে আমাকে দিয়ে চুপচাপ সরে পড়ল এবং সাবধান করে গেল বিনা আওয়াজে চান করতে। বরফের মতন ঠাণ্ডা জলে গাটা যেন জুড়িয়ে দিল। বালতির শেষ বিন্দুটুকুও গায়ে ঢেলে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অতি সুবোধ বালকের মত আমি ফিরে এসে খাটিয়াতে এলিয়ে পড়লাম।

ইতিমধ্যে রান্নার জায়গা থেকে বেশ একটা সোরগোল আসতে লাগল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে খাবার ডাক পড়লো। আমি খাব না বলায় বর্মনবাবু ও চাচা এসে আমায় কিছু খাবার জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু এতো পরিশ্রান্ত ছিলাম যে, আমার খেতে ইচ্ছে হোল না। ওদের খেয়ে নিতে বলে জানিয়ে দিলাম যে কাল সকালে তাড়াতাড়ি চা পর্ব সেরেই আমরা অন্যত্র যাবো। মাহাতোর কাছে জলের অবস্থা সম্বন্ধে যা শুনলাম, তাতে এখানে থাকা সম্ভব নয়। জল যেখানে আছে সেরকম জায়গাতে ক্যাম্প হবে। ওঁরা দুজনেই বলল 'তাহলে আমরা বাঁশকাটোয়া যাই চলুন, ওখানে রেলের একটা মস্তবড় বাঁধান কুয়া আছে। তাছাড়া স্টেশনের মাইল দেড়েক পরেই একটা ঝরণাও আছে। সেই ঝরণাতে পাম্প বসিয়ে রেল কোম্পানী ঐ জল গুজাণ্ডী লোকো শেডে নিয়ে যায়। বাঁশকাটোয়া থেকে গুরপা, গুজাণ্ডী গয়ার দিকে প্রায় দশ মাইল হবে। প্রচুর জলের সম্ভাবনা আছে জেনে বললাম—সেই ভাল কাল যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা বাঁশকাটোয়া রওনা হব। আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়লাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ক্লান্তিতে চোখ বুজে এল। খোলা মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়াতে এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে রাতটা কোথা দিয়ে কেটে গেল জানি না। ভোরে

পাখির ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো। পরে শুনলাম ওরা নাকি রাত্রে কাছাকাছি এক নালার ধারে শিকারের সন্ধানে গিয়েছিল এবং তার মধ্যে একজন নাকি ঘুমের ঘোরে নালার মধ্যে পড়েও গিয়েছিল।

পরের দিন সকালে চা পর্ব শেষ করে আমরা যখন চোরদিহা থেকে রওনা হ'লাম তখন সাতটা বেজে গেছে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে পাহাড়টার কাছাকাছি আসতেই চাচা বলে উঠলো—'পাহাড়িকা উপর যানেসে কোই শিকার মিলভি যানে স্যাকতা।' শোর মাহাতো আমাদের সংগে আসছিল; চাচা মাহাতোকে বলল—'মাহাতো, মান্দ্‌কা সিধা রাস্তা ভি জান্‌তা। আউর একদফে মান্দ দেখকে যানা চাইয়ে। সায়েদ শেরসে মোলাকাত হোভি যা স্যাকতা।' যদিও আমার পা ও শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ, তবুও আহাম্মকের মত আমি এক কথাতেই রাজী হলাম। লোভ হ'ল, দেখা যাক গুহার কাছে গিয়ে, যদি বাঘ পাওয়া যায়। আমি যে কত বড় মূর্খ তা পরে বুঝেছিলাম। এইভাবে এতগুলো লোক নিয়ে কখনও বাঘের সন্ধান করা যায়! দ্বিতীয় মূর্খামি হলো এইভাবে দু-পা ভরা ফোস্কা নিয়ে আবার খাড়া পাহাড়ে ওঠার চিন্তা ও চেষ্টা করা। মানুষকে ক্ষ্যাপামিতে পেয়ে বসলে উপায় নেই। অল্পক্ষণের মধ্যে পায়ের ফোস্কাগুলো জুতো মোজার মধ্যে ফেটে এমন অসহ্য যন্ত্রণা দিতে লাগল যে, আমার পক্ষে আর এক পাও এগুনো সম্ভব নয়, অসম্ভব কষ্ট হতে লাগল, কিন্তু উপায় নেই। নিজের সব মনোবলকে একত্র করে এগুতে হলো। সকলেই আমার থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাদের বেলা বারোটার মধ্যে দিলুয়া পৌঁছাতেই হবে, কারণ সেখান থেকে গয়া প্যাসেঞ্জার ধরে আমাদের বাঁশকাটোয়া যাওয়ার কথা। ট্রেনটা না ধরতে পারলে আমাদের পুরো একটা দিন দিলুয়া স্টেশনেই পড়ে থাকতে হবে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনরকমে পৈত্রিক প্রাণটাকে টেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা পাহাড়টা পেরিয়ে নিচে নামলাম। পথে কিন্তু শিকারের

কিছুই দেখলাম না। অল্প একটু এগুতেই দেখি খানিকটা জায়গা বেশ ঘন জঙ্গল আর ছায়ায় ঘেরা, কাছাকাছি আসতে নজরে পড়ল সেখানে একটুখানি জল আছে এবং সেই জলের ধারে গয়া থেকে আসা দু'জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শিকারী বেশ বড় একটা মাদী সম্বর মেরেছে আর আমাদের বনোয়ারী সেই সম্বরটা কাটাকাটিতে ব্যস্ত। কৌতূহলে আরও খানিক এগিয়ে যেতেই দেখলাম ৬।৭ হাত লম্বা একটা গোখরো সাপও জলের ধারে গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে। চাচার সংগেও ওদের অনেক দিনের পরিচয় বুঝলাম। জলের ধারে ছায়া ঘেরা জায়গাতে এসে আমরা সকলেই বসে পড়লাম, তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। ওদের কথোপকথন থেকে বুঝলাম ওরা গতকাল সন্ধ্যের ট্রেনে গয়া থেকে এসেছে, রেলের কর্মচারী। তাদের মধ্যে বয়স্ক সাহেবটি বেশ নামকরা শিকারী—দু-একটি বাঘও নাকি মেরেছে এই অঞ্চল থেকে। চাচা আমাদের সংগে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শুনলাম ওরাও একই ট্রেনে আমাদের সংগে ফিরবে।

আমরা সবাই লাইনের ধারে ট্রেনের জন্য অপেক্ষায়, খানিক পরে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আমরা চলতে শুরু করলাম। এই রেলরাস্তা ধরেই কলকাতা থেকে হাজারিবাগ—কোডারমা ও গয়া হয়ে উত্তর ভারতে যাবার পথ, পূর্ব রেলওয়ের গ্রাণ্ডকর্ড লাইন। সকলেরই নজরে এসেছে—বিশেষতঃ যারা দিনের বেলায় এই রাস্তায় কোন এক্সপ্রেস ট্রেনে যাতায়াত করেছেন—এ পথে বড় বড় তিনটে টানেল বা সুড়ঙ্গ কেটে তার মধ্য দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে। রেল গাড়ীতে বসে বসে পাহাড় শ্রেণীর কী মনোরম দৃশ্যই না চোখে পড়ে। পূর্বে পশ্চিমে লম্বায় শ'দেড়েক মাইলের বেশী এই পাহাড়শ্রেণী : অবয়ব সবই খাড়া খাড়া দাঁড়িয়ে আছে ও তাদের ঢাল সোজা নিচে নেমে গেছে, ওঠা নামার চেষ্টায় একবার পা ফস্‌কে গেলে আর রক্ষা নেই—সোজা হাজার খানিক

ফিট্ নিচে গিয়ে জমতে হবে। পাথরের এক একটা প্রকাণ্ড চাঙড় এলোমেলো ভাবে নিবদ্ধ। সমস্ত জায়গায় গ্রাম বসতি বলে কিছু নেই; একমাত্র রেলবিভাগের গ্যাংমেন বা রাস্তা সারাইয়ের কুলীদের ছোট ঝুপড়ি কখনও কখনও রেললাইনের ধারে বা পাহাড়ের ঢালে দেখা যায়। হাজারিবাগ—কোডারমা ও গুরপার এই জঙ্গলে যে সমস্ত পাহাড়ীয়া থাকে, তারা জন্তু জানোয়ারের ভয়ে দিন থাকতে থাকতেই তাদের পশু নিয়ে ডেরায় ফিরে যায়—এবং ওরই মধ্যে হঠাৎ বাঘ পড়ে মানুষটা, ছাগলটা, মোষটা পলকে নিয়ে যায়। পাহাড়ের এই ঢেউয়ের মধ্যে জলের বড় অভাব, সংবৎসর জল ধরে রাখার মত নালা নদী নেই বললেই হয়, বর্ষা শেষে শীত গ্রীষ্ম আরম্ভের সংগে সংগে সব শুকনো খরখরে হয়ে যায়। যা হোক রেলে চড়ে যেন স্বস্তি বোধ হল। দু'পাশের পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ট্রেনটা প্রথম টানেলটার মধ্যে ঢুকে পড়লো। আমরা যাচ্ছি পশ্চিম দিকে। এইভাবে পর পর তিনটি টানেল পেরিয়ে ট্রেনটা আস্তে আস্তে বাঁশকাটোয়া স্টেশনে এসে থামলো। অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন ডানহাতি খাড়া পাহাড় এবং বাঁহাতি একটা টিলার ওপর ফ্ল্যাগ স্টেশন। ছোট পাহাড়টা ডানহাতি খাড়া পাহাড়টার সংগে এককালে জোড়া ছিল—তার থেকে একটা খিলানের মতন কেটে বার করে নিয়ে বহু বছর হয় রেলের লাইন পাতা হয়েছে। জায়গাটা অতি মনোরম। আমরা মালপত্র নিয়ে কোনরকমে টিলার ওপরে উঠে এলাম সামনে টিলার উপর সিগন্যাল ঘরে। ঘরটা বেশ বড়সড়। উপরে উঠতেই বাঁহাতি রেলের কয়েকটা সাদা সাদা কুঠি নজরে পড়ল। সিগন্যাল ঘরে ঢুকতে একটা বেঁটে খাট লোকের সংগে দেখা হোল। চাচা তাকে দেখেই—'ইউসুফভাই কেয়া খবর'···বলে প্রায় জড়িয়ে ধরল, তারপর আমাদের সংগে তার আলাপ করিয়ে দিল। আমাকে দেখিয়ে বললে—'এ সাহাব কো এক শের মারনেকা বহুত সখ।

চোরদিহাকা শোর মাহাতো বনোয়ারীসে খবর ভেজাথা এক বড়কা শের উস গাঁও পর বহুত জুলুম কর্‌রাহা। হামলোগ কাল চোরদিহা গিয়াথা, হুঁয়া পিনেকা বাস্তে এক বুঁদ ভি পানি নেহী—নাচার হোকর হুঁয়াসে ওয়াপস চলা আয়া। আপ শের কা হালচাল বাতাইয়ে আউর আপ মদত কিজীয়ে।' শুনে ইউসুফভাই আমার আপাদ মস্তক একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে জিজ্ঞাসা করলো—'আপ শের মারিয়েগা? আপকো হিম্মত হ্যায়? কোনসে বন্দুক আপকা পাশ হ্যায়?'—আমি আমায় '৪০৫ বোরের রাইফেলটা দেখালাম এবং একটা ১২ বোরের দু'নলা বন্দুকও আছে বলে জানালাম। ইউসুফ রাইফেলটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে বললে—'হাঁ ইয়ে হাতিয়ার ঠিক হ্যায়।' তার হাবভাব দেখে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠার উপক্রম। বাঘ আমার কপালে তখনও পর্যন্ত জোটেনি ঠিকই, কিন্তু আমার সাহস আছে কিনা বা আমার রাইফেল ও নিশানা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কাউকে এইভাবে সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। আমার সামর্থ্যের দিক দিয়েও সন্দেহ প্রকাশ তখনও কেউ করেনি। কিন্তু মেজাজ খারাপ করলে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবার আশঙ্কায় একটু সংযত হয়ে ইউসুফভাইয়ের দুটি হাত ধরে অনুরোধ জানালাম সে যেন আমাকে বাঘ শিকারে সব রকম সাহায্য করে। আমার অনুরোধে হয়তো খানিক কাজ হলো। সে বলল 'ইহাঁ এক বড় ডবর সিনিয়র টাইগার হ্যায়। এত্তো বড়া শের আপ্ কভী দেখা নেহী। ওয় যব বোল্‌তা হ্যায়—ধর্‌তি হিলতি হ্যায়।' আমি পরম উৎসাহে ইউসুফ ভাইকে খোষামোদ করতে লাগলাম, সে যেন আমাকে সিনিয়ার "ডবর" টাইগারের সবরকম খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করে। কি চিন্তা করে ইউসুফভাই বলল—'ঠিক হ্যায়, তিন বাজে আপকো হাম এক জায়গা পর লে যায়েগা। এহি তিন টানেল কা বাদ এক পাহাড়ি কা খাদ সে নিচে থোড়াসা পানি হ্যায়। ইয়ে বড়া

শের রোজ সামকো উয়ো জায়গা সে পানি পিতা। লেকিন হামকো এক বন্দুক আউর গোলি চাহিয়ে—টর্চ বাতি ভি চাহিয়ে—তব আপকো দেখানে স্তেকতা।' আমি সংগে সংগে বললাম আমার ১২ বোরের বন্দুক, গুলি ও টর্চ তোমায় দেব। তুমি দয়া করে আমাকে নিয়ে চল। শুনে সে বলল—'ঠিক হ্যায়—জলদী নাহাকে খানা খাকর তৈয়ার হো যাইয়ে। ঠিক তিন বাজে হামলোক চলেঙ্গে, রাত বারহ্ বাজে কা আগাড়ি হামলোক ওয়াপস আ যায়েঙ্গে, রাত বারহ্ বাজেসে হামরা ডিউটি হ্যায়।' আমি বললাম—বারো বাজে তক্-কাফী। সাম সে বারো বাজেতক্ শের আগার পানিমে না আয়ে তব জরুর কোই দোসরী জায়গা মে পানি পি চুকা। বারহ্ বাজে কো পহেলে হামলোগ বে ফিকির সে চলে আ স্তেকতে হ্যায়। ইউসুফ রাজী হওয়াতে আমি স্নান ও খাওয়ার কি ব্যবস্থা দেখার জন্য খবর নিতে এলাম। দেখলুম গোটা চারেক রেল কুঠির প্রায় সবগুলো খালি। তার মধ্যে একটাতে আমাদের রসদগুলি নিয়ে চ্যাটার্জি ও চানাওয়ালা মিলে রান্না চাপিয়েছে, দেখে মনে হোল ওরা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কিছু একটা বানিয়ে আমাদের খেতে দেবে। দেরী না করে টিলাটার নিচে কুয়াতলায় গিয়ে প্রচুর পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে খুব আরাম করে স্নান করলাম, পরে পেটেও কিছু পড়লো। তারপর থেকে ইউসুফভাই-এর 'সিনিয়ার ডবর টাইগার' দেখার প্রতীক্ষাতে থাকলাম, মনের মধ্যে বেশ খানিক উত্তেজনা নিয়ে সিগন্যাল ঘরে একটা খাটিয়ার ওপর গা এলিয়ে দিতে অনেক কিছু চিন্তা এলো। ইউসুফ লোকটা কি সত্যিই বাঘের খবর রাখে? না আমাকে বোকা বানিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত ভোগাবে আর ওদিকে মোটা টাকার বকশিস কবুল করাবে? বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি এবং আড়াইটার পর থেকে ইউসুফ ভাইকে তাগাদা দিতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত বেলা তিনটে নাগাদ আমরা রওনা হলাম "সিনিয়র

ডবর টাইগারের" সন্ধানে। ইউসুফকে আমার ১২ বোরের দোনলা বন্দুক, কিছু কার্তুজ ও একটা তিন সেলের টর্চ দিলাম। আমার কাছে ·৪০৫ বোরের রাইফেল। তার সঙ্গে ক্ল্যাম্প করে টর্চ লাগান এবং একটা ডানলোপিলোর গদি; গদিটা সংগে থাকলে বসার খুব সুবিধে হয়। শুনলাম চাচা, বর্মনবাবু ও বলাইবাবুরা বাঁশ কাটোয়ার ঝরণাতে বসে হরিণ বা শুয়োর মারার চেষ্টা করবে। আমরা টিলার ঢাল দিয়ে নেমে রেললাইন ধরে আবার পূবে দিলুয়ার দিকে এগুতে লাগলাম। লাইনের বাঁহাতি বড় খাড়া পাহাড় আর জঙ্গল আর ডানহাতি রেলের লাইনের পর ঢাল নেমেই বেশ ঘন জঙ্গল। আমরা রেললাইনের স্লীপারের উপর দিয়ে চলেছি; জুতোর আওয়াজ নিঃশব্দ পাহাড় ও জঙ্গলে একটানা একটা খট্ খট্ করে প্রতিধ্বনি তুলছে। হঠাৎ প্রথম টানেলে ঢোকার কিছু আগে ইউসুফ ভাই দাঁড়িয়ে আমাকে বাঁহাতি পাহাড়ে ওঠার একটা পায়ে হাঁটা পথ দেখিয়ে বললে—'সিনিয়র ডবর টাইগার কভী কভী ইয়ে রাস্তাসে উপর চড়তা।' আমি কৌতূহলে পথটা একবার পরীক্ষা করে দেখলাম, বাঘের পায়ের চিহ্ন আছে কিনা। কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। ইউসুফের সংগে যেতে যেতে ক্রমশঃ অন্ধকার টানেলটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম—মাঝ বরাবর যাবার পর কিছুই নজর করা গেল না। অন্ধকারে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে ভগবানের দয়ায় হাত পা না ভেঙ্গে ক্রমশঃ টানেল থেকে বার হয়ে পড়লাম। কয়েকহাত যেতেই ইউসুফভাই আবার থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল—'এ ভী বড়া সিনিয়ার টাইগারকা এক রাস্তা হ্যায়—বলে ডানহাতি পাহাড় থেকে নেমে আসা একটা সরু রাস্তা আমায় দেখিয়ে দিল। জায়গাটা একদম নির্জন—আমরা দুজন ছাড়া আর কোন জনপ্রাণীর সাড়া নেই। পড়ন্ত রোদের আলো-ছায়ায় নির্জন পাহাড় ও গভীর জঙ্গলে ইউসুফভাই অমন করে থমকে দাঁড়াতেই আমার বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠলো—মনে

হলো এই বুঝি জঙ্গল ও পাহাড় থেকে "সিনিয়ার ডবর টাইগার" বেরিয়ে আসছে। ক্রমশঃ আমরা দ্বিতীয় টানেলটার মধ্যে ঢুকে গিয়ে মাঝ বরাবর যেতেই একটা মালগাড়ী বিকট শব্দ করে টানেলটার মধ্যে ঢুকে পড়লো। টানেলটার দেওয়াল হাতড়ে তাড়াতাড়ি দু'জনে গিয়ে দেওয়ালের সংগে সেঁটে দাঁড়ালাম। ইঞ্জিনটা প্রচুর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে টানেল কাঁপিয়ে নানা রকম আওয়াজ করতে করতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে মালগাড়ীগুলি টেনে বার করে নিয়ে গেল আর আমাদের নাকে মুখে তার ধোঁয়া চেপে দিয়ে দম বন্ধ করে মারবার ব্যবস্থা করে গেল। বেশ খানিকক্ষণ ঐ অবস্থায় থেকে—অন্ধকার আর ধোঁয়ার যোগসাজে একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনও রকমে পার হয়ে এলাম সুড়ঙ্গটাকে।

পথের শেষ নেই, কষ্টেরও না ; প্রায় ৭।৮ মাইল পথ ঐ প্রখর দুপুরে হাঁটা হয়ে গেছে। মজবুত ইউসুফ ভাইয়েরও আমার মতই কাহিল অবস্থা। 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' বা 'ট্রেজার হান্ট' সব বইয়ে —"ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর" কাহিনী—তার কত না দুর্যোগ কত না বিপত্তির কথাই ত পড়েছি বিখ্যাত সব লোমহর্ষক গল্পে ; আমি ক্ষুদ্র মানুষ—আমার পক্ষে এ দুর্যোগই যথেষ্ট ও সীমাহীন বলে মনে হ'তে লাগল। আরও বেশ কিছুদূর গেলে সব চাইতে বড় আধ মাইলের মত লম্বা সুড়ঙ্গটা পাওয়া এবং পার হয়ে যাবার আশায় হাঁটতে লাগলাম। ইতিমধ্যে ভারী ১৪ পাউণ্ডের রাইফেল ও ডান্‌লোপিলোর গদিটা—এ'হাত ও'হাত, কাঁধে পিঠে চড়ে বেড়িয়ে দু'টো হাত আর কাঁধ দু'টোকে প্রায় অবশ করে দিয়েছে। কিন্তু শিকারে যখন বেরিয়েছি—দুঃখ কষ্ট সঙ্গী হবে এ কথাটা ঐ ভারী বন্দুকটার মতই একান্ত সত্য—এ নিয়ে ত ভাবনা করা চলবে না। যাই হোক না…চলতে চলতে আমরা তিন নম্বর টানেলটাও পার হয়ে চার পাঁচ জন রেললাইন মেরামতির কুলিকে

তাদের হাতিয়ার নিয়ে লাইনের ওপর বসে থাকতে দেখলাম ইউসুফ তাদের সর্দারকে জিজ্ঞাসা করল—'বড়ে শেরকা কেয়া খবর ?' সর্দার বলল—'হামলোগ শেরকা কোই খবর নেহী জানতা।' ইউসুফ একটু বিরক্ত হয়ে ওদের জিজ্ঞাসা করল—তুমলোগ নিচে যো খাদমে পানি পিনে যাতে, শেরকা পায়েরকা ভাঁজা নেহী দেখা ?' ওরা সোজা বলল—'নেহী।' ইউসুফ বিরক্ত হয়ে এগুতে লাগল। আমি সর্দারকে অনুরোধ করে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা সত্যিই শের-এর কোন খবর রাখে কিনা ? সর্দার বলল—'সাহেব আমরা রেলের লাইন মেরামতির কাজ করি—বাঘের খবর আমরা জানি না।' আমার সংগে কথা বলতে বলতে ওরা ওদের গাঁইতি ও সাবল তুলতে লাগলো, বুঝলাম ওরা এবার বাড়ী যাবে। ইউসুফ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আমাকে বলতে লাগল—'আইয়ে আইয়ে সাহেবজী—ও লোগ কুছ নেহী জানতা, সব বেয়াকুফ।' আবার হাঁটা শুরু হ'ল। প্রায় ৫টা নাগাদ আমরা তৃতীয় টানেলটা থেকে প্রায় শ'দুয়েক ফিট এগিয়ে এসে রেললাইন ছেড়ে দক্ষিণ দিকে ডানহাতি অল্প উঁচু একটা টিলা ধরে উপরে উঠে আবার সাবধানে তার ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। প্রায় শ' তিনেক ফিট নামার পর দেখলাম সামনে একটা খাড়া পাহাড় আর গভীর জঙ্গল, জন-মানবের কোন চিহ্ন নেই। একটা পাথরের চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে প্রায় দু'শ ফিট নীচে একটা জায়গা দেখিয়ে ইউসুফ বলল—"হুঁয়া এক ছোটাসা ঝরা হ্যায়। উসমে থোড়া পানি হ্যায়। সিনিয়র ডবর টাইগার উয়ো পানি রোজ সামকো পিতা।' সব জায়গাটা পরীক্ষা করে আমার একটু সন্দেহ হলো। বললাম—চলিয়ে হাম পানি জারা সে দেখনে মাংতা। ইউসুফকে সংগে নিয়ে সাবধানে একটা চাতাল থেকে আরেকটি চাতালে লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নামতে লাগলাম আর মনে মনে ভাবলাম ইউসুফ ভাই-এর সিনিয়ার টাইগার বোধ হয় সার্কাসে ছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম

এবারও ঠকলাম। কিন্তু এত পরিশ্রম করে যখন এসেছি, তখন এর শেষ দেখে যাওয়া উচিত। অনেক কসরৎ করে আমরা নিচে জলটার কাছে এসে পৌঁছলাম, সেখানে অল্প একটু জল রয়েছে বটে, কিন্তু বাঘের কোন চিহ্ন নেই। মানুষের পায়ের দাগ দেখলাম প্রায় সব জায়গাতেই। বোঝা গেল লাইন মেরামতির কুলিরা কাজ করতে এসে ওখান থেকে জল খেয়েছে। আশপাশের কাদামাটি ভাল করে পরীক্ষা করে হরিণ ও সম্বরের কিছু পুরোণ পায়ের দাগ পেলাম। আমার সন্ধানী চোখে যা কিছু নজরে পড়লো, তা থেকে বুঝলাম বাঘ বহুকাল ওর ত্রিসীমানাতে আসেনি। হায়রে আমার কপাল! বেশ কষ্ট করে ঘণ্টা তিনেক হেঁটে—উজান বেয়ে আবার সেই তিন-তিনটে টানেল পেরিয়ে এসে এই অবস্থায় পড়লাম! বিড়ম্বনার আর শেষ নেই।

যাই হোক, এসেছি যখন খানিক দেখে যাওয়া দরকার। ইউসুফের কাছে আমার সাহস ও ধৈর্য্য আছে কিনা তার একটা প্রমাণ দেখানও জরুরী মনে হোল। ইউসুফকে স্পষ্ট বললাম—শের আট-দশ রোজ ইধার পানি নেহী পিয়া—আজ ভী সায়েদ ইধার পানি নেহী পিয়েগা। হামলোগ যব ইধার আ গিয়া, তব রাত ন' বাজে তক্ বৈঠ্‌কে ওয়াপস চলা যায়গা। আগর সামসে ন' বজে তক্ শের পানি মে নেহী আয়ে, তব জরুর কোহি দুসরা জায়গাসে পানি পি চুকা। আমরা আবার বহু কসরৎ করে উপরে এলাম। ইউসুফ আমাকে একটা পাথরের চাতালের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল—'ইহাঁ বৈঠিয়ে।' চাতালটিতে গিয়ে দেখলাম সেখান থেকে নিচের জলটা পরিষ্কার দেখা যায় এবং চাতালটির চারপাশে শুকনো ডালপালা দিয়ে ঘেরা। বুঝলাম আমার মত অনেক বেয়াকুফকে ইউসুফ এই জায়গা থেকে "সিনিয়র ডবর টাইগার" দেখিয়েছে আর পয়সা লুটেছে। তখন আর কী করা যায়। আমি চাতালটার উপর থেকে শুকনো পাতাগুলো সরিয়ে বসবার জায়গা করতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে ইউসুফ কয়েকটা টাটকা ডালপাতা এনে আমাকে বলল—'শুখা-পাতি হাটাকে ইস্‌কো লাগাইয়ে !' আমি আর কথা না বাড়িয়ে ডালপাতাগুলো লাগিয়ে বসার জায়গা করতে যখন ব্যস্ত, এমন সময় ইউসুফ নীচু গলায় আমাকে বলল—'হাম দুস্‌রে জায়গা পর বৈঠতা।' রাজি হয়ে বললাম—ঠিক হ্যায় ন' বাজে হামলোক ওয়াপস যায়গা। তখন দিনের পড়ন্ত রোদ পাহাড়ের আড়াল থেকে সন্ধ্যের জানান দিচ্ছে। ইউসুফ তো সরে পড়লো কিন্তু ঠিক কোনদিকে গেল আমি আর লক্ষ্য করতে পারলাম না। ডানলোপিলোর গদিটার ওপর বসে জলটা ঠিক দেখা যায় কিনা এবং ডালপালার ফাঁক দিয়ে জলের দিকে রাইফেলের নিশানার কোন বাধা আছে কিনা ইত্যাদি সব কিছু পরীক্ষা করে নিয়ে চুপচাপ স্থির হয়ে বসে রইলাম। যদিও জানতাম বৃথা সময় নষ্ট করছি তবুও বলা যায় না, জঙ্গলে যদি জলের অভাব হয় তবে এখানকার জল খেতে বাঘের আসার সম্ভাবনা আছে। এখানকার জঙ্গলে আমার এই প্রথম আসা, তাই অচেনা জঙ্গলে কোথায় জল আছে বা না আছে আমার জানার সুযোগ হয়নি। তবে ওরা বলছিল কাছেই নাকি একটা বড় ঝরণা আছে এবং তাতে প্রচুর জল আছে, তাই যদি সত্যি হয় তাহলে এখানকার সব জানোয়ারই ঐ ঝরণাতেই জল খেতে যাবে এবং শিকার ধরার জন্য বাঘেরও ওই জলের ধারে যাওয়ার সম্ভাবনা। আজকের এই পরিশ্রম বৃথা ভাবতে মনটাও প্রায় দমে যাওয়ার উপক্রম হল।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘন অন্ধকার নিয়ে নেমে এল। রোদের তাপ কমতেই পাহাড় ও জঙ্গল থেকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকায় প্রচণ্ড পথশ্রম ও ক্লান্তিতে শরীর অবশ হয়ে আসছিল। হঠাৎ সাতটা নাগাদ আমার সামনের খাদের অপর পাড়ের পাহাড়ের কোল থেকে একটা কোট্‌রা হরিণ বিপদ সংকেত করে নিস্তব্ধ জঙ্গল আর পাহাড়টা কাঁপিয়ে তুললো। আমার সজাগ দৃষ্টি সাবধানে চারপাশে

চালিয়ে কিন্তু কিছুই নজর করতে পারলাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে খাদের নিচে জলের কাছটা ঘন কাল অন্ধকার থাকায়, সেখানেও কিছু লক্ষ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হোল না। কান খাড়া করে শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম। সারা জঙ্গল তখন নিস্তব্ধ—একটা পাতা পড়লে শোনা যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর কোর্টরা হরিণটার খুরের আওয়াজ পেলাম। মনে হোল সে স্বাভাবিক ভাবে চরে বেড়াচ্ছে—ঠিক কি দেখে যে সে বিপদ সঙ্কেত করেছিল তা বুঝলাম না। তারপর থেকে সারা জঙ্গলে আর কোনরকম উত্তেজনার সাড়া নেই। সন্ধ্যে গড়িয়ে বেশ রাত হয়ে গেছে—আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, নিস্তব্ধ এই বিপদসঙ্কুল অজানা পাহাড়ী জঙ্গলে একা বসে আছি—তাও বাঁধা মাচার উপরে নয়, খোলা একটা পাথরের চাঙড়ের উপরে—সামান্য কিছু ডালপালা দিয়ে সামনেটা একটু ঘেরা, তাও প্রায় সাজান নয়—অনেক জায়গায়ই ফাঁকা ফাঁকা। মানুষ খেকো শয়তান কোন বাঘ পেছন থেকে ওৎ পেতে হঠাৎ এসে মুহূর্তের মধ্যে আমাকে মুখে করে তুলে নিয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। যে কোন শিকারী এমন বে-সাবধানে শিকারে বসার কথায় কখনই রাজি হবে না ; শুধু আমার ক্ষেপামিতেই আমি রাজি হয়েছিলাম। আমার ইউসুফ ভাই কোথায় গিয়ে বসে আছে—কতদূরে, তার কোন হদিস্ পেলাম না—আদতেই আছে কিনা তার সন্দেহও মনে জাগছিল—কিন্তু আবার মনে হ'ল লোকটা এত বেইমান হবে না হয়ত, আর তা ছাড়া আমি এখানে নূতন লোক, আমায় নিশ্চয়ই একা এমন বিপদের মুখে ফেলে চলে যাবে না। যা'হোক এইসব বিপদ চিন্তায় মন উতলা। শুক্লা পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ মাথার ওপর থেকে সরে গেছে পাহাড়ের নিচে। মনে হোল রাত অনেক হয়েছে। এবার আমাদের ফেরার দরকার কিন্তু ইউসুফ-এর কাছ থেকে ফেরার কোন তাগিদ আসছে না—ব্যাপার কি ! খুব সাবধানে ঘড়িটা বার করে দেখলাম, রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার

পর মনে হলো ইউসুফ বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে! ওকে ডাকা দরকার। সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক দিলাম—'ইউসুফভাই…… ইউসুফভাই…।' পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু কোন সাড়া নেই। আবার ডাক দিলাম আরও খানিক জোরে— ইউসুফভাই, কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না শুধু প্রতিধ্বনি ভেসে আসল—না—ই, না—ই। প্রথম ডাকের পরেই আমার কেন জানি না সন্দেহ হয়েছিল, ইউসুফ আমাকে বোকা বানিয়ে ডেরায় গিয়ে মনের আনন্দে ঘুমাচ্ছে। কারণ সে বলেছিল—"রাত বারা বাজেসে হামারা ডিউটি হ্যায়।" শুধু কি তাই—আমার একটা বন্দুক, কয়েকটা গুলি ও টর্চটা নিয়ে গেছে—পাছে রাস্তায় কোন দরকার হয়। রাগে আমার সারা শরীর জ্বলে ওঠার উপক্রম, কিন্তু এখন উপায়? এই ভারী রাইফেল, তার ওপর একটা ডানলোপিলোর গদি নিয়ে অন্ধকারে একা একা খাদ ও খাড়াই বেয়ে উপরে ওঠা বেশ বিপদজনক। সাপের কামড় বা জন্তু-জানোয়ারের আশঙ্কা ছাড়াও একটু অসাবধান হয়ে পা ফসকালে গড়াতে গড়াতে বেশ কয়েক শ' ফিট নিচে গিয়ে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা! উপায় নেই, প্রাণ হাতে করে খুব সাবধানে উঠে আসার চেষ্টা করলাম। পথ জানা নেই—ঠিক কোন পথে নেমেছিলাম অন্ধকারে ঠাহর করতে পারলাম না। বহুক্ষণ এইভাবে চলে হাঁটুতে ও হাতে কয়েক জায়গাতে চোট খেয়ে অনেক কসরত করে ওপরে উঠলাম। আমার আশার একমাত্র সম্বল রেল লাইন পেয়ে ওপরে এসে দেখি, দিকদর্শনা আমার পথের ভরসা একফালি চাঁদ কখন পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে, বিপদ— ঘন অন্ধকারের কাল ছায়া রেখে। আমার টর্চটা রাইফেলের সংগে ক্ল্যাম্প দিয়ে বাঁধা। অন্ধকারে একা একা ওই ভারী রাইফেল সমেত টর্চ জ্বেলে পথ দেখা খুবই অসুবিধা হয়ে দাঁড়াল। চারিদিকে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। একবার ভাবলাম অন্ধকারে এই লাইনের ওপর দিয়ে না যাওয়াই ভাল, হঠাৎ ট্রেন এসে পড়লে কাটা পড়ে

যাব। প্রায় বিশ বছর আগে—মেইল বা এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়া—মালগাড়ী বা কোন একটা ইঞ্জিন প্রায়ই এই লোকবিরল পথে রাত্রিতে মাথায় সার্চলাইট জ্বালিয়ে চলত না। লাইনের কাঠের শ্লিপারে আমার জুতোর শব্দ নির্জনতায় বেশ জোর প্রতিধ্বনি হতে থাকায়—পেছন থেকে ইঞ্জিনের গতির শব্দ আমার কানে আসার সম্ভাবনা কম এবং রেল লাইনের ঢালে এঁকেবেঁকে নিঃশব্দে কোন (লোকোর) ইঞ্জিনের সামনে এসে পড়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। তাছাড়া শুনেছি গরমের সময় সাপ লাইনে শুয়ে থাকে। কি করা যায় ভাবছি, তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। একবার রাইফেল সমেত টর্চটা জ্বেলে চার পাশটা দেখে নিলাম। হঠাৎ টর্চের আলো লাইনের ধারে একটা গুমটি ঘরে গিয়ে পড়লো, দেখলাম ঘরটার কাছেই একটা বড় লোহার বাক্স। সাধারণতঃ এই ধরণের বাক্সতে লাইন কুলিদের শাবল, গাঁইতি, কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি রাখা হয়। গুমটিটা দেখে মনে আশা এলো ভরসা হল হয়ত এযাত্রায় প্রাণে বেঁচে যাব নিশ্চয়। ভাবলাম বাকী রাতটুকু এই বাক্সটার ওপরে বা গুমটি ঘরে ঘুমালে কি হয়? ভাবতে ভাবতে ঘরটার কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখি ঘরটার চারপাশে এবং বাক্সটার চারধারে ঘন আগাছার জঙ্গল—সেখানে গরমে সাপখোপের আড্ডা হয়ে আছে। কি আর করা যাবে—অগত্যা ফেরাই ঠিক করলাম।

ত্রিসীমানাতে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই—খালি চাপ চাপ নিঃসীম ঘন অন্ধকার! রেলের স্লীপারের ওপর নিজের পায়ের আওয়াজে নিজেই চমকে উঠে এক একবার রাইফেল সমেত টর্চটা জ্বেলে দূরে ও কাছে ফেলে দেখে নিচ্ছি। প্রথম টানেলটাতে ঢুকেই টর্চটা জ্বেলে সোজা ও ভিতরের খিলানের চারপাশে ফেলতেই কতকগুলো বড় বড় বাদুড় ও চামচিকে আমার মাথার ও গায়ের খুব কাছ দিয়ে উড়ে যাতায়াত করতে লাগলো, যেন তাদের বিশ্রামভঙ্গ করছি

আমার খালি ভয় ইঞ্জিন নিঃশব্দে আমার পেছন থেকে এসে ঘাড়ে না পড়ে। নিস্তব্ধ গাঢ় অন্ধকারে টানেলের মধ্যে নিজের পায়ের আওয়াজের প্রতিধ্বনিতে মনে হতে লাগলো যেন একটা দৈত্য চলেছে! ছু'একবার রাইফেল সমেত টর্চটার বোতাম টিপে ধরছি— তার ঝক্‌ঝকে তীক্ষ্ণ আলো চাপ চাপ অন্ধকার চিরে চারপাশ মুহূর্তের জন্য আলোময় করে তুলছে। কিন্তু ওইভাবে বেশীক্ষণ ধরে রাখা যাচ্ছে না, হাত ধরে আসছে। বোতাম ছেড়ে দিলেই বিভীষিকাময় অন্ধকার আমায় ঘিরে ধরছে। এক একবার আমার মনের মধ্যে উঁকি মেরে উঠছে এই জঙ্গলে কেউটে, গোখরো, অজগরের অভাব নেই—সেই সব বিষধর সাপের মাথায় পা না পড়ে। তাছাড়া ইউসুফের "সিনিয়র টাইগার" অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকতেও পারে—হঠাৎ বিদ্যুতের মতন আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে আমার ঘাড়টা—থাক্ সে কথা। যতই ভাবছি, ইউসুফের এই অবিমৃষ্য বিশ্বাসঘাতকতার কথা, আমার রাগ ততই বাড়ছে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে টানেলের মধ্যে বেশ কয়েকবার পড়ে গেলাম, এক হাতে ও হাটুর উপর ভর দিয়ে উঠে কোনরকমে প্রথম টানেলটা থেকে বের হলাম—ওটাই সব থেকে লম্বা টানেল—প্রায় আধ মাইল খানেক লম্বা হবে। তারপর ছু'পাশে পাহাড় আর গভীর জঙ্গলের মাঝে অন্ধকার ঠেলে চললাম।

এক এক সময় রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—ইচ্ছে করছে ফিরে গিয়েই ইউসুফের নধর ভুঁড়িটায় কসে একটা লাথি মারি। অন্ধকারে চলতে চলতে যে সব জায়গাতে ইউসুফ থম্‌কে দাঁড়িয়ে বলেছিল 'ইহাঁসে কভি কভি সিনিয়র টাইগার পাশ করতা' সেইসব জায়গাগুলোর কাছে পৌঁছাতেই গা ছম্‌ছম্ করে উঠলো। দাঁড়িয়ে টর্চের বোতাম টিপে ভাল করে পরীক্ষা করে আবার চলতে লাগলাম।

কী এক সাংঘাতিক ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি তা অনুভব করবার শক্তিও লোপ পেয়ে গেছে! একটা লুপ্তবুদ্ধি উন্মাদের মত

চলেছি এগিয়ে। রাত তুপুর প্রায় শেষ হতে চলেছে। ভাবতেই মুসড়ে পড়ছি—আর কত দূর! কয়েক শ' মাইল জুড়ে বিপদসঙ্কুল ঘন অন্ধকারময় ছোটনাগপুরের এই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে নিশীথ রাতে আমি একা!! সঙ্গে, কাছে বা দূরে কেউ কোথাও নেই! মনে হতে থাকল নিশ্চয়ই একা কোনও মানুষ কখনও এখানে এত রাত্রে এরকম অবস্থায় পড়েনি; পড়বার কথাও নয়। ঐ রেল লাইন ছাড়া জঙ্গলের মধ্যে অন্য কোন নিশানা খুঁজে পাচ্ছি না। —নজরেও পড়ছে না। মহাসমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটা দিশেহারা ভেলায় ভাসা এক মানুষ যেমন করে ধীরে ধীরে অতল তলে তলিয়ে যাবার ক্ষণ গুণে যায়, তেমনি আমার জীবনও মৃত্যুর অপেক্ষায় ক্ষণ গুণছে, চলতে আর পারছি না। ছোট চাঁদের ফালিটি অস্ত গেছে বহুক্ষণ। রেখে গেছে মিসমিশে কালোর থম্‌থমে আঁধার। এই ত্রাস নিয়ে আসা নিস্তব্ধ ঘন কালোর মধ্যে বনের সহস্র রকম প্রাণীর নানা শব্দ এক এক সময় মনের সাহস, শক্তি ও ভরসা সমস্ত নষ্ট করে দিতে আরম্ভ করল। কে যেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য তৈরী হতে বারবার বলে যেতে লাগল! কোন্‌ দিকে গেলে লোকালয়ের সামান্য চিহ্ন চোখে পড়বে তার জন্য সমস্ত সত্বা আকুল হয়ে উঠেছে, বাঁচবার শেষ চেষ্টায় মনটাকে শক্ত করে প্রায় স্খলিত পায় আধ মরার মত এগিয়ে চললাম।

এইভাবে দ্বিতীয় টানেলের কাছে এসে পড়লাম। নিজেকে একটা বিরাট দৈত্যের মতন মনে হতে লাগল—দৈত্যটা যেন নিজের গুহার মধ্যে ঢুকছে—আর নিস্তব্ধ গুহার মধ্যে তার পায়ের আওয়াজে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। চারিদিক থেকে বেশ কয়েকটা গোখরো সাপের ফোঁস্‌ ফোঁস আওয়াজ শুনতে পেয়ে, আঁতকে উঠলাম, কিসের এই শব্দ! কটা আছে এখানে! পর মুহূর্তেই কানে এলো কয়েকজন লোকের একসঙ্গে বুট জুতা পায়ে চলার আওয়াজ। এ কিসের শব্দ! কারা এই তুপুর রাতে এ পথে আসছে—ডাকাতের দল

নয় ত, শঙ্কায় স্থবির এক মাংসপিণ্ডের মত দাঁড়িয়ে পড়লাম ! হঠাৎ সব শব্দ চুপ হয়ে গেল ! চিন্তায় এলো—আমারই হাঁপানর জোর শ্বাস-প্রশ্বাস আর জুতোর শব্দ টানেলের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতে ঐ রকম প্রতিধ্বনি তুলছিল ! যাই হোক নিস্তব্ধ অন্ধকার ঠেলে কোনরকমে টানেল থেকে বেরিয়ে এলাম। আকাশের তারাগুলো আমার পথ চলার একটু সাহায্য করতে লাগল। টলতে টলতে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর তৃতীয় ও শেষ টানেলটার মধ্যে ঢুকলাম। অনেকক্ষণ ধরে একভাবে ভারী রাইফেল ও ডানলোপিলোর গদিটা ধরে থাকতে থাকতে আমার হাতদুটো অবশ হয়ে গেছে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার উপক্রম হলো কয়েকবার। শুধু প্রাণে বাঁচতে হবে এই তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ভাবলাম যা থাকে বরাতে—এবার টানেলটা পেরিয়েই লাইন ছেড়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরবো। তা না হলে হয় ট্রেনে কাটা পড়বো নয় লাইনে আছড়ে পড়ে মাথা ভাঙ্গবে—কিম্বা তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে অজ্ঞান হয়ে যাব, তখন মৃত্যু অনিবার্য। কোন রকমে জীবন বাঁচাবার একান্ত চেষ্টায় শেষ টানেলটা পেরিয়ে খোলা আকাশের নিচে এসে খানিক দাঁড়ালাম। সারা শরীর ঘামে সম্পূর্ণ ভিজে উঠেছে—শরীরে আর জোর পাচ্ছি না—তৃষ্ণায় অস্থির, সমস্ত জিভটা জড় হয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। —তবুও চলছি, বাঁচতেই হবে।

হঠাৎ বাঁহাতি জঙ্গলের দিক থেকে বহুদূরে কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম ! আওয়াজটা ঠিক কোনখান থেকে আসছে লক্ষ্য করতে গিয়ে দূরে ক্ষীণ একটা আলো নজরে পড়লো। মনে হোল জায়গাটা প্রায় মাইল খানেক দূরে হবে। কুকুরটাও ওখান থেকেই ডাকছে। এই বিশাল অরণ্যে প্রাণের অস্তিত্ব জানতে পেরে আমারও প্রাণে আশা এলো—হয়ত এ যাত্রা বেঁচে যাব। আন্দাজ করলাম, নিশ্চয়ই জঙ্গলের মধ্যে • কোন ছোট বস্তী আছে। ঠিক করে ফেললাম—রেল লাইন ছেড়ে ওই পাহাড় জঙ্গল ধরে ঐ

বস্তীতেই যাব। যদি পৌঁছাতে পারি, তবে ওখান থেকে লোক নিয়ে ফ্ল্যাগ স্টেশনে যাওয়া যাবে। শেষ সাহসে ভর করে লাইন ছেড়ে ঢাল বেয়ে খুব সাবধানে খাদ খাড়াইয়ের জঙ্গল দিয়ে যেখানে কুকুরটা এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে—সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগুতে থাকলাম। পথ জানা নেই—বহুবার কাঁটাতে হাত পা লেগে অনেক জায়গা দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে কিন্তু এই ভাবেই এগিয়ে চলেছি যে কতক্ষণ, তার খেয়াল নেই। প্রায় শেষ নিঃশ্বাস নিয়ে গলদঘর্ম হয়ে এক জায়গায় এসে দেখি, অল্প দূরে একটা বাঁশের ওপর বাঁধা একটা লণ্ঠন ঝুলছে এবং তার চারপাশে কয়েকটা বাঁশ ও পাতার ঘর রয়েছে! একটু প্রাণের স্পন্দন—একটু আলো, মহাসমুদ্রে একটু তীরের রেখা, একটু ভরসা, সব মিলিয়ে আশার অমৃত আলোয় মনে বলের সঞ্চার হলো —হয়ত বাঁচব—আমি বাঁচব।

কুকুরটা সেই লণ্ঠন ঝোলান বাঁশটার নিচে বসে চারপাশে জঙ্গলের দিকে চাইছে এবং এক নাগাড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। আমার সাড়া পেয়ে কুকুরটা আমার দিকে লক্ষ্য করে ভীষণ জোরে চেঁচাতে থাকলো। আমি আস্তে আস্তে বাতিটার কাছে এলাম এবং 'এ ভাই এ ভাই' করে কোনও রকমে গলার স্বর বের করে কয়েকটা ডাক দিলাম। ঘরের মধ্যে একসংগে বেশ কয়েকজন—'কোন হ্যায়' বলে চেঁচিয়ে উঠলো! উত্তর দিলাম—হাম শিকারী হ্যায়। আপলোগন কা কুছ মদত মাংতা—বাহার আইয়ে। অল্পক্ষণ পরে ঘুমভরা চোখ নিয়ে কয়েকজন বাইরে এল। ওদের দেখে মনে হলো সেই রেল লাইন মেরামতির কুলিরা। তারাও আমাকে দেখে বললে— 'আপ ইউসুফ ভাইকা সাথ শিকারমে যাতে থে না? ইউসুফভাই কাঁহা গিয়া?' ক্ষীণ স্বরে বললাম—মালুম হোতা ইউসুফ ওয়াপস চলা গিয়া। হামসে কুছ বোলা নেহী। ওরা অবাক হয়ে বললো —'আপকো একেলা ছোড়কে চলা গিয়া!' বললাম—এইসাহি তো মালুম পড়তা। আপলোক মেহেরবানি করকে এক কি দো আদমী

হামরা সাথ রাস্তা বাতাকে হামকো স্টেশন তক্ ছোড় আইয়ে। হাম বক্শিস দেগা। শুনেই ওরা আঁতকে উঠলো—বললো—'এতনা রাতমে?' ওদের অনুনয়ে বোঝালাম—মুসিবতমে পড়া পরদেশী আদমী, জঙ্গলকা রাস্তা মালুম নেহী। ইউসুফ হামকো একেলা ছোড়কে ভাগ গিয়া। আগর আপলোক মেহেরবাণী করকে মুঝে ছোড় আইয়ে---ম্যায় আচ্ছা বক্শিস দেউঙ্গা। অনেকক্ষণ বোঝাবার পর ওরা দয়া করে রাজী হোল। বললে—'বকশিস আউর তিনঠো টর্চ বাতিকা মশালা দেনে পড়েগা সাব।' আমি এক কথাতে রাজী হওয়ায় ওরা হ্যারিকেনটা বাঁশ থেকে নামিয়ে নিয়ে, জঙ্গলের রাস্তা ধরে আমায় নিয়ে রওনা হলো। আমরা যখন ফ্ল্যাগ স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন রাত আড়াইটা বেজে গেছে। প্রাণান্তকর নিশুতি রাতের ভ্রমণ শেষে একান্ত মনে প্রার্থনা জানালাম তাঁর কাছে—আমার মত যেন আর কারুর এ অবস্থায় কোনদিন পড়তে না হয়।

পৌঁছে দেখি, বলাইবাবু একটা খাটিয়া পেতে সিগন্যাল ঘরের চাতালটার উপর জেগেই শুয়ে আছেন আমার কল্যাণ চিন্তায় অস্থির হয়ে। আমাদের দেখেই তিনি উঠে ভীষণ আনন্দে আশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করলেন---ব্যাপার কি! ইউসুফকে দেখলাম সন্ধ্যের মুখেই ফিরে এল! তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার কথা। সে বলল, 'সাহাব কো বহুত আচ্ছা জায়গা চুনকর বৈঠায়া। আজ রাতমে বড়কা শের, বহুত সিনিয়র টাইগার সে সাহাব কো ভেট মোলাকাত হো যানে স্তেকতা।' তাকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, সে চলে এল কেন? তার জবাবে সে বলল দো আদমী কো একসাথ বৈঠনে কো বাস্তে জায়গা কমতি থা। শুনে ভাবলাম হবে বা বুঝি। এদিকে আমি তখনও খুবই হাঁপাচ্ছি। বলাইবাবুকে বললাম আপনাকে সব বলছি। আগে এই লোকগুলোকে বকশিস আর টর্চের ব্যাটারী দিয়ে বিদায় দিই। আপনি শিগগির খাবার একটু জল আমায় দিন, আমার শরীর খুবই অবসন্ন—মাথা ঘোরাচ্ছে। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়, অজ্ঞান

হবার ঠিক আগের অবস্থা, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে! একটু একটু করে জল খেতে খেতে স্থির হতে লাগলাম।

কোনও রকমে ওদের বিদায় করে বলাইবাবুর খাটিয়াতে অসহ্য ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আমি ওঁকে সব বললাম। শুনে তিনি আঁতকে উঠলেন! ঐ অন্ধকার নির্জন গভীর জঙ্গল ও তিনটে টানেল পেরিয়ে যে একলা কি করে এলাম তিনি ভাবতেই পারলেন না! জিজ্ঞাসা করলাম—হারামজাদা ইউসুফ, কোথায়? তার ভুঁড়িতে কসে একটা লাথি মারতে পারলে আমার রাগ কিছুটা কমে। আমার ইচ্ছা জেনে তিনি বল্লেন—'না না ও সবের কিছু দরকার নেই, আপনি হয়তো জীবনে আর চাচার পাল্লাতে পড়বেন না কিন্তু চাচা ও তার সঙ্গীরা সবসময় এখানে এসে থাকে—ওকে মারলে বা বকলে ওদের খুবই অসুবিধে হবে। আমরা দু চার দিন যা এখানে থাকি তারমধ্যে ওদের চটিয়ে কোনই লাভ নেই'। ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি শিকারে গেলেন না কেন? উত্তরে বললেন—'এসে পর্য্যন্ত যা পরিশ্রম চলছে তাতে শরীর আর বইছে না। যাক্ আজ আপনার একটা ভীষণ ফাঁড়া গেছে বেঁচে ফিরে এসেছেন ভাগ্যের কথা। আমি হ'লেত ভয়েই অজ্ঞান হয়ে মরে যেতাম—বলিহারী আপনার সাহস!' আর একটা খাটিয়া টেনে এনে বললেন—'শুয়ে পড়ুন; কিছু খাবেন না? আপনার জন্য ওরা খাবার রেখে গিয়ে থাকতে পারে, দেখি কিছু আছে নাকি?' শরীর এত অবসন্ন যে আমার খাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার উপর দুর্গম পাহাড়ি জঙ্গলে হেঁটে শরীরের যা অবস্থা হয়েছে তাতে একটু স্নান করতে পারলে ভাল হ'ত। সহানুভূতিতে তিনি বললেন—'চলুন, চান করবেন তো আমি আপনাকে জল তুলে দিচ্ছি। শুনে বললুম—না না এই শেষ রাত্রে ওসব ঝঞ্ঝাটে আর কাজ নেই। আপনার আর কষ্ট করতে হবে না। একটু বিশ্রাম পেয়ে বাইরের ঠাণ্ডা

হাওয়াতে আমি খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পরের দিন চোখে মুখে রোদ লাগায় বেশ বেলাতে ঘুম ভাঙ্গল—দেখি চাচা, বর্মনবাবু চানাওয়ালা ও চ্যাটার্জি সবাই শিকার থেকে ফিরেছে। ওদের চোখে মুখে খুবই উত্তেজনা। ওরা অনেক সম্বর ও কোটরা হরিণ দেখেছিল—গুলিও চালিয়েছিল—ত্থ একটা লেগেও থাকতে পারে কিন্তু সকালে রক্তের দাগ বা হরিণ কিছুই দেখতে পায়নি। বর্মনবাবু জানালেন, তিনি আর চ্যাটার্জি ঝরনাটার ধারে একটা গর্ত্তের মধ্যে বসেছিলেন। একটা বড় লেপার্ড হরিণগুলোকে ধরার জন্য তাদের খুব কাছাকাছি আসতে দেখে ওরা ত্থ'জনে ভয়ে অস্থির। এর মধ্যে আবার লেপার্ডটা চ্যাটার্জি যেদিকে বসেছিল সেদিকে ওদের বেশ কাছেই এসে গিয়েছিল। চ্যাটার্জি ত ভীষণ ভয় পেয়ে ওকে বলল—দাদা—দাদা ঐ দেখুন !! তখন ভয়ে তার সারা শরীর কাঁপছিল। যখন লেপার্ডটা কিছুতেই সরে না তখন সে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল—দাদা আর রক্ষে নেই শিগগির আপনার বন্দুকটা দিন আমি ব্যাটাকে একটা গুলি চালিয়ে দিই। তখন বর্মনবাবুর অবস্থাও নাকি চ্যাটার্জিরই মত। তিনি সংগে সংগে তাঁর একনলা ১২ বোরের বন্দুকটা এগিয়ে দেন। চ্যাটার্জি কোনও রকমে বন্দুকটা হাতে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলতে থাকল "দাদা মারি, মারলাম কিন্তু—দাদা মারবো" এই রকম প্রলাপ বাক্য ! তিনি যতই ইশারা করেন গুলি চালাবা'র জন্য ততই চ্যাটার্জি বলে—"মারব—মারলাম কিন্তু।" এরপর চ্যাটার্জি চোখ বুঁজে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিল—ব্যস্। বন্দুকটাতে একটা "লিথেল-বল" গুলিভরা ছিল। গুড়ুম্ করে একটা বিকট আওয়াজ হ'তেই বর্মনবাবু ভয়ে লেপার্ডটার দিকে চেয়েছিলেন, যদি গুলি খেয়ে তাঁদের দিকে লাফিয়ে আসে ! অথচ তিনি নাকি অন্ধকারে গুলির আগুন লেপার্ডটার চার পাঁচ হাত তফাত দিয়ে চলে যেতে দেখেন ! লেপার্ডটা নিমেষে সেখান থেকে সরে গেলে

চ্যাটার্জির সে কী ভীষণ বীরত্ব! 'দাদা—গুলিটা বাঘটারে পাইলো না—পাইলে বাঘটার মাথাটা গুড়া কৈরা দিতাম—হুঁ দাদা'। শুনে আমরা সকলেই খুব খানিক হাসলাম। বলতে হ'ল চ্যাটার্জির যা সাহস দেখছি তাতে আমার মনে হয়, সে ফিল্ড মার্শাল হবারই উপযুক্ত—এ কথা বলতেই সকলেই আবার খানিক হেসে উঠলো।

ওরা খুব উৎসুক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো—'আপনার কি খবর? ইউসুফভাই আপনাকে কোন জায়গাতে বসিয়েছিল?' গত রাত্রের সব ঘটনা আমি ওদের বলতেই দেখি চাচার মুখ শুকিয়ে গেল! অত্যন্ত বিরক্তিতে প্রকাশ করলাম—গুষ্টির পিণ্ডি ওর সিনিয়র ডবর টাইগারের। আমার মত অনেক শিকারীকে এর আগে ও ধোঁকা দিয়েছে। সে বাঘের খবর কিছুই রাখে না। চাচা বলে উঠল—'না সাহেব, আপনি ভুল করছেন—ওরা সব সময় জঙ্গলে থাকে, বাঘের খবর ও ঠিকই রাখে। আজ আমি ওকে ভাল জায়গা দেখে আপনাকে বসাতে বলবো—এখানে অনেক বাঘ আছে; বাঁশকাটোয়া, গুরপা, গুজণ্ডী বাঘের জন্য খুবই নামকরা জঙ্গল।' ভাবলাম চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। কিন্তু মনে হল, আমিও আগে শুনেছি গুরপা, গুজণ্ডীর কথা—রেলের কয়েকজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার ও গার্ড এইসব জঙ্গল থেকে বড় বড় বাঘ মেরেছে—কত গল্পই ত শুনেছি। চাচার কথা শুনে মনটা আবার নরম হয়ে গেল। ভাবলাম যে ক'দিন আছি সবরকম চেষ্টা করে দেখা যাক কপালে কি আছে। এদিকে ইউসুফ কিন্তু বড় একটা আমাদের সামনে আসছিল না—সারা সকালটা সে আমায় বেশ এড়িয়ে চলছিল।

সকালের চা পর্ব শেষ করে আরামে স্নান সেরে শুধু শুয়ে বসে ও ঘুমিয়ে কাটালাম, শরীরটাও কিছু চাঙ্গা হল। দুপুরে খাবার সময় ইউসুফকে চাচা আমার কথা বলল—'আজ সাহেবকো বাস্তে এক পাক্কা প্রোগ্রাম বানাইয়ে, সাহাবকো বড়া শের দেখা দিজীয়ে।' সে খানিক ভেবে বলল—'ঠিক হ্যায়—আজ হরদিচুয়া

সে জায়গা। শেরকো উতরনেকো ঘাট হ্যায়। ইংরাজ শিকারী লোগন উয়ো জায়গাসে বড়া বড়া শের মারা ; পুরানা মাচান আভিভি বাঁধা হ্যায়। লেকিন জায়গা বড়া সন্নাটা (নির্জন) ইংরাজ শিকারী লোগনকা ভী দিল হিল যাতা থা, হুঁয়াপর বৈঠনেকো বাস্তে বহুত হিম্মত চাইয়ে।' ওর লম্বাই কথা শুনেই মেজাজটা আবার গরম হয়ে আসছিল—ব্যাটা আবার আমার হিম্মত পরীক্ষা করতে চায় ? সামলে নিয়ে বললাম—হামকো লে চলিয়ে হাম একেলা বৈঠেগা।' মনে করলাম জীবন যখন ফিরে পেয়েছি—তখন আবার বের হতে বাধা কি।

ব্যবস্থা হোল বেলা তিনটের সময় আমরা গয়ার দিকে হরদিচুয়া যাব। রওনা হলাম সময়মত—দেখি ইউসুফ তিন চার জন লোক সংগে নিয়েছে। পরে শুনলাম লোকগুলো নেওয়া হয়েছে পুরানো মাচানটা মেরামত করার জন্য ; ভবিষ্যতে খদ্দেরের আশায় নিশ্চয়ই। আমরা ঝরনাটাকে বাঁহাতি রেখে চার পাঁচ মাইল যাবার পর বেশ কয়েকটা ছোট বড় পাহাড়ের মাঝে এসে দেখলাম একটা মাঝারি মহুয়া গাছের ওপর কয়েকটা হাল্কা রেলের টুকরো তার দিয়ে বেঁধে একটা মাচানের মত করা আছে ; মাচানটা বেশ পুরোন বলেই মনে হোল। গাছটির দশ পনের হাত তফাতে পাহাড়ের কোল দিয়ে একটা ক্ষীণ জলের রেখা এসে ছোট একটা জায়গাতে জমেছে। আশেপাশে কাদামাটি, তাতে পুরানো ও তাজা নানারকম হরিণের পায়ের দাগ রয়েছে। তবে বাঘ বা লেপার্ডের কোন চিহ্ন নেই ! বুঝে গেলাম আজ রাতেও আমার কপালে দুঃখ আছে। ইউসুফ লোকগুলোকে মাচানটা মেরামতির কাজে লাগিয়ে দিল। কড়া রোদে এতখানি পথ এসে আমি গলদঘর্ম হয়ে পড়েছিলাম, একটা গাছের ছায়া দেখে বসে পড়ে মনে মনে ভাবলাম এখানে সারারাত বসে থাকার কোন মানে হয় না। ইউসুফ আমার পাশে এসে বসতেই তাকে বোঝালাম—এখানে যখন এসেছি তখন রাত দশটা

পর্যন্ত বসে যাব, তবে এই জলে বাঘ আসার কোনই সম্ভাবনা দেখছি না। তুমি এই লোকগুলোর মধ্যে একজনকে আমার সংগে রেখে যাও—আমি দশটার পর ফিরে যাব। আমার মনে হয় সেও বুঝেছিল এখানে বেকার বসা। তাই সেও এককথাতেই রাজী হয়ে যাওয়াতে আমি সেই ইউসুফ লোকটাকেই আবার বেহায়ার মত খুব অনুনয় করে বললাম—একঠো শের মারনেকা বড়া সখ হ্যায়, আপকো পুরা মদত চাইয়ে; এইসা আন্দাজী বৈঠনেসে কোই ফায়দা নেহি। কোই জান পয়চান শিকারী বোলাইয়ে যো জঙ্গলকা পুরা খবর রাখতা। যো কুছ খরচা লাগে হাম দেনেকো তৈয়ার হ্যায়। শের কোন কোন পানিসে পানি পিতা উসকা তাজা খবর চাহিয়ে। উসি রাস্তাপর বোদা (মোষের বাচ্চা) বাঁধকে মাচানপর বৈঠনেসে শের মিল স্যাকতা। আপ কোই শিকারীকা বন্দোবস্ত কিজীয়ে। সে উত্তরে বলল—'ঠিক হ্যায়, হাম বন্দবস্ত, করেগা।' কিছুক্ষণের মধ্যে মাচান মেরামতির কাজ শেষ হ'লে লোকগুলোর মধ্যে একটা ছোকরাকে বললাম—তোম হামরা সাথ রহেযাও—বকশিস মিলেগা। সে এককথাতেই রাজী হওয়াতে আমরা দুজনে মাচানে বসে বাকী লোকদের ইশারা করতে ওরা চলে গেল। তখনও দিনের পড়ন্ত রোদ ছিল বেশ; মাচানে বসে রাইফেল এবং টর্চ্চ সব পরীক্ষা করে দুজনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকলাম। আস্তে আস্তে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এ'ল—রাত্রি হ'ল। প্রায় আটটার সময় একটা সম্বর বিপদ সঙ্কেত করে খুব কাছ থেকে কয়েকবার ডেকে উঠল। জলটার দিকে সজাগ নজর আমার। সন্ধ্যের মুখেই একটা সজারু জল খেতে এসেছিল, তারপর এই প্রথম জন্তুর সারা পেলাম। বহুদূরে কয়েকবার সম্বর ও চিতল হরিণের ডাক শুনতে পেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের আশপাশে আর কোন জন্তু জানোয়ারের সাড়া পাইনি। ঝরণার দিক থেকে দু'একবার বন্দুকের আওয়াজ জানান দিল...চাচা, বর্মনবাবু ও চ্যাটার্জি ঝরণার কাছাকাছি কোন জায়গায় এলো-

পাথারি শিকারের কসরৎ করছে যা আমার একেবারেই পছন্দ ছিল না। জানিনা ওরা কি শিকার করলো। সময় এমনি কাটতে কাটতে প্রায় রাত এগারটায় আবার বন্দুকের আওয়াজে ভাবলাম আর না, এবার ওদের কাছে যাই, না গেলে ওরা মেরে মেরে হরিণের বংশ শেষ করে দেবে। আমি হরিণ মারার মোটেই পক্ষপাতী নই। ছোকরাটাকে নিয়ে নিচে নেমে ঝরণার কাছাকাছি এসে দূর থেকে ওদের দিকে টর্চ্চ বাতি ফেলতে ওরাও বাতি জ্বেলে ইশারা জানালো। কাছে পৌঁছাতে সকলকেই খুব উত্তেজিত দেখলাম। শুনলাম চাচা একটা চিতরা হরিণ দেখে গুলি করতেই হরিণটা একবার পড়ে গিয়ে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়! চাচা বলেছেন সুবা মিল জায়গা—কাফী চোট লাগা। শুনে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আহা বেচারা! একটা দ্রুতগামী জন্তুর পায়ে চোট লাগলে সে ত বাঘের অনায়াস-শিকার হয়ে যাবে! এই রকমে কত হাজার হাজার জন্তু জানোয়ারের যে সর্বনাশ করেছে আমাদের দেশের এই সব শিকারে অনভ্যস্ত হ্যালফেলের দল তার হিসাব নেই। বাঘ বা হাতী জাতীয় হিংস্র বা শক্তিশালী গোষ্ঠির বহু জানোয়ারকে করে তুলেছে মারমুখী—মানুষ খেকো বা ঘরবাড়ী নষ্টকারী। জঙ্গলের লোকেরাও তীর ধনুক, গাদাবন্দুক মেরে কত রকম জীবজন্তুকে যে জখম করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমায় ওরা শিকারের খবর জিজ্ঞাসা করলে সংক্ষেপে সব জানালাম। ওরা সবাই স্টেশনে ফিরে গিয়ে বাকী রাতটা ঘুমুতে চাইলে, ঠিক করলাম ঝরণার পাড়ের কাছাকাছি সুবিধে মত জায়গা দেখে অপেক্ষায় থাকবো—হয়তো গতরাত্রের বড় লেপার্ডটা, কি একটা বাঘ ঝরণাতে জল খেতে আসতে পারে ভেবে। জল খেতে আসা জন্তু শিকার করব না ঠিকই কিন্তু অন্ততঃ দেখতে ত পাওয়া যাবে। ঝরণাটার অর্ধচন্দ্রের মত বাঁকের থেকে নিচের বালি কেটে খালের মতন করে জলটা বাঁহাতি দূরের পাম্প হাউসের দিকে নিয়ে যাওয়া

হয়েছে। সামনে বেশ খানিক খোলা জায়গা। ছোকরাকে নিয়ে কয়েক গজ যেতেই একটা গর্ত দেখতে পেয়ে আশপাশ থেকে কিছু তাজা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গর্তে ফেলে চেপে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর জল থেকে প্রায় দুই তিন শত গজ দূরে কোন একটা জানোয়ার যেন পা পা করে সামনে এগুচ্ছে বলে মনে হোল। আকাশ ভরা হাজার নক্ষত্রের মৃদু আলোতে জানোয়ারটাকে ঠিক ঠাওর করে পারছিলাম না। ছোট্ট চাঁদের ফালিটি পাহাড়ের চূড়ার ওপাশে ঢলে পড়ে গাঢ় অন্ধকার রেখে গেছে। পরে দেখলাম একটা মাদী সম্বর যেন প্রাণ হাতে নিয়ে পিপাসায় জল খেতে আসছে আর সাবধানে দেখে নিচ্ছে কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না। বেচারা শেষ পর্যন্ত জলের কাছে এসেই ত্রস্ত গতিতে জলে নেমে জল খেতে থাকলো। এদিকে টের পেলাম, যে পাতাগুলোর ওপর বসেছি তার নিচে একটা কিছু নড়ছে যেন। নিশ্চল হয়ে সম্বরটার জল খাওয়া দেখছি আর ভাবছি আমি কিসের ওপর বসেছি—কোন সাপের মাথায় বা বড় ব্যাঙ না পাহাড়ী গিরগিটির? হঠাৎ আমার ডানকানের পাশ থেকে পিঠের নিচে পর্যন্ত একটা সুড়সুড়ি অনুভব করলাম! শিকারে ঠিক এই ধরনের অনুভূতি আগেও আমি কয়েকবার অনুভব করেছি। যখনই কোন অজানা বিপদ লুকিয়ে এসেছে ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ ধরনের অনুভূতি আমাকে সজাগ করেছে! মনে হোল বিপদটা আমার খুবই কাছে ডানদিকে পিঠ-বরাবর এগিয়ে আসছে। মনের মধ্যে একটা শঙ্কা-শিহরণ অনুভব করলাম! আমার তখন ত্রিশঙ্কুর অবস্থা! গর্তের মধ্যে সাপ না ব্যাঙ নড়ছে বুঝছি না—তার মধ্যে আবার ওই নতুন বিপদ আস্তে আস্তে আমার পিঠের দিকে এগিয়ে আসছে! সাবধান হওয়া দরকার মনে করে খুবই আস্তে আস্তে মাথাটা ডান কাঁধের দিকে ঘুরিয়ে চোখের কোণে দৃষ্টি চালাতেই দেখি একটা মস্তবড় লেপার্ড সামনের দুপায়ে ভর দিয়ে ঠিক কুকুরের মতন আমার পিঠের দশ বারো হাত তফাতে বসে এক

দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে! শুধু লাফাবার অপেক্ষায়! এইটাই সেই লেপার্ড যেটাকে "ফীল্ডমার্শাল" চ্যাটার্জি চোখ বুঁজে গুলি চালিয়েই বলেছিল 'দাদা গুলিটা পাইল না'। লেপার্ডটার সাহস দেখে অবাক হয়ে ছিলাম! গতরাত্রেই তার চার পাঁচ হাত তফাৎ দিয়ে গুলি গেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আজ আবার এসেছে। বেহায়াটার মতলব খারাপ থাকতে পারে এই ভেবে আমি মাথাটা সাবধানে তার দিকে ঘোরাতেই সংগে সংগে সে বিদ্যুতের মতন ছুটে ঝরণার পাড়ের জঙ্গলটার মধ্যে চলে গেল। লেপার্ডটা এত তীব্র গতিতে ছুট্ দিয়েছিল যে তার পা থেকে কয়েকটা ছোট বড় মোরাম ধাক্কা খেয়ে আমার গায়ে মুখে এসে ছিট্‌কে পড়লো। ওদিকে মাদি সম্বরটা লেপার্ডটার গন্ধ পেয়ে মোরামগুলোর আওয়াজে একলাফে জল থেকে উঠে তীর বেগে সামনের মাঠ ও জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল।

জানোয়ারটা বেশ বড় ধরণের, মাথা—লেজ মিলিয়ে ৭।৮ ফুট হবে। ওর ভাবগতিক দেখে মনে হ'ল—যে রকম সাহস তার বাড়ছে তাতে মানুষকে আর ভয় করছে না; এই রকম মানুষঘেঁসা হ'তে হ'তে সে অল্পদিনের মধ্যেই মানুষখেকো হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই জাতটার অসম্ভব ধূর্ততা, বিজুলি গতি ও বহু রকম ফন্দী ফিকিরের স্বভাব বলে বিশেষ খ্যাতি আছে। লেপার্ডের চক্‌চকে গাঢ় বাদামী লোমের উপর সুন্দর সাদা আর কালো ছোপ ছোপ (Rosettes) থাকে বলে তাকে সোনা চিতা বলা হয়ে থাকে; সারা শরীর চিহ্নিত থাকে বলেই চিতা নাম হয়েছে। লেপার্ডের (সোনা চিতার) দৌড়ের গতি চিতা বাঘের মত না হলেও প্রায় কাছাকাছি যায়। শিকারকালে চিতা বাঘের গতিবেগ ঘণ্টার ৮০ মাইল পর্যন্তও ওঠে বলে শোনা গেছে—এ এক অবিশ্বাস্য কথা বলেও মনে হ'তে পারে; হরিণ বা ইম্‌পেলাকে দৌড়ে হয়রাণ করে এরা শিকার করে। গতিতে ঐ জাত পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী

জীব। হাল্কা সোনালী—বাদামী লোমের উপর ঠিক লেপার্ডেরই মত—অত বড় বড় না হলেও—চিতারও সারা গায়ে সাদা কালো ছোট ছোট হাল্কা ফুলের নক্সা (Rosettes) থাকে। অনেকেরই স্মরণে থাকার কথা—"ঙ নৌকা মাঝি ব্যাঙ চিতা বাঘের সরু ঠ্যাং"। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্রের সময় এই চিতা বাঘ কিছু হয়ত ছিল আমাদের দেশে—এখন আর নেই; এই সুন্দর তীব্র গতিশীল জাতটিকে (specis) মেরে মেরে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। চিতার পায়ের মাংসপেশী সোনা চিতার মত সুডৌল মজবুত হয় না—অনেকটা বড় ধরণের শিকারী কুকুরের মত দেখতে হয়, তার পেটও শিকারী কুকুরের মতই। বাঘ অবশ্য অনেক বড় ও ভারী শক্তিশালী শরীরের জানোয়ার। লেপার্ড সম্পর্কে অনেকেরই জানার কথা—কী সাংঘাতিক ধূর্ত এরা। প্রখ্যাত শিকারী জিম্ করবেট লিখে গেছেন তাঁর বিখ্যাত—"ম্যান্ ইটিং লপার্ড অব রুদ্র প্রয়াগ" বইয়ে—কেমন করে ১২৫ জন হতভাগ্য—মানুষ খেকো সোনা চিতা বা লেপার্ডের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে!—(১৯১৮-১৯২৬, ৮ বছরে, গড় পড়তা—১৫·৬ জন)।

সম্বরটা দৌড়ে পালাল দেখে খানিক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মন দিলাম আমার নিচে কি আছে দেখবার জন্য। এদিকে লেপার্ডটা ছুটে যাবার সময় ছোকরাটা ভীষণ ভয় পেয়ে—'সাহাব, বড়কা সোনচিতা' বলে আমায় জড়িয়ে আছে দেখে তার কম্পিতমান হাত থেকে টর্চটা নিয়ে তার উপর রুমাল জড়িয়ে, গর্তর মধ্যে দেখবার চেষ্টা করলাম পাতার নিচে কী নড়াচড়া করছে। আবছা আলোতে সেই বস্তুটিকে দেখেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো! দেখি ভাল্লুকের মতন ঘন কাল্চে রঙওয়ালা সাত আট ইঞ্চি লম্বা একটা বড় পাহাড়ী কাঁকড়া বিছে। শুনেছি এদের কামড়ে মানুষ মরে যায়। আমার ভারী শরীরের চাপে পাতার তলাতে সে বেশ কিছুটা ঘায়েল হয়ে পড়েছিল, আমার শরীরের চাপ হাল্কা হতেই

সে দাঁড়া উঁচিয়ে আমার বর্বরোচিত ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবার জন্ম প্রস্তুত! দেরী না করে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে তাকে বেশ করে থেঁতলে পাতা সমেত বালিতে তাকে পুঁতে দিয়ে ঘড়ি দেখলাম—দেখি রাত সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। মনের মধ্যে লেপার্ডটা একটা অস্বস্তির কারণ হয়ে রইল। এক আধবার মনে হ'ল ওটাকে মারতে পারলেও কাজ হোত। যাহোক এতো মেহন্নতের পর একটা লেপার্ড ত দেখা গেল—এইটুকু সান্ত্বনা। কিন্তু যা কপাল! বাঘ হয়ত আর জুটবে না।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। আমি ছোকরাটাকে বললাম—চলো হামলোগ ওয়াপশ যায় গা। তারপর ক্লান্ত শরীরটা কোনরকমে টেনে ফ্ল্যাগ স্টেশনের দিকে চলতে লাগলাম। এভাবে আনাড়ীর মতন শিকারে এসে—এলোপাথাড়ী গুলি চালিয়ে সময় নষ্ট করতে আমার মন একেবারে চাইছিল না। কিন্তু উপায় কি? গত দু'রাত্রেই এদের শিকারের ধারা দেখে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করছিলাম—যা হচ্ছিল সে ত শিকার নয়—যথেচ্ছ প্রাণী হত্যা করার চেষ্টা বা জখম করে দেওয়া। এই রীতি বিরুদ্ধ কাজ কী করে বন্ধ করা যায়—যাতে ওরা নিয়ম মত শিকার বা Hunt করতে পারে, যেখানে জন্তু জানোয়ারেরা জীবন রক্ষার শতকরা পঞ্চাশ/পঞ্চাশ সুযোগ পায় এবং একটা খেলোয়ারী ভাব নিয়ে এরা সব শিকারে উদ্যোগী হয়ে—জানোয়ারদের ঐ জল খাবার জায়গায় শিকার না করতে পারে তার ব্যবস্থার কথা চিন্তায় এলো। কোন শিকারীর সাহায্যে 'হাঁকা' বা বীট করার জন্ম আমার কিছু খরচ হবে কিন্তু তা হলেও একটা স্পোর্টস বা শিকারোদ্যোগ ত হবে। তা ছাড়া যদি ভাগ্যে জোটে তবে বাঘের দেখাও পেয়ে যেতে পারি—এই ক্ষীণ আশায় প্রস্তুত হলাম হাঁকা শিকারে।

এবারকার সফরে খুব আশা নিয়ে বের হয়েছিলাম চোরদিহার হতভাগ্য গ্রামবাসীদের গৃহ পালিত পশু খেকো (Cattle lifter)

বাঘটার মোকাবিলা করব বলে কিন্তু সেখানে থেকে শিকার সম্ভব হ'ল না প্রচণ্ড জলের অভাবে। অবস্থার বিপাকে পড়ে চাচার পরামর্শে এলাম বাঁশ কাটোয়ার জঙ্গলে, সেখানে প্রচুর পানীয় জল আছে আর তা ছাড়া নূতন পাহাড় জঙ্গলটা ভাল করে খুটিয়ে দেখে (Survey) যাওয়াও হবে জন্তু জানোয়ার কী রকম আছে, যাতে পরবর্ত্তী কোনও সময়ে এসে শিকার ব্যবস্থা করা যায়। সে সব প্ল্যান বা চিন্তার কোন কার্যকরী ফলই হ'ল না।

স্থানীয় কোন শিকারীর খবর নিতে আগেই বলা ছিল—দেখা যাক্ ইউসুক বর্বরটা কিছু বন্দোবস্ত করেছে কিনা? ডেরায় পেঁাছে দেখি বর্মনবাবু ও বলাইবাবু খাটিয়াতে শুয়ে আছেন। যেতেই উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে কিছু শিকার দেখেছি কিনা? তাকে আমার গত রাত্রের সব ঘটনার বিবরণ দেওয়ার পর বলে উঠলেন--'আপনার খুব ভাগ্য ভাল, যে কাঁকড়া বিছেটা আপনাকে হুল ফোটায়নি! আর আশ্চর্য্য সাহস তো লেপার্ডটার! "ফীল্ড মার্শাল" কাছেই ছিল। সে শুনে বলল—'হুঁ দাদা, আমার —গুলিটা পাইল না—পাইলে মাথাটা গুঁড়া হইতো।' আমরা সকলেই একসঙ্গে খানিক হেসে উঠলাম। বলতে হ'ল গপ্পে গুপী পণ্ডিতের সেই গল্প। গুপীর বাঘ মারবার বড় সখ। অনেক গল্পে শুনেছে যে বাঘ সুযোগ পেলেই ঘাড় মটকে টেনে নিয়ে যায়। যা হোক টিফিন বাক্সে খাবার আর ফ্লাস্কে ঠাণ্ডা জল নিয়ে খুব তোড়জোড় করে মিলিটারী সবুজ রংয়ের পোষাক টুপি পরে সাহসের সঙ্গে গেল সে শিকারে। একটা উঁচু ঢিপি দেখে বড় একটা গাছে হেলান দিয়ে বসতে গিয়েই মনে পড়ল—ঐ য্যাঃ— তাড়াতাড়িতে ঘাড়টা বাঁচাবার জন্য কয়েক টুকরো কাঠের স্প্লিনটার ত আনা হয় নি—গলায় বাঁধবার জন্য! কী আর করে শুধু জাঙ্গিয়া পরে মিলিটারী প্যাণ্টালুনটি খুলে গলায় বেশ মোটা করে জড়িয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল—এবার বাঘে কামড়ে ধরলেও দাঁতটি ফোঁটাতে

পারবে না ! জঙ্গলকুর্ত্তা, টুপি, আণ্ডারওয়ার পরা গুপী বসল স্থির হয়ে। তারপর, পাছে টেনে নিয়ে যায় ভেবে—জঙ্গলী লতা দিয়ে পা হু'টো মজবুত করে গাছের সঙ্গে বেঁধে বলতে থাকল—এবার দেখি বাঘে কী করে—এমন সময় এলো বাঘ ! দেখেই তার অবস্থা সঙ্গীন ; বন্দুকে বড় সড় একটা সীসার গুলি ভ'রে—দিল বন্দুক চালিয়ে। আওয়াজ পেয়ে বাঘ ত ছুটল তীর বেগে আর সীসার গুলি ভারী হওয়ায় ছুটল পেছন পেছন পোঁ পোঁ করে। হঠাৎ বাঘ এক মোড় ফিরতেই গুলি সোজা গিয়ে কোথাও লাগল ঠুক্ করে। গুপীর কী চিৎকার—লেগেছে, লেগেছে গুলি বাঘের পেছনে। পা হু'টো বাঁধা থাকায় তখন আর বাঘটার পেছনে গেল না কিন্তু গুপী নিশ্চিন্ত—গুলি যখন লেগেছে তখন বাবাজীবন মরে ভূত হয়ে গেল বলে ; এবার নিশ্চিন্ত হয়ে সে বাঘছালটি যোগাড় ক'রে সবাইকে দেখাবে। জমান হাঁসির রোলে বেশ কিছুক্ষণ সময় আমাদের কাটল।

হাঁসতে হাঁসতে বললাম, চায়ের ব্যবস্থা কি—কখন পাব তাই বলুন। হুঃখ কষ্ট সব চুরুটের ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিতে চাই যে। হাতে মুখে একটু জল দিয়ে চা ও প্রাতরাশের কিছুক্ষণ পরে চাচা গলদঘর্ম হয়ে ফিরলেন কিন্তু তিনি তাঁর মায়ামৃগের সন্ধান পাননি। সুযোগ পেয়ে স্থানীয় শিকারীর কথা পাড়লাম। শিকারীর জোগাড় করতে পারলে ভাল, নাহলে আমি আজই ফিরে যাব। চাচা বললেন—'এক আদমী হ্যায় ! হাম উসকো বোলানেকো বাস্তে আদমী ভেজতা।' বললাম—শিকারী যদি পাওয়া যায় এবং তার যদি বাঘের খবর কিছু জানা থাকে তাহলেই আমি সেখানে "বোদা" বেঁধে বসবো আর আপনারা হাঁকা করতে পারেন তাতে শুয়োর হরিণ পেয়ে যাবেন। আজ থেকে আপনাদের জলের ধারে যাওয়া বন্ধ। এঁতে আপনারা রাজী থাকেন ভাল, না হলে আজই ফিরে যাব।

যাই হোক, বেলা এগারটার সময় দেখলাম চাচা ও ইউসুফ

একজন লোককে সংগে নিয়ে এসে বলল 'এহি শিকারী ইহাকা।' সিগারেট দিলাম। সে ধরিয়ে খুব কয়েকটা লম্বা টান দিল। আমি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, জঙ্গলের কি ধরণের খবর রাখে জানার চেষ্টায় অল্লক্ষণেই বুঝলাম সে কোন বিশেষ খবর রাখে না—ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তখন সোজাসুজি সকলকে বললাম—লোকটার বিশেষ খবরাখবর জানা নেই। তবে সকলে চান তো আজ একবার একটা হাঁকা করে দেখতে পারেন কিন্তু হাঁকাটা একেবারেই আন্দাজী হবে তাতে আপনাদের বরাত গুণে হরিণ শুয়োর পেয়ে যেতে পারেন। আর হাঁকাতে যদি রাজী না হন তাহলে আজ সন্ধ্যের ট্রেন ধরেই ফিরব। হাঁকা করলে দু'টার সময় রওনা হতে হবে যাতে তিনটে নাগাদ হাঁকা সুরু হয়। ওরা শেষ পর্যন্ত হাঁকাতেই রাজী হোল। শিকারীকে বলা হ'ল কুড়ি পঁচিশ জন লোকের ব্যবস্থা করে একটার মধ্যে এখানে এসে হাজির হতে।

দুপুরের খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে, হাঁকার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলাম। দু'চারজন করে লোক আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত আট দশ জনের বেশী লোক হোল না, তার মধ্যে আবার দশ বারো বছরের ছেলের সংখ্যাই বেশি, ওই নিয়েই আমরা রওনা হলাম। রোদে প্রাণ যাবার দাখিল। বহু কষ্টে মাইল তিনেক যাবার পর একটা পাহাড়ের তলাতে পেঁছুতে শিকারী জানাল—'উপর পাহাড়ী সে হাঁকা আয়েগা।' লোকটা বলে কি? এই রোদে কোন জন্তু জানোয়ার কখনও কি পাহাড়ের ওপর থাকে? দুই পাহাড়ের মাঝে ছায়া ভরা ঠাণ্ডা জায়গাতেই জানোয়ারদের থাকার সম্ভাবনা। ভাবলাম বৃথাই একে বোঝাবার চেষ্টা। তাই বিনা বাক্যে একটা ছায়া দেখে বসে পড়ে আর সকলে কোনদিকে বসবে তা জেনে ওরা রওনা হবার আগে সাবধান করে দিলাম তারা যেন এদিকে গুলি না চালায়, কোন লোকের গায়ে যেন গুলি না লাগে, খুব সাবধান। চাচাকে বললাম—আপ এ লোগন কো ঠিকসে বৈঠাকে আউর

একদফে সমঝা দিজীয়েগা—খুব হুঁশিয়ার। আনাড়ী শিকারীদের সঙ্গে হাঁকাতে যাওয়া খুবই বিপদ। খানিক পরে হাঁকা সুরু হ'লে যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হল একটিও জন্তু দেখা গেল না। সন্ধ্যের মুখে দ্বিতীয় হাঁকা শেষ হবার সময় আমার সামনে দিয়ে একটা মাদী সম্বর, ভীরু কাজল কাল বড় বড় চোখে চেয়ে চলে গেল। পরে শিকারী এসে জিজ্ঞাসা করলো—আপকো সামনেসে এক বড়কা সম্বর পাশ কিয়া, সাহাব আপ মারা নেহী ?' গম্ভীর ভাবে জবাব দিলাম —মাদিন সম্বর পাশ কিয়া, হাম মাদিন কোই জানোয়ার মারতা নেহী ? তাতে ওদের মুখে একটা অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠলো। চাচা ওদের হয়ে একটু ওকালতি করার চেষ্টায় বললেন—'মার দেনেসে এ লোক বহুত খুশ হোতা।' শুনে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। বল্লাম—এ লোক খুশ হোয়ে আউর না হোয়ে, হাম মাদিন জানোয়ার মারতা নেহী। আমার ভাবগতিক দেখে আর কোন কথা বলার সাহস পেল না। দিনের আলো তখন প্রায় ডুবে গেছে। আমরা সকলে ফ্ল্যাগ স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। পথে নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে সকলকে বললাম—এবারকার শিকার পর্ব এখানেই শেষ করা যাক। বলাইবাবুও এই কথাই ভাবছিলেন। বললেন দুর্দ্ধর্ষ গরমে মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে শরীর ও মন অস্থির হয়ে পড়েছে। ঠিক হ'ল পরের দিন দুপুরের ট্রেন ধরে আমরা গয়া যাব এবং সেটাই গয়া প্যাসেঞ্জার হয়ে বিকেলে গয়া থেকে ছাড়ে—তাইতেই আমরা গয়া থেকে ফিরে যাবো। ত্রিরাত্রী একা একা নিষ্ফল বাসর জেগে গুরুদেবের (বিচিত্র) বর্ণিত—"ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী"কে সেলাম ঠুকে রওয়ানা হলাম ঘরপানে।

মানুষের মনে ফ্রাষ্টেশন্ বা হত-আশা এমনই একটা নিরুৎসাহ এনে দেয় যে সেই অভাগার কোন কিছু আর গড়ে উঠবার সুযোগ হয়ে ওঠে না। ধীরে এবং নিশ্চিত গতিতে মনের এমন অবক্ষয় আর কিছুতেই হয় না। বুদ্ধি হয়ে যায় ঘোলাটে। কর্ম হয় বেপথু—

বিফল, চিন্তা গুড়ে ওঠে নিবু'দ্ধিতার খিলানের উপর। মনে এসে যায়—"আঠার বার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে"—আমারও ঠিক সেই সঙ্কটীয় অবস্থা। কত চেষ্টা, কত প্রাণান্তকর পরিশ্রম, কত অনুনয় বিনয়, কত অর্থব্যয়, কত ফিকিরের খোঁজ—সবই ত হ'ল, কিন্তু!—নাঃ—বলবার কিছু নেই। শিকারীর ব্যর্থতার গ্লানি বোধহয় ললাট লিখন। বিফলতার একটা তীব্র জ্বালা ও অনুশোচনা নিয়ে গয়া থেকে রওয়ানা হলাম। রেল কামরায় বসে সকলেই কলভাষী—ধীরে আমার মনের গভীরে যেন নবউদয়ের আলোকপাত হল সেই শাশ্বত বাণীর—"গোপনে গোপনে বেদনার রসে সাধনা—সফল করে"—হবে কী তা আগামী দিনে? দীর্ঘশ্বাসের মিলনে প্রশ্নটি বার বার উঠতে লাগল মনে।

'সিনিয়র ডবর টাইগার' যার গর্জনে "ধরতি হিলতি" সেই পর্ব এখানেই শেষ; শেষ হল ইউসুফ ভাইয়ের সঙ্গে মহব্বত, মনসুর চাচার সংগে বাঘের সন্ধানে যাওয়াও সেই শেষ। এখনও চাচার সংগে দেখা হ'লে তিনি খুব বড় করে একটা সেলাম ঠুকে শিকারের "হালচাল" জিজ্ঞাসা করে থাকেন। আর আমিও হেসে শুধাই সাচ্ বাৎ বলিয়ে তো—শিকার পারমিট্ কিয়া থা কি নেহি? তারপর দু'জনের মুখেই বোঝাবুঝির মিষ্টি হাসি ফোটে।

* * * *

বার্ণপুরে পেঁ'ছে—"সে অবধি সই ভয়ে ভয়ে রই"—প্রায় শ্রীরাধারই অবস্থা আমার! কখন যে আবার—চা-টা বা রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ আসে—সেই আমাদের আহ্লাদী রাখীদের বাড়ী থেকে! কী বলব, কেমন করে বলব—জানাব আমার ব্যর্থতার কথা! ওর কাছে যে দুনিয়াটা একেবারেই কচি, সেখানে ত ব্যর্থতা নেই, খর্ব্বতা নেই—শুধু আনন্দময় অনুভূতির মধ্যে প্রস্ফুটিত তার দিন।

যা ভেবে ভয়ে ভয়ে রয়েছিলাম তাই এলো—রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ। ভেবে অস্থির—যাবো কি এড়াবো। দোমনা হয়ে সন্ধ্যের পর গিয়ে উঠলাম রাখীদের বাংলোয়; দরজায় আওয়াজ দিতেই—খুলে দিয়ে রাখী যথারীতি চঞ্চল অস্থির—চিৎকার করে জানিয়ে দিল—মা—দাড়িকাকু এসে গেছেন। ও যেন আমারই অপেক্ষায়। গোবেচারার মত বসে ওর সঙ্গে—কেমন আছো মা, স্কুল হচ্ছে ত—ইত্যাদি সব অগোছান অজমান কথার পর আমার সব সঙ্কোচ দূর করে—রাখী একটানা বলে যেতে লাগল, সে একটা বড় রিভলবার কিনেছে—ওটা নিয়ে শিকারে যাবে। কয়ে গেল কেমন করে মাচানে বসবে—আর ঠাঁই ঠাঁই করে গুলি মেরে—বাঘ হরিণ সব শিকার করবে। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়লো আমার। ওর মা বাবা হয়ত বলে রেখেছিল আমার বাঘ শিকারের কী হ'ল জিজ্ঞেস না করতে।

খাবার তৈরী; ডাক পড়ল--টেব্‌লে আমরা চারজন। শিকারের ছোটখাট কথাবার্তা হল—চুপ করে রাখী শুনছিল। প্রাণপণ চেষ্টার ত ত্রুটি আমার ছিল না কিন্তু তা হ'লেও অকৃতকার্যতার খর্ব্বতা বোধ ত জাগছিলই মনে। খাওয়া শেষ করে এসে বসেছি—পাশের বাড়ী থেকে গম্ভীর মিঠে কণ্ঠের দরদী গান আকাশবাণীতে ভেসে আসতে লাগল—

"সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ।
... ...

গেয়ে গেল—

দুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত।
শঙ্কা হ'তে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যু ভীত॥

বাণী ও সুরের মহামিলনে ভরে গেল সর্বসত্ত্বা আমার। সেদিন রাত্রে, আগের একদিনের মত, বাড়ী ফিরে মুসড়ে পড়েনি মনটা।

গভীর আনন্দে, চিরন্তনী আশায় ও একটা স্থির ভরসায় ভরে গিয়েছিল অন্তর—শুধু একবার ক্ষণিক উঁকি দিয়েছিল—সেই মিষ্টি ছোট্ট মেয়ে রাখীর ছোট্ট দু'টি কথা—"তোমার কিচ্ছু নে-ই, তুমি কিচ্ছু না"—আর তার অভিমানে ভরা চোখের কয়েক ফোঁটা জলের স্মৃতি।

সমাপ্ত

শিকার ও শিকারী—ক্রোড়পত্র
পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শিকার ও শিকারী

শ্রীহিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুবান্ধবেরা যখনই তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে তাঁর শিকারের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলি লিখে আর পাঁচ জনকে জানাবার সুযোগ করে দিতে—তিনি উত্তর করেছেন—"আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি ভাই, আমি বন্দুকের খেলায় অভ্যস্থ। অসি ছেড়ে 'মসীলিপ্ত' হ'বার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। বন্দুকটাকে কলমে কন্‌ভার্ট (convert) করতে পারবো না।" কিন্তু তাঁর 'শিকার' পড়ে মনে হ'ল শুধু আসরে গল্প জমানই নয়—তাঁর লেখাও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। বাংলা শিকার সাহিত্যে তাঁর এই নূতন সংযোজন সত্যই এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

হিমাংশু নামে তিনি বিশেষ পরিচিত না হ'লেও 'দাড়ি ব্যানার্জি, দাড়ি বাবা বা দাড়ি সাহেব'—এই সর্বগণ্য পরিচয়েই তিনি সকলের প্রিয়। 'ইস্‌কো' বা ইন্‌ডিয়ন আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী, বার্ণপুর, হ'তে অধুনা অবসর প্রাপ্ত একজন ইঞ্জিনীয়ারের পরিচয় এখানেই শেষ নয়। তাঁর রাজোয়া গাঢ় লাল রঙের পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়া 'লাগোণ্ডা'—১৯২৬ সালে তৈরী গাড়ীটিকে বহু সহস্র লোক অত্যন্ত উৎসুক হয়ে নজর করেছেন স্টেট্‌স্‌ম্যান ভিন্‌টেজ কার র‍্যালীতে' বা পুরানো সব শ্রেষ্ঠ গাড়ীর সর্বভারতীয় দৌড় প্রতিযোগীতায়, (১১ই জাঃ '৭৬) কলকাতায় বা (১৫ই ফেঃ '৭৬) দিল্লীর রাস্তায়। ১৯১৫।১৬ হ'তে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত যে সব শ্রেষ্ঠ গাড়ী তৈরী হয়েছিল—সেই সব গাড়ীই 'ভিন্‌টেজ্ কার' (Vintage car) বলে গণ্য হয়। বহুবার প্রথম পুরস্কার বা অন্যান্য নানা সম্মান পত্রের অধিকারী হয়েছেন তিনি ঐ সব সর্বভারতীয় প্রতিযোগীতায়। পঞ্চাশী প্রৌঢ়া 'লাগোণ্ডা'কে তাঁর 'শ্রীমতি প্রিয়তমা'

বললেও অত্যুক্তি হবে না। 'দাড়ি বাবা' চতুরঙ্গ আকর্ষণে জীবন কাটিয়েছেন—সেই চারিটির বিভিন্নরূপ দেখতে পাই—তাঁর গাড়ী দাড়ি, শিকার আর চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে। কোন পরিচিত জনেরই ভুলতে পারার কথা নয়—তাঁর দু'দাঁতে চাপা বর্মাচুরুটের বিরামহীন সংস্থানের ছবিটি।

অকৃতদার, পরশ্রীসুখী, বন্ধুবৎসল, অমায়িক স্বভাবের এই মানুষটি বহুজন প্রিয় ও বিশেষ আকর্ষণের দাবি রাখে। শিকারের সব গায়ে কাঁটা দেওয়া গল্পের জন্য তিনি শুধু পরিচিত জনের কাছেই খ্যাত নন, কিশোর কিশোরীদের কাছে বিশেষ করে 'হিরো কাকু' —বনে আছেন। উচ্চতায় প্রায় পাঁচফুট এগার ইঞ্চি, কঠোর পরিশ্রমী, নীরোগ বলিষ্ঠতায় অসীম সাহসী এবং শিকারী উপযুক্ত বহু গুণের অধিকারী হওয়ায় তিনি বহুজন প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন এ কথা সকলেই বলে থাকে। ইস্পাত শিল্পের একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হিসাবেও—'ইস্কো'তে অত্যন্ত সুনামের ও সম্মানের সঙ্গে দীর্ঘ ৩৬টি বছর কর্মকুশলতায় কাটিয়েছেন।

কর্ম ও শিকার জীবনের উৎকর্ষতা কঠোর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি আহরণ করেছেন—যার প্রতিফলন পরবর্ত্তী কালে পরিস্ফুট এবং তার পেছনে পারিবারিক পরিবেশেও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র হিমাংশু বাবুর শিকারে ব্যবহৃত হ'ত—তার মধ্যে তাঁর পিতা ৺শৈলেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত চারটি উৎকৃষ্ট অস্ত্র—উইন চেষ্টার রাইফেল '৪০৫", দু'নলা-'৪৫০" পার্ডি রাইফেল, ১২ বোরের দু'নলা জিকো (জার্মানী) বন্দুক এবং '৩২" ওয়েব্‌লী স্কট রিভল্‌বার। তাঁর নিজস্ব '৩০-০৬" এফ্‌ এন্‌ ব্রাউনি রাইফেল পরবর্ত্তী সময়ে সংগৃহীত।

হুগলী জেলা সহরের প্রখ্যাত সরকারী উকিল ৺শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র স্বর্গীয় শৈলেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন খ্যাত নাগরিক ও শিকারী ছিলেন এবং হিমাংশু বাবু ১৩।১৪ বছর

বয়সেই পিতার সঙ্গে নানা জায়গায় শিকারে সঙ্গী হতেন। ৺শৈলেন্দ্র-মোহন তমলুক সহরে সেকালে যুবকদের কারিগরী সংস্থায় শিক্ষার জন্য বাস্ ও মোটর গাড়ী মেরামতের কারখানা তৈরী করে ছিলেন—যেখানে সময় সময় হিমাংশুবাবু গিয়ে অল্প বয়স হতেই হাওয়াই গাড়ী চালনা শেখা ও তার কলকব্জা মেরামতির দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁর সেই প্রারম্ভিক দু'টি আকর্ষণ—শিকার ও গাড়ী—উত্তর কালে নানা সাফল্য এনে দিয়েছে। ১৯১২খৃঃ জন্ম, ৬৪ বছরের লোকটি তাঁর পাঞ্চাশী 'লাগোণ্ডা'কে সাজিয়ে গুছিয়ে সম্পূর্ণ একাই চালিয়ে গেলেন সুদূর দিল্লী (১৫ই ফেব্রুয়ারী' ৭৬) ভিন্‌টেজ কার র‍্যালীতে যোগ দিতে। ফিরে এলেন একাই—প্রায় ২০০০ মাইলের উপর পথ পরিক্রমা করে। সেখানের লোকেরা প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায় নি—ঐ গাড়ীতে এত পথ যাতায়াতের ঘটনা। বর্তমানে তামাম ভারতবর্ষে এই একটি মাত্র 'লাগোণ্ডা' গাড়ী আছে (দুই লিটার, ৪ সিলিণ্ডার) এবং তার এই চালক কলিকাতা—দিল্লী-লক্ষ্ণৌ-কলিকাতা—এই সুদূর পথে যাওয়া আসার মেহন্নত মাথায় নিয়ে—ভিন্‌টেজ কার র‍্যালীতে যোগ দিয়ে থাকেন। সাময়িক সংবাদপত্রে ও ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় এর বিবরণ ও ছবি অনেকেরই নজরে এসেছে।

হিমাংশুবাবু শিকার সফরে যে সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিভীষিকাময় সাংঘাতিক ঘটনায় প্রাণান্তকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সম্পূর্ণ একক ভাবে তার মোকাবিলা করেছেন—সে সবের বেশীর ভাগই লেখা হ'য়ে ওঠেনি।

শিকারী জীবনের পরিচয়ে তাঁর যে একটি সুষ্ঠু অনুভূতির প্রকাশ, ফল্গুর মত প্রচ্ছন্ন প্রবাহে বয়ে গেছে—যা আমাদের অনুভূতিকেও নাড়া দেয়—সে হ'ল বন ঐশ্বর্য্যের অনাবিল সৌন্দর্য্যের প্রতি এবং সমস্ত প্রাণী জগতের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ। নিছক শিকার ও শিকারী—ব্যাধ ও বধ্য সম্পর্কের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর মনন প্রশস্ত

আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়েছে—যাহা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না অসীম সাহসের যে পরিচয় দিয়েছেন এক গুণ্ডা পাগলা হাতী শিকারে ; যেমন পাই—'সাক্ষাৎ যমের মুখে' পড়ে মারমুখী বাঘের সঙ্গে মাত্র হাত কয়েক দূরে অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক অবিশ্বাস্য সাহসের সঙ্গে সেই অবস্থা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার ঘটনায়—তেমনই পাই ছোট নাগপুর পর্বত শ্রেণীর জঙ্গলে সন্ত্রাস-পূর্ণ অন্ধকার রাতে পথ হারিয়ে একা একা সারারাত ঘুরে—তিনটি রেল সুড়ঙ্গ পার হয়ে সম্পূর্ণ অবসন্ন শরীর নিয়ে একটি আশ্রয় খোঁজার মধ্যে।

কল্পনার আল্পনা দিয়ে তৈরী হয় নি এর কোন ঘটনাই—এ এক দুরূহ অভিজ্ঞতার অম্লান প্রকাশ। পাঠকবর্গ সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে 'শিকার' পড়ে কিছুমাত্র আনন্দলাভ করলে তাঁর এ প্রচেষ্টা সফল হবে।

সম্পাদক